ধর্ম ও পূজাদি মীমাংসা



পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

3·3

ধর্মপূজাদি মীমাংসা

ঁপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

প্রদীপ পাব্লিকেশনস্

প্রকাশক ঃ
গৌতম দাস
॥ সংকলন ॥
১ / ডি / ১ তরুণ সেনগুপ্ত সরণী
কলকাতা—৭০০ ০২৮
দূরভাষ ঃ ৯০০৭৯১৭১১৪

প্রথম প্রকাশ ঃ (প্রদীপ)
১লা জানুয়ারী, ২০১০ (কল্পতরু উৎসব)

প্রচ্ছদ ঃ
এক্‌তা গ্রাফিক্স

মুদ্রণ ঃ
আদ্যাশক্তি প্রিন্টার্স
৪ নম্বর যোগীপাড়া লেন
কলকাতা—৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ৯০ টাকা মাত্র

ভূমিকা

"তস্মৈ শ্রী গুরুবে নমঃ"

বহু প্রতিক্ষীত, "ধর্ম ও পূজাদি মীমাংশা" এই পুস্তকটি আবার ছেপে বেরোতে চলেছে।

প্রকাশক মহাশয় মুখবন্ধে কয়েকটি কথা লিখতে অনুরোধ করেছেন।

পণ্ডিত শ্রী পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, যোগীরাজ শ্রীশ্রী শ্যামচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্যই শুধ্ ছিলেন না, তিনি লাহিড়ী বাবার শ্রীমুখ নিসৃত প্রবচন ও জ্ঞানরাশি সকল, লিপিবদ্ধ করে রাখতেন। যার ফলশ্রুতি, আমরা এই অমূল্য পুস্তকগুলি সঙ্গে পরিচিত হতে পারছি।

এমনই একটি পুস্তকের মুখবন্ধ লেখার, ধৃষ্টতা, যোগ্যতা ও সাহস, চঞ্চল রায়ের নেই।

আমি আমার গুরুদেব পরমহংস শ্রীশ্রী হরিহরানন্দজী মহারাজ, পরমগুরু পরমহংস শ্রীযোগানন্দজী মহারাজ, সত্যানন্দজী মহারাজ, শ্রীজ্বালাপ্রসাদ তেওয়ারী মহাশয়। পরাৎপর গুরু, শ্রীযুক্তেশ্বরজী মহারাজ, শ্রীমৎ ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়, পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য মহাশয়। পরমেষ্ঠি গুরু শ্রীশ্রীশ্যামাচরণ লাহিড়ি বাবা। পরমাত্ম গুরু, কল্পযোগী বাবাজী মহারাজ ইষ্টদেবতা। আমার যোগাচার্য্য শ্রীঅমরনাথ তেওয়াড়ী ও যোগাচার্য্য শ্রী শম্ভু চৌধুরী এবং সর্ব্বপরি এ যুগের শ্রেষ্ঠ গৃহীযোগী রাজর্ষি রাঘবানন্দ নায়েক বাবাকে প্রণাম জানিয়ে, আমার গুরু ও গুরু বর্গের কাছে শেখা কিন্তু বক্তব্য লিপিবদ্ধ করছি।

পরমপিতা পরমেশ্বর, প্রতিটি জীবে জীবে জীবিভূত হয়ে আছেন। তিনি তাঁর সৃষ্টির সঙ্গেই, ক্রিয়াযোগের এই সর্বচ্চ রহস্য, এই ধরাধামে এনেছিলেন। জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মা মিলনই যোগ। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঈশ্বর এই যোগ নানান মাধ্যম দিয়ে আমাদের শিখিয়েছিলেন, সেটা সত্য যুগ ছিল। তখন যিশু, মুশা, ডেভিড ইব্রাহিম, মহম্মদ, শঙ্করাচার্য ও বুদ্ধ কেউ ছিলেন না। কোনও ধর্মপুস্তক ছিল না, বেদ, উপনিষদ, বাইবেল, কোরান বা পাতঞ্জলি কিছুই ছিল না। মানুষ তখন শ্বাস দিয়ে সুসুন্নায় মধ্যে চক্রের সাধনা করতো। এই অভ্যাসের ফলে, পবিত্রতা, পরিপূর্ণতা, শান্তি, মধুর স্বভাব এবং কৈবল্য

মুক্তি মানুষ উপলব্ধি করতেন। তাঁরা জানতেন যে এই বিশ্বচরাচরে ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনও কিছু নেই।

এখন ধর্ম মানেই কিছুই জাহির করা যুক্তি। উন্মত্ত ধারণা, চরমপন্থি ভাব, পক্ষপাত, ব্যবসায়িক; কল্পনাবাদী, ভ্রমভ্রান্তি ও সিদ্ধাই। এই গণ্ডিতে মানুষ আবদ্ধ। স্বধর্ম ত্যাগ করে, ভয়াবহ পরধর্মপালনে মানুষ ব্যস্ত।

এই ধর্মের গ্লানির সময়, বাবাজী মহারাজ, ব্রহ্মজ্ঞানী যোগীপুরুষ, এই পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন করলেন, প্রকৃত ক্রিয়াযোগকে পুনঃউদ্ধার করে লাহিড়ী বাবার মাধ্যমে মুমুক্ষু মানুষকে অমৃত প্রদান করলেন।

মানুষের জন্ম, শুধুমাত্র ঈশ্বরকে জানার জন্য এবং ক্রিয়াযোগ ঈশ্বর প্রনিধানের দ্রুততম ও সহজতম কৌশল।

যাঁরা ক্রিয়াযোগ গ্রহণ করতে আগ্রহী, যাঁর ক্রিয়া অভ্যাস শুরু করেছেন এবং যাঁরা ক্রিয়ার উচ্চপর্যায়ে পৌঁছেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের জন্য এটি একটি অমূল্য সংগ্রহ।

ক্রিয়াগঙ্গা প্রবাহমান রাখাই এই বই এর মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিনীত

১৯ রফি আহমেদ কিদোয়াই রোড — যোগাচার্য্য ডাঃ চঞ্চল রায়
কলকাতা ৭০০ ০৫৫
(২৫শে ডিসেম্বর, ২০০৯)

বিজ্ঞাপন।

গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্।

জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ।
ময়ি ধারয়তশ্চেতউপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ।।
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতম্।

চলে বাতে চলং চিত্তংনিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ।
যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ।।
স্বস্থো জাগ্রদবস্থায়াং সুপ্তবদ্‌যোঽবতিষ্ঠতে।
নিশ্বাসোচ্ছাসহীনশ্চ নিশ্চিতং মুক্ত এব সঃ।।
ইতি হঠযোগপ্রদীপিকা।

দেশে ধর্ম্মবিভ্রাট ও তন্নিবন্ধন লোকের এত অভাব ও অশান্তি দৃষ্ট হওয়ায় ধর্ম্ম ও পূজাদি-মীমাংসা নামক এই গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষকে আক্রমণ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে। কিসে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ হয়, তাহাই দেখান ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। শাস্ত্রে যে সকল অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ লিখিত আছে, সে গুলি বুঝিয়া ঠিক ভাবে করিতে হইলে, যোগপথ অবলম্বন করা উচিত। যোগব্যতীত ঐ সকলের অনুষ্ঠান হইতেই পারে না। কেননা, পূজাপদ্ধতির মন্ত্রসকলের মধ্যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি যে সকল ক্রিয়া আছে, তৎসমুদায় যোগিব্যতীত অন্যের দ্বারা কখনই হইবার নহে। কাহারও সহিত ঝগড়া বা বাগ্‌বিতন্ডা করা আমাদের অভিপ্রায় নহে; কেননা, শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে আমরা কোনটিই ত্যাগ করতে বলি না। আমাদের একমাত্র কথা এই যে, যিনি যাহা করিতেছেন, তিনি যাহাতেই তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক করিতে পারেন, সকলেরই সেই চেষ্টা করা উচিত। আমরা আদ্যোপান্ত কেবল এইমাত্র দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছি যে, যে কার্য্যই হউক না কেন, তাহা যদি ঠিক ভাবে অনুষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে, তাহার ফলও প্রকৃতরূপ হয় না। প্রকৃত ফল পাইতে হইলে, কর্ম্মযোগের আশ্রয়গ্রহণ করিয়া অগ্রে মন স্থির করা কর্ত্তব্য।

মনের সংযোগব্যতীত কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সাধিত হয় না। সেই মন যদি নানা বিষয়ে রত থাকে, তাহা হইলে, ভগবদারাধনা করে কে? কর্ম্মযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিলে মন ক্রমশঃ যতই স্থির হইয়া আইসে, ততই প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হইতে থাকে এবং জ্ঞানোদয়ে নিজে নিজেই ভালমন্দ ঠিক বুঝিবার ক্ষমতাও জন্মে। তখন আর কাহারও কথায় বা পরামর্শে কোন কর্ম্ম ভাল বা মন্দ বলিয়া গ্রহণ বা ত্যাগ করিতে হয় না। সেই প্রকৃত জ্ঞান কি এবং অজ্ঞানই বা কাহাকে বলে, তাহা ভগবান্ গীতাতে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। যথা—

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ।।
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ। জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্।।
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু।।
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী। বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি।।
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্। এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা।।

অর্থাৎ আত্মশ্লাঘা-রাহিত্য, দম্ভহীনতা পরপীড়াত্যাগ, সহিষ্ণুতা, সরলতা, গুরুসেবা, অর্ন্তব্বহিঃ-শুচিতা, মনের স্থিরতা এবং শর রসংযম; বিষয়সকলে বৈরাগ্য, অহঙ্কার-রাহিত্য এবং জন্মমৃত্যুজরাব্যধিতে দুঃখ এবং দোষের অনুদর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট উপলব্ধি; পুত্রদারগৃহাদিতে অনাসক্তি আর তাহাদের সুখ অথবা দুঃখে আমি সুখী বা দুঃখী এইরূপ জ্ঞান না করা এবং ইষ্ট ও অনিষ্ট উভয়েরই প্রাপ্তিতে সর্ব্বদা চিত্তের একরূপত্ব, আমাতে অনন্যযোগ (অর্থাৎ সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি) দ্বারা একান্ত ভক্তি, নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি এবং মনুষ্যসমাজে বিরাগ, আর আত্মজ্ঞান -পরায়ণ তা এবং তত্ত্বজ্ঞানের ফল যে মোক্ষ, তাহার দর্শন–এই অমানিত্ব প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতিসংখ্যক জ্ঞান বলিয়া উক্ত হইয়াছে; আর যাহা ইহা হইতে অন্যপ্রকার অর্থাৎ ইহার বিপরীত তাহা অজ্ঞান।

উপরেও শ্রীমদ্ ভাগবত এবং হঠযোগপ্রদীপিকা হইতে যে শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও দেখা যায় যে, শ্বাসকে জয় করা ব্যতীত জীবের সিদ্ধি বা মুক্তি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। লোকে কথায় যেমন বলে যে, "সব শৃগালের একই রব", ভাষা যেরূপই হউক না কেন মহাত্মাদের কথা ও ভাব তেমনি এক বই দুই কখনই হইতে পারে না। যেখানে একের অধিক কথা বা ভাব, সেইখানেই গোল।

অতএব আমাদের একমাত্র কথাই এই যে, যিনি যেরূপ ভাবে ধর্ম্ম আচরণ করিতেছেন, তিনি তাহা না ছাড়িয়া তৎসঙ্গে সঙ্গে সদ্গুরুলাভের চেষ্টা করিয়া, সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত প্রাণায়ামাদি যোগসাধন করুন। তাহা হইলে, ক্রমশঃ উন্নতিসহকারে শাস্ত্রের এবং ধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বা রহস্য নিজে নিজেই বুঝিতে পারিবেন, তখন আর ধর্ম্ম লইয়া দলাদলি বা কোন প্রকার গন্ডগোল করিতে হইবে না। কেবল মাত্র এক বাহ্য অনুষ্ঠানের দ্বারা তাহা কখনই হয় না।

অবশেষে আমাদের বিনীত অনুরোধ এই যে, কেহ যেন ইচ্ছামত এই পুস্তকের অংশবিশেষ পাঠ করিয়াই সহজ বিষয় বা ভাব অবগত হইবার আশা না করেন। সমুদায় বিষয় অবগত হইতে হইলে, সমগ্র পুস্তকখানি পাঠ করা আবশ্যক। তবে যাঁহারা সময়াভাব বশতঃ বা অন্য কোন কারণে ইহার আদ্যোপান্ত পড়িতে না পারেন, তাঁহারা যেন অন্তত ৮ম পৃষ্ঠা হইতে ১৩তম পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এবং পুস্তকের শেষভাগে "বন্ধন ও মুক্তি" শীর্ষক অংশটি মনযোগ সহকারে পাঠ করেন। তাহা হইলেও তাঁহারা জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিতে পারিবেন। অলমতিবিস্তরেণ ইতি-

—-পঞ্চানন ভট্টাচার্য

নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম ও পুজাদিমীমাংসা।

যাবন্নৈব প্রবিশতি চরন্মারুতো মধ্যমার্গে
যাবদ্‌বিন্দুর্ন ভবতি দৃঢ়ঃ প্রাণবাত প্রবন্ধাৎ।
যাবদ্ধ্যানে সহজসদৃশং জায়তে নৈব তত্ত্বং
তাবজ্‌জ্ঞানং বদতি তদিদং দম্ভমিথ্যাপ্রলাপঃ।।
রাজযোগস্য মাহাত্ম্যং কো বা জানাতি তত্ত্বতঃ।
জ্ঞানং মুক্তিঃ স্থিতিঃ সিদ্ধি গুরুবাক্যেন লভ্যতে।।

হঠযোগপ্রদীপিকা।

ধর্ম্ম কি এবং ধর্ম্মের আবশ্যকতা আছে কি না, ইহা এক কালে আর্য্যেরাই বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কালবশে আজ ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে আজ আর্য্যভূমি শ্মশানভূমিতে পরিণত হইতে বসিয়াছে। আর্য্যভূমির আজ আর সে গৌরব নাই - সে রূপ, সে শ্রী নাই; আছে কেবল চিতাধূম মাত্র। আর আছে আর্য্যধর্ম্মবিলোপকারী. আর্য্যসন্তানের মাংসলোলুপ, গৃধ্রশকুনিতুল্য আমার ন্যায় ধর্ম্মপ্রচারকগণের ঘোর বিকট চিৎকার। আকাশ ও চতুর্দ্দিক ঘনঘটাচ্ছন্ন; আমার রসশূন্য গগনভেদী বিকট গর্জ্জনে দিঙ্‌মন্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে মাত্র। কিন্তু হায়! তাহাতে বৃষ্টিও নাই,– সুবাতাসও নাই! সুতরাং ফাঁকা গর্জ্জনে শরীর ও মনের তৃপ্তি বা শান্তি হইতেছে না। শান্তি হইবেই বা কিরূপে? যখন চতুর্দ্দিকেই অভাবরূপ মেঘে আবৃত, তখন আমার শান্তিবারির আশা করা বিড়ম্বনা নয় কি? যখন আমি অজ্ঞানরূপ মেঘে আচ্ছন্ন, তখন আমাতে ধর্ম্মের প্রকাশ সম্ভব না। ঘনঘটাসমাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্যের প্রকাশ যেন অসম্ভব, অজ্ঞানসত্ত্বেও ধর্ম্মের প্রকাশও তদ্রূপ অসম্ভব। তবে ধর্ম্ম কি? আমার ন্যায় অজ্ঞানী জীবের এরূপ প্রশ্ন করা অনুচিত নহে; বরং উহা করাই উচিত।

আজকাল নানারূপ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মুখে নানাপ্রকার ধর্ম্মকথা শুনিয়া, "কোন্‌টি ধর্ম্ম, কোন্‌টি অধর্ম্ম" তাহা ঠিক করা আমার ন্যায় জীবের পক্ষে বড়ই কঠিন। কেননা, পরস্পর পরস্পরের মত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের দলের পুষ্টিসাধন করিবার জন্য প্রায় সকলকেই ব্যাকুল দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু হায়, কি পরিতাপের বিষয়!! আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, অথচ "ধর্ম্ম কি" তাহা জানি না!!! নিজে যে কিছুই বুঝি না, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতেও পারি না; কেননা, তাহা হইলে, আমার দল থাকে না;

সুতরাং আমি যাহা বলিতেছি, তাহা মিথ্যা এবং শাস্ত্র ও যুক্তি-বিরুদ্ধ হইলেও নিজের কো'ট বজায় রাখিবার জন্য নানাপ্রকার কূটতর্কের দ্বারা আপন মত সমর্থন করিয়া থাকি। কিন্তু একবার ইহা ভাবিনা যে, ধর্ম্ম কখনও পৃথক্ পৃথক্ হইতে পারে না; যেখানে পৃথগ্ভাব সেইখানেই অধর্ম্ম। অধর্ম্মের বিপরীতই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ – ধৃ (পোষণ করা) + ম (প্রত্যয়)। যিনি সকল জীবকে পোষণ করেন, তিনিই ধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক, কে সকল জীবকে পোষণ করে। যদি বলা যায়, – অন্নই জীবগণকে পোষণ করিতেছে, অতএব অন্নই আমাদের একমাত্র ধর্ম্ম। ইহা বলা যাইতে পারে বটে, কিন্তু একরূপ অন্নের দ্বারা ত সকল জীবের পুষ্টিসাধন হয় না; যাহার যে বস্তু দ্বারা দেহের পোষণ হয়, তাহার পক্ষে তাহাই অন্ন। যেমন গবাদি পশু হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত জীবের পক্ষে ক্ষেত্রজাত গোধূমাদি অন্ন হইতে পারে, কিন্তু দুগ্ধপোষ্য বালকের অন্ন দুগ্ধ; কারণ, বালক দুগ্ধব্যতীত জীবন ধারণ করিতে পারে না। মৎসাদির পক্ষে অন্যরূপ এবং কীট-পতঙ্গাদির পক্ষেও অন্যরূপ। আবার বায়ু জল মৃত্তিকা ভক্ষণেও অনেক জীবের দেহ-পোষণ হইতে দেখা যায়! এরূপস্থলে যদি অন্নই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে ধর্ম্ম ত পৃথক্ পৃথক্ হইল।

উপরে বলা হইয়াছে যে, ধর্ম্ম কখনও পৃথক্ হইতে পারে না। পৃথক্ হইলেই অধর্ম্ম হইবে। অতএব জীব-বিশেষের পক্ষে অন্নের পৃথক্ত্ব হেতু উহা ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কিন্তু আর একটি এমন মহৎ বস্তু আছে,যাহা ব্রহ্মাদি কৃমি পর্য্যন্ত প্রাণিগণে, বৃক্ষলতাদি স্থাবরগণে, এমন কি, ব্রহ্মাণ্ডের চেতন, অচেতন ভূতমাত্রেই অবস্থান করিয়া সর্ব্বভূতেরই পোষণ সাধন করিতেছে। তাহাই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ - তিনি সকল ঘটেই প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি জীবমাত্রেরই অভিষ্ট দেবতা। মণিমুক্তার মালার মধ্যে যেমন সূত্র থাকে, তদ্রূপ সেই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ সূত্ররূপে সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজ করিয়া, সমস্ত জীবকে পোষণ করিতেছেন। তিনিই সমস্ত জীবের একমাত্র ধর্ম্ম এবং তিনিই একমাত্র উপাস্য দেবতা।

সর্ব্বভূতান্তরাত্মায়ং সর্ব্বেষাং সর্ব্বদঃ সদা।
যে বিনিদ্রা বিনিশ্বাসাঃ শান্তা ধ্যানপরায়ণাঃ।।

কাশীখন্ড।

যে রুদ্রাস্তে খলু প্রাণা যে প্রাণাস্তে তদাত্মকাঃ।
প্রাণাঃ প্রাণবতাং জ্ঞেয়াঃ সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতাঃ।।

লিঙ্গপূরাণ।

সেই ধর্ম্মরূপী নারায়ণ যবনদেহে যেরূপ বিরাজ করিতেছেন, ম্লেচ্ছ বা হিন্দু দেহেও তদ্রূপ বিরাজ করিতেছেন। কিন্তু তিনি দেহও নহেন, মুসলমান, হিন্দু বা খ্রীষ্টিয়ানও নহেন; অথচ যখন যাহাতে থাকেন, তখন তিনি তাহাই, কিন্তু তাহা তিনি নহেন। তিনি বাদাতীত, দ্বন্দ্বাতীত এবং সকল দলে থাকিয়াও সকল দলের অতীত। এই ধর্ম্মরূপী নারায়ণের নিকট কোন সাম্প্রদায়িক ভাব নাই, অথচ তিনি সকল সম্প্রদায়েই আছেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায় তাঁহাতে নাই। যেমন তিনি আমাতে আছেন, কিন্তু আমার মন তাঁহাতে নাই অর্থাৎ যেমন সকল দেহেই প্রাণ রহিয়াছে, প্রাণের অস্তিত্বেই জীবের অস্তিত্ব, কিন্তু সেই প্রাণেরপ্রতি জীবের লক্ষ্য নাই; সুতরাং প্রাণে লক্ষ্য না থাকায় জীবের প্রাণে থাকা হইল না; সেইরূপ তিনি সকল সম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও সকল সম্প্রদায় তাঁহাতে ভুক্ত নহে। এই অভুক্ত সম্প্রদায়সকল ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, কিছুতেই ক্ষুধা নিবৃত্ত হইতেছে না। ক্ষুধানিবৃত্তি না হইলে পোষণ কার্য্য সমাধা হয় না। সুতরাং ধর্ম্মরূপ অন্নের অভাবে মন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। কিছুতেই মনের শান্তি নাই; শান্তির অভাবে দেহও ক্ষীণ হইতেছে। কারণ, মনের অসুখে দেহের অসুখ এবং দেহের অসুখে মনের অসুখ; সুতরাং কিছুতেই সুখ নাই।

সেই সূত্ররূপী প্রকৃত ধর্ম্মের অভাবে আজ ধর্ম্মনিকেতন আর্য্যভূমির চারিদিকেই হাহাকার। তাই আর্য্যবংশধরগণ আজ আমার ন্যায় অনার্য্যভাবাপন্ন হইয়া একমুষ্টি উদরান্নের জন্য সামান্য কিঙ্কর অপেক্ষাও হেয় হইয়াছেন। হায় ধিক্ আমার জীবনে, ধিক্ আমার সম্ভ্রমে, ধিক্ আমার গৌরবে, ধিক্ আমার ধর্ম্মপ্রচারে বা শাস্ত্র আলোচনায় এবং ধিক্ আমার লেখনীধারণে। আমি যে লেখনী ধারণ করিয়া মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক বা দৈনিক পত্রের স্তম্ভে স্তম্ভে ধর্ম্মপ্রবন্ধ লিখিয়া থাকি, আমার সেই সাহসে বা উদ্যমে ধিক্ এবং ধিক্ আমার যশঃ-প্রত্যাশায়। আমার ঘৃণা নাই, লজ্জা নাই, অন্তরে ধর্ম্মভাব নাই, আছে কেবল যশঃপ্রত্যাশা এবং অর্থলালসা। তাই ধর্ম্মের ভাণে বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ছড়াছড়ি করিয়া থাকি। আমি লোককে ধর্ম্মোপদেশ দিয়া বলিতেছি যে, স্ত্রীপুত্রধনরত্নাদি সংসারে যাবতীয় পদার্থ অনিত্য। এ সকল ত্যাগ করিয়া আচারবান্ হইয়া সত্য প্রতিপালন ও ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ কর। কিন্তু আমি মুখে যাহা বলিতেছি, আমার কার্য্য তাহার বিপরীত; অর্থাৎ যাহা কিছু বলি, তাহা নিজের স্ত্রীপুত্র প্রতিপালন ও সুখৈশ্বর্য্যের জন্য মাত্র। নচেৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বা কোন কান্ডকান্ডজ্ঞানই আমার নাই। যদি কেহ না দেখে বা না জানে, তাহা হইলে গোপনে সকল কার্য্যই করিয়া থাকি; অথচ লোকের কাছে সাধু, পরমহংস, পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী বা পন্ডিতের রূপ ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হই না। নাট্যাগারে অভিনেতৃগণ যেমন অভিনয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ আমি দেশে দেশে ঘুরিয়া অভিনয়

করিয়া বেড়াইতেছি এবং সকলকে বলিতেছি যে, তোমরা ধর্ম্মের জন্য সভা-সমিতি করিয়া ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ কর। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, ধর্ম্ম কি, তাহা আমার বুঝাইবার ক্ষমতা নাই। আমি যাহা বলিতেছি, তাহা কে না জানে? ধর্ম্মের দ্বারা যে জীবের মঙ্গল হইবে, ইহা তো অনেকেই অবগত আছেন, কিন্তু কিসে তাহা লাভ হইবে, ইহা কে বলিয়া দেয়? এদিকে আমি স্বার্থের জন্য এবং দল রাখিবার জন্য "সন্ধ্যা কর" "পূজা কর" "জপ কর" ইত্যাদি নানাবিধ উপদেশ দিতেছি, অথচ এটি ভাবি না যে, এ সকল করায় কে? এই কথায় একটি গল্প মনে পড়িল।

এক দিবস হঠাৎ ইন্দুরের সমাজে মহা কোলাহল হইতেছে দেখিয়া, একটি প্রাচীন ইন্দুর আসিয়া সকল ইন্দুরকে সম্বোধন করিয়া কহিল, –"তোমরা এত কোলাহল করিতেছ কেন?" তখন সকলে সেই প্রাচীন ইন্দুরের নিকট আসিয়া বলিল, –"মহাশয়! বিড়ালের উপদ্রবে বোধহয় আমরা কেহই আর জীবন ধারণ করিতে পারিতেছি না; যেহেতু বিড়ালগণ নিত্যই আমাদের বংশনাশ করিতেছে। অতএব ইহার একটা উপায় না হইলে, এ যাত্রা আমাদের আর রক্ষা নাই।" তখন প্রাচীন ইন্দুর কহিল, –"অদ্য আর কোন কথায় কাজ নাই; কল্য সকলে মিলিয়া এক সভা করিয়া এই বিষয় আলোচনা করা যাইবে এবং শ্রেয়োলাভের উপায়ও স্থিরীকৃত হইবে। অতএব আজ সকলকে সংবাদ দাও যেন ঐ সভায় কল্য সকলে উপস্থিত হয়।" বৃদ্ধ ইন্দুরের পরামর্শে পরদিন সকলেই সভামন্ডপে উপস্থিত হইয়া তাহাকেই সভাপতি করিল। নানা কথা আলোচনার পর প্রাচীন ইন্দুর কহিল যে, –"তোমরা যে সকল কথা বলিলে, তাহাতে বিপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই; তবে আমার বিবেচনায় এক সদুপায় আছে বলিয়া বোধ হইতেছে। আমরা যদি বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিয়া দিতে পারি, তাহা হইলেই ঘন্টার শব্দে বিড়ালের আগমন বুঝিতে পারিব; তখন আর আমাদের প্রাণের কোন আশঙ্কা থাকিবে না।" এই কথা বলিবামাত্র সকলেই করতালির সহিত প্রাচীন ইন্দুরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। অবশেষে যখন বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধিবার সময় আসিল, তখন আর কেহই সাহস করিয়া ঘন্টা বাঁধিতে অগ্রসর হয় না। সকলেই পরস্পর পরস্পরকে ঘন্টা বাঁধিতে বলে, কিন্তু ঘন্টা বাঁধিবার আর লোক পাওয়া যায় না। ঘন্টা বাঁধিলে মঙ্গল হইতে পারে বটে, কিন্তু বাঁধে কে?

আমার ধর্ম্মপ্রচারও তদ্রূপ। মুখে যে সকল উপদেশ দিতেছি ঐ সকল কার্য্য করায় কে? কেবল মুখে বলিলে ত চলিবে না। আমি যাহা লোককে করিতে উপদেশ দিতেছি, অগ্রে কি দেখা উচিত নহে যে, ঐ সকল কার্য্য আমি নিজে জানি কিনা এবং উহা দ্বারা আমি নিজে কি শান্তি পাইয়াছি? যদি কেহ আমার এই কথায় বলেন, –"বাপু

হে! তুমি যে বিষয় আমায় বলিতেছ, ভাল আমি না হয় তাহা করিতে অশক্ত, কিন্তু তুমি ঐ সকল কার্য্য করিয়া কি শান্তি পাইয়াছ? তোমার কার্য্য দেখিয়া যথার্থ কথা বলিতে গেলে, ইন্দ্রিয়ের দাস ব্যতীত তোমায় আর অন্য কি উপাধি দেওয়া যাইতে পারে?" তাহা হইলে আমি তাহাকে কি উত্তর দিব? পরিতাপের বিষয় এই যে, তাহা কাহারও বলিবার যো নাই; কারণ, তাহা হইলে আমি তাহাকে শাস্ত্রদ্বেষী অহিন্দু ইত্যাকার শ্লেষ বাক্য বলিয়া তীব্র বক্তৃতায় বা সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু তাহাতে যে কাহারও ক্ষতি হইতেছে, তাহা একবারও দেখি না।

বাস্তবিক আমি স্বার্থের জন্য লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছি এবং অযথা লোককে কটুকাটব্য বলিতেছি। আমি শাস্ত্রের দোহাই দিয়া বলিতেছি "পূজা কর" "জপ কর" "সন্ধ্যা কর" —কিন্তু কি উপায়ে এই সকল কার্য্য করিতে হয়, তাহা নিজেই জানি না। পূজাপদ্ধতিতে যে সকল কার্য্যের বিষয় লেখা আছে, তাহা পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিলেই কি পূজা করা হইল? ইহাই যদি পূজা হয়, তবে এই পূজা যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল। কারণ, এইরূপ পূজার দ্বারা দেশে যাবতীয় অমঙ্গল-ঘটনা হইতেছে। কেননা, আমি গঙ্গাজল তামা তুলসী হস্তে করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম পূজা করিব, কিন্তু শাস্ত্রবিহিত তাহার কিছুই করিলাম না। শাস্ত্রে গঙ্গাকে পবিত্রসলিলা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমি সেই পবিত্র বারি স্পর্শ করিয়া পদে পদে সঙ্কল্প করিতেছি এবং পদে পদেই সেই সঙ্কল্প ভঙ্গ করিতেছি। ইহাতে আমি ও আমার পূর্ব্বপুরুষগণ কি নরকস্থ হইতেছেন না? আমি এমনি কুলাঙ্গার জন্মিয়াছি যে, আমার কার্য্যের দোষে আমার পূর্ব্বপুরুষগণ পর্য্যন্ত নরকস্থ হইতেছেন। আবার সেই নরক গুলজার করিবার জন্য সাধারণকেও আহ্বান করিতেছি। ইহা কি আমার কপটতা নয়? আমি নিজে যে বিষয় জানি না, তাহা শিক্ষা করিয়া প্রকৃতরূপে করিবার চেষ্টা না করিয়া, অপরকে তাহাই করিতে উপদেশ দিতেছি! ইহাই কি আমার ধর্ম্মপ্রচার? ডাঙ্গায় সাঁতার শিখিয়া, জলে সাঁতার দিতে যাওয়ার ন্যায় কর্ম্মশূন্য অসার ধর্ম্মপ্রচারে সাধারণের অনিষ্টব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই। কারণ "পূজা কর" মুখে বলিলে হইবে না —পূজা করায় কে? পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে সকল বীজমন্ত্র আছে, তৎসমুদায় যোগপথ অবলম্বন ব্যতীত আর কিছুতেই অবগত হওয়া যায় না। যোগীরাই কেবল ঐ সকল জানেন।

সুতরাং ঐ সকল পূজাবিধির প্রকৃতমর্ম্ম এখন আমাদের প্রায় কাহারও জানা নাই। উপস্থিত কালে যে সকল প্রতিমা পূজা হইয়া থাকে, ঐ সমস্ত দেখিলেও কষ্ট বোধ হয়; কেননা, আমি পূজা করিতে জানিনা বলিয়া আমার দ্বারা উহা প্রকৃত রূপে সমাধা হয় না; অথচ আমি কখনই স্বীকার করিব না যে, আমি পূজা করিতে জানি না। এখনকার

পূজা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়াছে; সুতরাং তাহা না করিলে আমার সংসার চলে না; এজন্য বাধ্য হইয়াও আমাকে বলিতে হয় যে, আমি পূজা করিতে জানি। আমি মুখে আপনাকে দশকর্ম্মান্বিত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আমার কোন কর্ম্মের জ্ঞান নাই। আমি দর্শনশাস্ত্রে পন্ডিত হইলেও আমার দ্বারা পূজা হইতে পারে না। কারণ, দর্শনশাস্ত্রে পারদর্শী হইলেও আমি সংযমী নহি। পূজাপদ্ধতিতে যে সকল মন্ত্র ক্রিয়াদি লিখিত আছে, তৎসমুদায় যিনি যোগপথ অবলম্বন করিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি কতকটা বুঝিতে পারেন – সম্যক বুঝিতে অক্ষম। আমার ন্যায় লোকের তাহা বুঝিবার চেষ্টাও নিষ্ফল প্রয়াস মাত্র। ব্যাকরণাদির সাহায্যে পূজার মন্ত্র ও বিধি-সকলের মর্ম্ম অবগত হওয়া যায় না। প্রকৃত বিষয় জানিতে হইলে, যিনি প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়া নিজে করিয়া অবগত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট জানিতে হয়, নিজের বুদ্ধিতে বা ব্যাকরণাদির সাহায্যে উহা জানিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যেহেতু, পূজাপদ্ধতির মধ্যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি যে সকল গুরুতর বায়ুক্রিয়াদি সন্নিবেশিত আছে, উপযুক্ত কর্ম্মী ব্যতীত অন্যের দ্বারা কেবল কল্পনায় ঐ সকল কার্য্য কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না।

আজকাল আমার ন্যায় যে সকল ব্রাহ্মণপন্ডিত পূজাদি করিয়া থাকেন, তাঁদের কেহই প্রায় যোগপথাবলম্বী নহেন। আমরা তন্ত্র মন্ত্র কিছুই বুঝি না, কেবলমাত্র মুখে বলিয়া থাকি "আমি ব্রাহ্মণ" "আমি পন্ডিত"। বাস্তবিক দেখিতে গেলে, কার্য্যে আমাদের কিছুই নাই – না আছে ব্রাহ্মণত্ব, না আছে পান্ডিত্য, কেবল বিদায়ের ঘড়া গাড়ু জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে লালায়িত। কি পরিতাপের বিষয়!! এক কালে যে ব্রাহ্মণের নিকট পৃথিবীপতিও করযোড়ে শঙ্কিতভাবে দন্ডায়মান থাকিতেন, আজ কি না সেই তাঁহাদের সন্তানগণ সামান্য ভিক্ষুকের ন্যায় লোকের দ্বারে দ্বারে অতি অকিঞ্চিৎকর দুই একটা পয়সা বা দুই একটা রজতমুদ্রার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন!!! ইহা কি আমাদের ঘৃণার বিষয় নহে? তথাপি আমি কোন্ মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিই? কই আমার ব্রাহ্মণত্ব কোথায়? ব্রাহ্মণত্ব থাকিলে ত আমি ব্রাহ্মণ হইব?

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজ রমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।।

গীতা।

এই সকল লক্ষণ যাঁহার আছে, তিনিই বাহ্মণ। কিন্তু আমার তাহা কই? আমার শমদমাদি গুণ কোথায়? জ্ঞানই বা কই? বিজ্ঞানই বা কোথায়? যখন জ্ঞানই আমার নাই,তখন বিজ্ঞান আসিবে কোথা হইতে? আস্তিকতাই বা কই? বরং সময়ে সময়ে

নাস্তিকতার ভাবই আমাতে লক্ষিত হয়। তবে কি কেবল মুখে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিলেই আমি ব্রাহ্মণ হইব? আমি পাণ্ডিত্যের অভিমান করিয়া থাকি, কিন্তু পণ্ডিতের গুণই বা আমাতে কি আছে? পণ্ডিত কাহাকে বলে? শাস্ত্রে পণ্ডিতের যে সকল গুণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এখন দেখা যায় না। গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন– "শুনি চৈব শ্বপাকেচ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" অর্থাৎ সমদর্শী ব্যক্তিরাই পণ্ডিত। চাণক্য বলিয়াছেনঃ–

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।।

কই ইহার ত কোন গুণই প্রায় এখন দেখা যায় না। পণ্ডা শব্দের অর্থ সদসদ্‌বিবেকিনী বুদ্ধি। একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত সমস্তই অসৎ। যে বুদ্ধির দ্বারা সেই সৎ বস্তু ব্রহ্মের জ্ঞান হয়, তাহাই পণ্ডা এবং এই পণ্ডা যাঁহার আছে, তিনিই পণ্ডিত। কই ইহাও ত আমার নাই, তবে আমি পণ্ডিত কিসে? ব্রাহ্মণত্ব বা পাণ্ডিত্য এ দুয়ের যখন কিছুই নাই, তখন আমার ব্রাহ্মণপণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেওয়া বাতুলতা নয় কি? শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের যে সকল গুণ লেখা আছে আধুনিক আমার ন্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সে সকলের কিছুই দেখা যায় না। শাস্ত্রে বলে ঃ–

যোগস্তপো দমো দানং ব্রতং শৌচং দয়া ঘৃণা।
বিদ্যা বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্।।

কই ইহারই বা কি আছে – যোগই বা কই, তপই বা কই, দম, দান, ব্রত, শৌচ, দয়া, ঘৃণা, বিদ্যা, বিজ্ঞান, অস্তিকতাই বা কই, --এক যোগের অভাবে সকল বিষয়েরই অভাব হইয়াছে। এক কালে যে ব্রাহ্মণেরা যোগবলে জ্ঞানের চরম সীমায় গিয়াছিলেন, আমরা সেই বংশসম্ভূত হইয়া, যোগপথ উপেক্ষা করিয়া অনেক সময় বরং যোগপথাবলম্বীদিগকে ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকি। নিজেও করিব না, কাহাকে করিতেও দিব না; অথচ বলিয়া থাকি যে, আমরা শাস্ত্রব্যবসায়ী ও শাস্ত্র মানিয়া চলি। কিন্তু ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ–

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন।।

গীতা।

সুতরাং যোগী যে সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই; তথাপি আমাদের চৈতন্য হয় না। আমরা যখন ভগবদ্‌বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া থাকি, তখন আমাদের শাস্ত্রে বিশ্বাস কই? কেবল মুখে বলি, শাস্ত্রে বিশ্বাস করি; কেননা, তাহা না বলিলে, ব্যবসা নষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং মুখে বলিতে হয় যে, শাস্ত্রে বিশ্বাস করি। বাস্তবিক উহা

আমার অন্তরের কথা নহে। অন্তরের কথা হইলে, কার্য্যেও তাহা দেখা যাইত। যখন ভগবদ্‌বাক্যে আমার বিশ্বাস নাই, তখন আমার আস্তিকতা বা ভগবদ্‌ভক্তি এই সকলই যে মিথ্যা, কেবল বাহিরের – অন্তরের নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব যিনি যোগপথ অবলম্বন করেন নাই, তিনি বেদ উপনিষদ তন্ত্র মন্ত্রাদি কিছুই বুঝেন না। তন্ত্রে বা বেদ ও উপনিষদাদিতে যে সকল বীজ মন্ত্র আছে, তৎসমুদায় কেবল মুখে উচ্চারণ করিলে কোন ফল হয় না। উদ্ভিদ্‌বীজের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে যেমন বৃক্ষ থাকে, তদ্রূপ মন্ত্র সকলের মধ্যে ক্রিয়া সকল নিহিত রহিয়াছে। বৃক্ষাদির বীজ হইতে যেমন বৃক্ষাদি উৎপন্ন হইয়া ফলে ফুলে সুশোভিত হয়, তদ্রূপ তন্ত্রের বীজমন্ত্রগুলির চৈতন্য হইলে, মনুষ্য সম্পূর্ণরূপে সুশোভিত হয়। শরীররূপ যন্ত্রের মধ্যে তন্ত্র রহিয়াছে। সেই তন্ত্রের মধ্যে দুইটি মার্গ আছে – আগম ও নিগম। সেই আগম ও নিগমের মধ্যেই মন্ত্র রহিয়াছে। স্থির প্রাণই মন্ত্র; কেননা এই স্থির প্রাণের দ্বারাই মনের পরিত্রাণ হয়। সেই স্থির প্রাণ অর্থাৎ আত্মাই গুরু – "আত্মা বৈ গুরুরেকঃ" ইতি কুলার্ণবতন্ত্র। শ্রুতিও ইহা স্বীকার করিয়াছেন – "প্রাণো হ বৈ মাতা, প্রাণো হ বৈ পিতা, প্রাণো হ বৈ আচার্য্যঃ" ইতি শ্রুতিঃ। তন্ত্রও এই কথা স্বীকার করেন। তন্ত্রে পার্ব্বতী মহাদেবকে মন্ত্র শব্দের প্রকৃত অর্থ জিজ্ঞাসা করায় মহাদেব বলিয়াছেনঃ–

শিবাদিকৃমিপর্য্যন্তং প্রাণিনাং প্রাণবর্দ্ধনম্।
নিশ্বাসঃ শ্বাসরূপেণ মন্ত্রোঽহয়ং বর্ত্ততে প্রিয়ে।।

কুলার্ণবতন্ত্র।

অর্থাৎ শিবাদি কৃমিপর্য্যন্ত প্রাণিগণের শ্বাসরূপে যে নিশ্বাস বহিতেছে তাহাই মন্ত্র। ইহার দ্বারাই স্পষ্ট সপ্রমাণ হইতেছে যে, একমাত্র প্রাণবায়ুই মন্ত্র। তন্ত্রে যে সকল বীজ মন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ের অক্ষরে অক্ষরে প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণ বায়ুর বিবিধ ক্রিয়া নিহিত আছে। ষড়াম্নায়েও ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সেই ক্রিয়াসকলই মন্ত্র। মনুষ্য ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া, প্রথমে প্রাণায়াম -পরায়ণ এবং তৎপরে বায়ু স্থির হইলে, মোক্ষ-পরায়ণ হইয়া, ঐ বায়ুকে স্থিরত্বের শক্তির দ্বারা সাঙ্কেতিক স্থানে রাখিলেই মন্ত্র-চৈতন্য হয়; সেই সাঙ্কেতিক চিহ্নই বীজ। যেমন ক্রীং = (ক = মস্তক; র = বহ্নিবীজ, চক্ষু; ঈ = শক্তি; ং = বিন্দু); স্থির বায়ুকে শক্তিপূর্ব্বক মস্তকে লইয়া গিয়া চক্ষুতে রাখিলে, ওঁকারধ্বনি শুনা যায় এবং বিন্দুকে স্থিরভাবে দেখা যায়। সেই অব্যক্ত পরাশক্তিকে সহজে জানিবার উপায়সকল তন্ত্রের মধ্যে রহিয়াছে। গুরুর অভাবে তন্ত্রের মন্ত্র ও ক্রিয়া সকল বিপরীতভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে। উপযুক্ত মন্ত্রসকলকে যিনি ঘৃণা করেন, তাঁহার পাপ ও নরক হয়। অতএব মন্ত্রকে ঘৃণা না করিয়া, মন্ত্রের তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তাহার

কার্য্যের অনুষ্ঠানে যত্নবান্ হওয়া উচিত।

আমরা যে সকল প্রতিমা পূজা করিয়া থাকি, তৎসমুদায়ের গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। যোগীরা ছয় চক্রে ক্রমশঃ থাকিয়া যে যে মূর্তি অর্থাৎ ব্রহ্মের রূপ দর্শন করেন, –তৎসমুদায়ের প্রতিমূর্ত্তির নাম প্রতিমা। সুতরাং সে সকলও মিথ্যা নহে, সে সকলকে প্রস্তর বা মৃত্তিকা বলিয়া ঘৃণা করায় পাপ আছে। কারণ, বস্তুতঃ প্রতিমাসকল শিলা বা মৃত্তিকা নহে। অল্পবুদ্ধি সাধকদিগের হিতের জন্য যোগীরা প্রতিমাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রকৃতি-পুরুষে সংযতচিত্ত হইয়া অব্যক্ত পরাশক্তিতে যুক্তভাবে থাকার নাম "পূজা"। প্রকৃতি আদ্যা শক্তি, ভগবতী; তিনি সর্ব্বত্র সমানভাবে বিরাজ করিতেছেন। ভগবতীগীতায় ভগবতী হিমালয়কে বলিতেছেন ঃ–

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপককারণম্।।
নির্ব্বিকল্পং নিরারম্ভং সচ্চিচানন্দবিগ্রহম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে।।

অর্থাৎ আমার রূপ অতি সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, জ্যোতির্ম্ময়, বাক্যের অতীত; আমি ত্রিগুণাতীত, আমার অংশ নাই, আমি বিকল্পরহিত, আমার আদি নাই, আমি জ্ঞানানন্দস্বরূপ-বিগ্রহ, মুমুক্ষু ব্যক্তিরা আমাকে এইরূপে ধ্যান করিয়া দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হন। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, আমরা যে দেবদেবীর পূজা করিয়া থাকি, তাহা পুত্তলিকা পূজা নহে; তাহা সেই অব্যক্ত পরাশক্তিরই পূজা। কিন্তু উপযুক্ত লোকের অভাবে উহা এক্ষণে পুত্তলিকাপূজায় পরিণত হইয়াছে। বস্তুতঃ উহা মিথ্যা নহে; তবে অবিধিপূর্ব্বক পূজা হইয়া থাকে, –বিধিপূর্ব্বক হয় না। এই জন্য ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন ঃ–

যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্।।

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়, যাহারা ভক্তি * ও শ্রদ্ধা * সহকারে অন্য দেবতার আরাধনা করে, তাহারা (আমার স্বরূপ না জানিয়া ভেদবুদ্ধিতে) অবিধিপূর্ব্বক আমারই পূজা করিয়া থাকে। গীতাতে ভগবান্ আরও বলিয়াছেন যে, যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, সেই সংযতাত্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত ঐ সকল বস্তু আমি প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া থাকি।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।

---

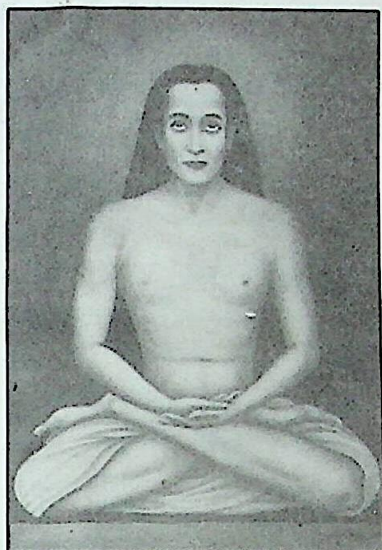
* শ্রীমদ্ভাগবদ্ গীতার ১২শ ও ১৭ শ অধ্যায়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধা উত্তম রূপে বিবৃত হইয়াছে।

কিন্তু সংযতাত্মা হইয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক দিতে হইবে। সংযতাত্মা না হইলে, প্রকৃত ভক্তি হয় না। সুতরাং যাহাতে সংযতান্তঃকরণ হওয়া যায়, অগ্রে তাহারই চেষ্টা করা উচিত; নচেৎ কিছুই হইবে না। বস্তুতঃ সংযতান্তঃকরণ হইতে না পারিলে, কোন কার্য্যেই আমাদের অধিকার নাই। যিনি সংযতাত্মা, তিনি সকল কার্য্যেই সক্ষম হইতে পারেন; নতুবা পূজাদিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যোগসাধনব্যতীত সংযতচিত্ত হইতে পারা যায় না। কার্য্য করিয়া সংযতচিত্ত না হইয়া, কেবল মুখে "আমি সংযতচিত্ত হইয়াছি" বলা আমার ভুল। তাহাতে নিজের ও অপরের অনিষ্ট করা হয় মাত্র।

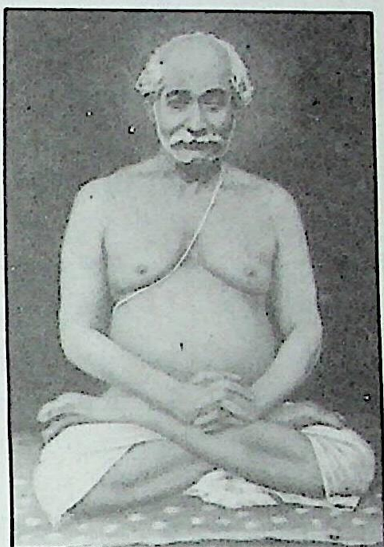
আমাদের এমন ভ্রমধারণা হইয়া গিয়াছে যে, প্রাণায়ামাদি যোগ-সাধন দ্বারা উৎকট রোগ এবং অবশেষে মৃত্যু পর্য্যন্তও হইতে পারে, আমরা এরূপ মনে করিয়া থাকি। ইহা অপেক্ষা দুঃখের, – ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? কি ভ্রমেই আমরা পড়িয়াছি!!! এতই ভ্রম যে, এমন দুর্লভ যোগরত্নকে আমরা ত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। যোগাভ্যাসে উৎকট রোগগ্রস্ত হওয়া দূরে থাকুক, সহস্র সহস্র ব্যক্তি যে তদ্দ্বারা উৎকট রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার অনেক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। তবে আমি যদি গুরুর উপদেশ মত না চলি এবং আপনাকে গুরু অপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান মনে করিয়া, স্বেচ্ছামত কার্য্য করি, তাহা হইলে কখনই আমার অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে না।

শরীরাভ্যন্তরে যে যে যন্ত্র আছে, তৎসমুদায়ই একমাত্র প্রাণবায়ুর দ্বারা পরিচালিত। এই প্রাণবায়ু শরীরের স্থানভেদে নানা আখ্যা ধারণ করিয়া, দৈহিক ও মানসিক কার্য্য সকল সমাধা করিতেছে। সেই বায়ু বিকার হইলেই দৈহিক ও মানসিক কার্য্যের বিপর্য্যয় ঘটে এবং সেই বিপর্য্যয় হইতেই রোগ শোকাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যোগাভ্যাস বা প্রাণকর্ম্ম ব্যতীত আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া থাকি, তাহাতেই আমাদের শ্বাসক্ষয় ও বায়ুর কিছু না কিছু বিকার হইয়া থাকে। কিন্তু প্রাণকর্ম্মের দ্বারা ঐ ক্ষয় নিবারিত ও ঐ বিকার তিরোহিত হয়। গুরুর উপদেশ মত প্রাণায়ামাদি কার্য্যের দ্বারা যিনি যে পরিমাণে সেই ক্ষয় ও বিকার নিবারণ করিতে সমর্থ হন, তিনি সেই পরিমাণেই দীর্ঘজীবন ও উন্নতি লাভ করিয়া থাকেন। যিনি তাহা না পারেন, তিনি রোগ শোকাদির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। যোগাভ্যাসে রত না হইলে লোকের যে দশা হয়, যোগাভ্যাসে রত হইলেও এরূপ ভ্রষ্ট ব্যক্তির সেই দশা ভিন্ন আর কি হইতে পারে ?

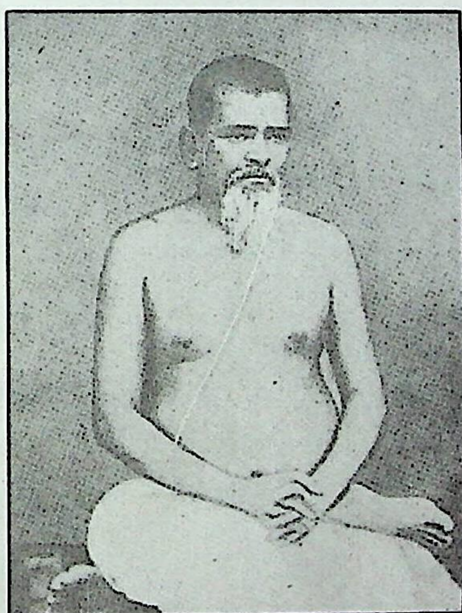
কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি গুরুর উপদেশ মত কার্য্য করিয়া, উৎকট উৎকট ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইয়াছেন, তখন যদ্দ্বারা বায়ুর



বাবাজী মহারাজ



শ্যামাচরণ লাহিড়ী



যোগাচার্য্য ৺পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য

বিকার নষ্ট হইয়া পীড়াদি আরোগ্য হয়, তাহা হইতে কখনই কোন অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। সুতরাং যোগাভ্যাসে রত হইলেও আমার নিজের দোষে যদি রোগাদি বা মৃত্যু হয়, তাহা হইলে, যোগাভ্যাসকেই ঐ সকলের কারণ বলা আমার বাতুলতা ও নির্বুদ্ধিতা নয় কি? আমি নিজের বুদ্ধিতে, গুরুর অমতে চলিয়া রোগগ্রস্ত হইলাম এবং তদুপদিষ্ট কার্য্যের রীতিমত অনুষ্ঠান না করায়, তাহা সারাইতেও পারিলাম না, ইহা আমার দোষ, না যোগাভ্যাসের দোষ? ইহাই যদি যোগাভ্যাসের দোষ হয়, তাহা হইলে ত পীড়াদি হইলে কাহারও কোন ঔষধ সেবন করাই উচিত নহে? কেননা অনেক স্থলে ত এক ঔষধের সর্ব্বত্র সমান গুণ দেখা যায় না। যে ঔষধে আমার উপকার হইল না, সেই ঔষধেই ঠিক আমার অনুরূপ পীড়ায় অপরের উপকার হইতেছে, ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে সেই ঔষধের সেই গুণ নাই বলা আমার পক্ষে বাতুলতা নয় কি?

যোগাভ্যাস করিলেই রোগ বা মৃত্যু হইবে, — এই ভয়ে সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত পরমপদপ্রাপ্তির এমন সহজ উপায়কে ভয়াবহ বলা সম্পূর্ণ উপহাসকর। তবে উপযুক্ত কর্ম্মীর নিকট ইহার উপদেশ লওয়া আবশ্যক; নচেৎ পদে পদেই বিপদের আশঙ্কা আছে। যখন প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে যে বায়ুর সামান্য বিকার হইতে উৎপন্ন রোগাদির ইহার দ্বারা শান্তি হইতেছে, তখন যে মহৎ বিকারে এই ভবরোগের উৎপত্তি, তাহা যে ইহার দ্বারা অবশ্যই অপসারিত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই। সান্নিপাতিক বিকারে রোগী যেমন নানা প্রকার প্রলাপবাক্য বলিয়া থাকে, অথচ নিজে জানে না যে, সে প্রলাপ বকিতেছে, তদ্রূপ আমরাও বায়ুর ঘোর বিকারে ভবরোগাক্রান্ত হইয়াও নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিতেছি না। সাধুদিগের সে বিকার নাই; সুতরাং বিষয় ও ইন্দ্রিয়ে তাঁহাদের আসক্তিও নাই। এজন্য তাঁহারা আমাদের সেই ভ্রম দেখিয়া, তন্নিবারণের জন্য প্রাণায়ামাদিরূপ উপায়ও শাস্ত্রে বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা এমনই ভ্রমান্ধ ও ঘোর নারকী যে, এই সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণ সত্ত্বেও প্রাণায়ামাদিরূপ সেই উৎকৃষ্ট যোগরত্নকে অত্যন্ত অপকৃষ্ট ও প্রাণনাশক বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকি!!!

যোগাভ্যাসের দ্বারা প্রথমতঃ শারীরিক উন্নতি হয়। পরে ক্রমশঃ রোগ-শোকাদির নাশ হওয়ায় আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে থাকে। তখন মন নির্ম্মল হইয়া, দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ হইতে থাকে। মন যতই স্বচ্ছ হয়, ততই তাহাতে ব্রহ্মের সত্তা প্রতিফলিত হইতে থাকে। তখন মনের চাঞ্চল্য দূর হওয়ায় জীবের স্থিরত্বপদ লাভ হয় এবং অপার আনন্দ-সহকারে অমরত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে। বস্তুতঃ প্রাণায়ামাদি যোগসাধন ব্যতীত ধারণা ধ্যান সমাধি লাভ করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন

যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য প্রাণায়ামের আবশ্যকতা নাই; কারণ প্রাণায়াম বায়ুসাধনমাত্র, —উহার দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপে সম্ভবে? কিন্তু শাস্ত্রাদি ও যুক্তি দেখিলে, তাঁহারা সহজেই ইহার মীমাংসা করিতে-পারেন।

শাস্ত্রে প্রাণায়াম সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন এবং প্রাণায়ামই বা কাহাকে বলে, এক্ষণে তাহারই বিচার করা হউক। রুদ্রযামলে ১৫শ পটলে লিখিত আছেঃ—

প্রাণায়ামো মহাধর্ম্মো বেদানামপ্যগোচরঃ।
সর্ব্বপুণ্যস্য সারো হি পাপরাশিতুলানলঃ।।
মহাপাতককোটীনাং তৎকোটীনাঞ্চ দুষ্কৃতম্।
পূর্ব্বজন্মার্জ্জিতং পাপং নানাদুষ্কর্ম্মপাতকম্।
নশ্যত্যেব মহাদেব ধন্যঃ সোঽভ্যাসযোগতঃ।।

অর্থাৎ প্রাণায়ামই মহা ধর্ম্ম, তাহা বেদেরও অগোচর, সকল পুণ্যের সার এবং সকল প্রকার পাপরাশিবিনাশক; ইহার দ্বারা কোটি কোটি মহাপাতক, কোটি কোটি দুষ্কর্ম্ম এবং পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত পাপসকল ও নানা দুষ্কর্মজনিত পাতক ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; যিনি এই প্রাণায়ামের অভ্যাস করেন, তিনি জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও ধন্য।

প্রাণায়ামাৎ খেচরত্বং প্রাণায়ামাদ্রোগনাশনম্।
প্রাণায়ামাদ্বোধয়েচ্ছক্তিং প্রাণায়ামান্মনোন্মনী।
আনন্দো জায়তে চিত্তে প্রাণায়ামী সুখী ভবেৎ।।

যোগশাস্ত্রম্।

অর্থাৎ প্রাণায়ামদ্বারা মনের শূন্যমার্গে বিচরণ করিবার ক্ষমতা জন্মে; প্রাণায়াম সাধনের দ্বারা নানা প্রকার রোগের বিনাশ হয়; পরমাত্মপ্রাপ্তির শক্তি উদ্বোধিত হয় এবং মনের উন্মীলনী শক্তির বিকাশ হয় অর্থাৎ দিব্যজ্ঞান লাভ হওয়ায় অপার আনন্দ হয়। প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তন্ত্রেও অনেক প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। যোগশাস্ত্রে উক্ত আছে যে, ব্রহ্মাদি দেবগণও প্রাণায়াম দ্বারা কালকে জয় করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেনঃ—

ব্রহ্মাদয়োঽপি ত্রিদশাঃ পবনাভ্যাসতৎপরাঃ।
অভুবন্নন্তকভয়াৎ তস্মাৎ পবনমভ্যসেৎ।।

হঠযোগপ্রদীপিকা।

উপনিষদেও প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায় এবং প্রাণায়ামের দ্বারা সকল প্রকার দোষের এবং সকল প্রকার পাপেরও নাশ হয় -

প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্।

কিল্বিষঞ্চ ক্ষযং নিত্যং হ্যচিরঞ্চৈব চিন্তয়েৎ।।

অমৃতবিন্দুপনিষৎ।।

প্রাক্‌কুলান্ পর্য্যুপাসীনঃ পবিত্রৈশ্চিব পাবিতঃ।

প্রাণায়ামৈস্ত্রিভিঃ পুতস্তত ওঙ্কারমর্হতি।।

মনুসংহিতা—২য় অ ৭৫ শ্লোক।

বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি হিন্দুর যে সকল প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তক আছে, তৎসমুদায়েই প্রাণায়ামের বিধি আছে। এমন কি, প্রাণায়াম ব্যতীত হিন্দুর কোন কার্য্যই হয় না। প্রাণায়াম সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। সাধু শ্রেণীর মধ্যেও প্রাণায়াম প্রচলিত আছে। গোরক্ষনাথ, নানক, তুলসীদাস, কবির প্রমুখ জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও যে শ্বাসক্রিয়ার দ্বারা ভগবৎসাধনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহারও ভুরি ভুরি প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে। ঋষিরাও যে প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা জীবন্মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত পাইয়াছিলেন, তাহারও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এমন কি, শুকদেব, যাঁহার বাল্যকালেই বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাকেও রাজর্ষি জনকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া প্রাণায়ামের দ্বারা স্বশরীরস্থ মেরুর শিখরে অর্থাৎ সুষুম্নার অভ্যন্তরে গিয়া সমাধিস্থ হইতে হইয়াছিল। যোগবাশিষ্ঠে মুমুক্ষুপ্রকরণে এই কথা লেখা আছে—

অনুশিষ্টঃ স ইত্যেবং জনকেন মহাত্মনা।

অতিষ্ঠৎ স শুকস্ত ষ্ণীং স্বচ্ছে পরমবস্তুনি।।

বীতশোকভয়ায়াসে নিরীহশ্ছিন্নসংশয়ঃ।

জগাম শিখরং মেরোঃ সমাধ্যর্থমনিন্দিতম্।।

যোগবাশিষ্ঠ—মুমুক্ষুপ্রকরণ।

অতএব সর্ব্ববাদি-সম্মত যে মত। তাহাই গ্রহণ করা উচিত। নচেৎ কোন একজন সামান্য মানবের মত শুনিয়া, ঋষিদিগের মত অগ্রাহ্য করা বাতুলতা বই আর কিছুই নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, বেদব্যাস প্রমুখ দেবতা ও ঋষিগণ অপেক্ষা আমাদের ন্যায় সামান্য মানবের বুদ্ধি কি বেশি? তাহাও স্বীকার করিতে পারিতাম, যদি আমাদের মধ্যে কেহ তাঁহাদের ন্যায় কার্য্য দেখাইতে পারিতেন। তাঁহারা শাস্ত্রে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, প্রকৃত অর্থ অবগত না হইয়া, আমরা ঐ সকলের বিপর্য্যয় ঘটাইয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের প্রতি অযথা কটু ভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকি। তাঁহাদের ভাষা বুঝিতে হইলে বুদ্ধিমান হওয়া চাই; নচেৎ বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদের ও তাঁহাদের বুদ্ধিতে অনেক প্রভেদ। তাঁহাদের সহিত তুলনা করিলে, আমাদের যে বুদ্ধি নাই, একথা বলায় অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সর্ব্বদা ব্রহ্মে যুক্ত থাকিতেন এবং ব্রহ্মে যুক্ত

থাকিয়াই সমস্ত করিতেন বা বলিতেন। সুতরাং তাঁহারা যাহা যাহা বলিয়াছেন, তৎসমস্তই ব্রহ্মেরই বলা হইয়াছে। ব্রহ্মবাক্য অগ্রাহ্য করা অযুক্ত ব্যক্তির উচিত নহে। অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই; কারণ, মনের চঞ্চল অবস্থায় নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি হইতে পারে না। মন যুক্ত না হইলে, (অর্থাৎ একে লাগিয়া না থাকিলে,) কখন স্থির হয় না ও নানা বিষয়ে রত হয়। ইহা নিজে নিজে অনুভব করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। একারণ ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন ঃ—

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।

অর্থাৎ অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই এবং ভাব (অর্থাৎ অবস্থা বিশেষ) নাই; যাহার ভাব নাই, তাহার শান্তি কোথায়? যেমন একের অভাবে কিছুই থাকে না, তদ্রূপ যুক্ত হইতে না পারিলে, আত্মভাবনা ও শান্তি কিছুই থাকে না। অতএব অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি লইয়া চলিতে গেলে, আমাদের পদে পদে বিপদে পড়িতে হয়। বিপদের আর বাকিই বা কি আছে? যাহা ঘটিয়াছে, তাহা কি যথেষ্ট নহে? আর কেন বিপদ জড়াইয়া রাখি; আর ভ্রমে পড়িয়া থাকা ভাল দেখায় না।ঋষিরা যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া কার্য্য করা উচিত। প্রাণায়াম সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত এবং সকল সাধুগণও একবাক্যে প্রাণায়ামের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এমন উৎকৃষ্ট রত্নকেও আমরা সামান্য বায়ুসাধন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকি!! প্রাণায়াম যে কি পদার্থ, তাহা আমাদের বুঝিবারও চেষ্টা নাই — ইহা অপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি আছে?

বায়ুই যদি প্রাণ হইত, তাহা হইলে মৃত্যুর পরে দেহও বায়ুশূন্য হইত। কিন্তু প্রাণিগণ মরিয়া যাইলে দেখা যায় যে, মৃত দেহের মধ্যেও বায়ু থাকে; কেন না, মৃত দেহের মধ্যে বায়ু একেবারে না থাকিলে, বাহিরের বায়ুর চাপ উহাকে চেপ্‌টাইয়া পাতলা করিয়া ফেলিত। আজকালের বৈজ্ঞানিকেরাও এ কথা স্বীকার করিয়া থাকেন। আরও এক কথা, —এই বায়ুই প্রাণ হইলে, 'পম্প' দ্বারা মৃত দেহের অভ্যন্তরে কিয়ৎ পরিমাণ বায়ু প্রবেশ করাইয়াও ঐ শব দেহের চৈতন্য উৎপাদন করিতে পারা যাইত। অতএব বাহিরের এই বায়ু যে প্রাণ নহে, তাহা এই যুক্তির দ্বারাই প্রমাণীকৃত হইতেছে। এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে প্রাণকে কি বলিয়াছেন ঃ—

প্রাণো হি ভগবানীশঃ প্রাণো বিষ্ণুঃ পিতামহঃ।
প্রাণেন ধার্য্যতে লোকঃ সর্ব্বং প্রাণময়ং জগৎ।।

অর্থাৎ প্রাণই ভগবান্ ঈশ্বর, প্রাণই বিষ্ণু, প্রাণই পিতামহ ব্রহ্মা; প্রাণই সমস্ত জীবকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন এবং সমস্ত জগৎই প্রাণময়। ঈশ্বর বলিয়াছেন —

অব্যক্তাজ্জায়তে প্রাণঃ প্রাণাদুৎপদ্যতে মনঃ।
মনসোৎপদ্যতে বাচো মনো বাচা বিলীয়তে।।

অর্থাৎ অব্যক্ত হইতে প্রাণের উৎপত্তি, প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি, এবং মনের দ্বারা বাক্যের উৎপত্তি ও বাক্যের দ্বারা মনের লয় হইয়া থাকে। যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, অর্থাৎ যাহা শূন্যেরও (শূন্যকেও শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়াছেন) অতীত তাহাই অব্যক্ত। অব্যক্ত হইতে উৎপন্ন সেই প্রাণই আত্মা–"আত্মা "বৈ গুরুরেকঃ" অর্থাৎ আত্মাই একমাত্র গুরু। সেই গুরুই আমার প্রাণ –"আচার্য্যো হ বৈ প্রাণঃ" ইতি শ্রুতিঃ। এই সকল প্রণাম দ্বারা জানা যাইতেছে যে, প্রাণায়ামাভ্যাসী সাধকেরা সামান্য বায়ুর সাধন করেন না; তাঁহারা প্রাণের সাধন করায় আত্মারই সাধন করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে দেখিতে গেলে, ইহা জীব মাত্রেরই স্বধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম সকলেরই পালন করা আবশ্যক এবং ইহার অকরণে প্রত্যবায় আছে। গীতাতেও ভগবান্ একথা বলিয়াছেন ঃ–

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।

অর্থাৎ সুন্দররূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা সদোষ স্বধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ; স্বধর্ম্মে মৃত্যুও ভাল, পরধর্ম্ম ভয়াবহ। এক্ষণে দেখা যাউক, পরধর্ম্ম কাহাকে বলে। আমরা হিন্দু ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য সকল ধর্ম্মকে পরধর্ম্ম বলিয়া থাকি। তদ্রূপ মুসলমানেরা মহম্মদের ধর্ম্ম ব্যতীত ও খ্রীষ্টিয়ানেরা যীশু খ্রীষ্টের ধর্ম্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত ধর্ম্মকেই পরধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। সুতরাং ধর্ম্ম লইয়া পরস্পর বিবাদ বিসংবাদও ঘটিয়া থাকে। হায়! কি পরিতাপের বিষয়– ধর্ম্মও পৃথক্ হইয়া গিয়াছে!!! আমাদের শাস্ত্রে বলে– ভগবান্ জীব মাত্রেরই হৃদয়ে আছেন অর্থাৎ নারায়ণ প্রতি ঘটেই বিরাজমান। তবে মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানের ঘটে কি নারায়ণ নাই? যদি বলা যায় যে, মুসলমান বা খ্রীষ্টিয়ানের দেহে নারায়ণ নাই, কেবল হিন্দুর দেহেই আছেন, তাহা হইলে হয় শাস্ত্র ভুল, না হয় আমি অজ্ঞানী। বাস্তবিক শাস্ত্র কখনই ভুল হইতে পারে না, সাধন অভাবে প্রকৃত ভাব অবগত হইতে না পারায়, অজ্ঞান বশতঃ আমারই ধর্ম্মাধর্ম্ম ভেদজ্ঞান হইতেছে। ধর্ম্ম কখনও পৃথক্ হইতে পারে না। তবে যে ভগবান্ গীতায় স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম এই দুইটি কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্থ যদি এরূপ বুঝা যায় যে, হিন্দুধর্ম্মই হিন্দুর স্বধর্ম্ম এবং তদ্ব্যতীত অন্য ধর্ম্ম হিন্দুর পরধর্ম্ম, তাহা হইলে, ভগবানে দোষ অর্শে। আমরা ঐরূপ বলিলে, দোষ হইতে পারে না; কিন্তু ভগবানের মুখে ইহা শোভা পায় না; কেননা, ভগবানের সকলকে সমান চক্ষে দেখা উচিত; এবং সমান চক্ষে না দেখিলে, তাঁহাকে পক্ষপাতিতা দোষে লিপ্ত হইতে হয়। সুতরাং উহা কখনই প্রকৃত অর্থ হইতে পারে না। প্রকৃত পক্ষে "আপনার" ধর্ম্মই

স্বধর্ম্ম। এখন দেখা যাউক, আপনি কে? এই হাড়মাসবিশিষ্ট দেহ 'আমি' বা 'আপনি' নহি। কারণ, আজ যদি 'আমার' বা 'আপনার' প্রাণ না থাকে, তাহা হইলে, 'আমি' বা 'আপনি' কোথায়? তখন দেহ পড়িয়া থাকিবে অথচ আমি বা আপনি থাকিব না। প্রাণই সে আত্মা – আত্মার অস্তিত্বেই 'আমার' বা 'আপনার' অস্তিত্ব; আত্মা নাই ত 'আমি' বা 'আপনি' ও নাই। সেই আত্মাই শ্বাসরূপে সর্ব্বজীবে এবং বৃক্ষাদিতেও বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মার ধর্ম্মই স্বধর্ম্ম 'কারণ' ''স্ব'' = আত্মা বা আপনি। সুতরাং আত্মার ধর্ম্ম বা আপনার ধর্ম্মই জীবমাত্রেরই স্বধর্ম্ম। সেই আত্মার ধর্ম্মে রত থাকার নাম স্বধর্ম্ম পালন করা এবং তাহাতেই রত থাকিয়া যদি নিধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও শ্রেয়ঃ; কিন্তু পরধর্ম্ম সর্বদা ভয়াবহ। পরধর্ম্মে সর্বদা বিরত থাকা উচিত; কারণ, পরধর্ম্মে সর্ব্বদা বিপদের আশঙ্কা আছে। সেই পরধর্ম্ম কি? আত্মাকে যাহারা জানিতে দেয় না, তাহারাই 'পর' অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ। অতএব ইন্দ্রিয়গণের যে ধর্ম্ম, তাহাই পরধর্ম্ম। সুতরাং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইহাদের ধর্ম্মে আসক্তির সহিত রত হওয়া উচিত নয়। আসক্তির সহিত ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মে রত হইলেই বিপদের আশঙ্কা আছে; সুতরাং উহা ভয়াবহ এবং সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করা উচিত। ইহাই উক্ত শ্লোকের ভাবার্থ।

অতএব শাস্ত্রাদি এবং যুক্তিদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, প্রাণায়ামই মহাধর্ম্ম এবং ভগবৎসাধনের প্রধান উপায়। সুতরাং এই প্রাণায়াম জীব মাত্রেরই কর্ত্তব্য এবং ইহাকেই 'সহজ কর্ম্ম' বলে। সহজ অর্থাৎ জন্মের সহিত যা পাওয়া যায়। আমরা একমাত্র প্রাণকেই জন্মের সহিত পাইয়াছি; সুতরাং প্রাণকর্ম্মই আমাদের সহজ কর্ম্ম। যদি বলা যায় যে, এই দেহও ত আমরা জন্মের সহিত পাইয়াছি, তবে এই দেহের ধর্ম্ম আমাদের স্বধর্ম্ম নহে কেন? তাহার কারণ এই যে, প্রাণের অভাবে দেহের অস্তিত্ব থাকে না,–দেহ পচিয়া যায়। অতএব প্রাণকর্ম্মই আমাদের সহজ কর্ম্ম –যাহা আপনা আপনি হইতেছে। সেই প্রাণের বৃদ্ধি করার নামই 'প্রাণায়াম'। গীতাতেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেনঃ–

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধুমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ।।

অর্থাৎ জন্মের সহিত যে কর্ম্ম পাওয়া গিয়াছে, তাহা দোষযুক্ত হইলেও কোন ক্রমেই ত্যাগ করিবে না; কারণ সকল কর্ম্মই আরম্ভ-মুখে ধূমাবৃত অগ্নির ন্যায় কোন না কোন দোষে-যুক্ত থাকে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নিগূঢ় তত্ত্বাবলি ''বিবর্ত্ত বিলাস'' নামক পুস্তকেও লেখা আছে–

সহজ সাধন সহজ ভজন ইহা ছাড়া কিছুই নাই।

ছাড়ি জপ তপ করহ আরোপ ঐক্যতা করিয়া মনে।

এক কালে শ্রীরূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, শ্রীজীব গোস্বামী, নিত্যানন্দ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব চূড়ামণিগণ সহজরূপ প্রাণায়ামের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হইয়া, ঐ সহজ কর্ম্মের দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং উহার প্রচারের জন্য বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবনধাম হইতে নবদ্বীপ ধামে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, কালে তাহা বিলুপ্ত হইয়া কেবল বাক্যে পরিণত হইয়াছে। সকল সম্প্রদায়ই বিলাসিতায় পুর্ণ। সাধন নাই, কেবল নাম আছে,—আর "ভেক্" আছে। এই ভেকের জ্বালায় অস্থির,—কেবল ডাক্ আছে, কাজ নাই। সুতরাং যেমন গুরু, তেমনি চেলাও হইতেছে। তাহাতে চেলার দোষ কি? আমরা ইচ্ছা করিয়া নিজের পায়ে নিজে নিজেই কুঠারাঘাত করিয়াছি; সুতরাং সে দোষ অন্যের নহে, আমাদের নিজের দোষেই এই সর্ব্বনাশ হইয়াছে ও হইতেছে। পরিণামে আরও যে কি হইবে, তাহাই বা কে জানে? ইহাতেও আমাদের চৈতন্য হয় না!!! কত কালে যে হইবে, তাহারও ঠিক নাই। এখনও যদি আমরা আলস্য ও বিলাস ত্যাগ করিয়া, সদ্গুরুর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই এবং সাধন আরম্ভ করি, তাহা হইলে, ভারতের পূর্ব্ব গৌরব পুনরায় উদিত হইতে পারে এবং আমরাও যে আর্য্য সেই আর্য্য হইতে পারি। এখনও আমাদের আর্য্যসন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে ঘৃণা বা লজ্জা হয় না? কি ছিলাম, আর কি হইয়াছি!!! আর সহ্য হয় না, দুঃখে চক্ষু ফাটিয়া জল আইসে। আসুন, একবার সকলে মিলিয়া আলস্য ও বিলাসিতা ত্যাগ করিয়া, পূর্ব্বকীর্ত্তি দেখাইবার চেষ্টা করি,—সাধন আরম্ভ করি। উঠুন, আর নিদ্রা যাইবেন না। এখন এত দুরবস্থায় পা ছড়াইয়া নিদ্রা যাওয়া আর ভাল দেখায় না। একদিন ত পা ছড়াইয়া শয়ন করিতেই হইবে! যাহার সম্মুখে কাল লাঠি হস্তে দণ্ডায়মান,তাহার কি নিদ্রা যাওয়া উচিত? না সেই কালেরই শরণাপন্ন হওয়া উচিত। উঠুন আর নিদ্রা যাইবেন না। এখন সেই কালেরই শরণাপন্ন হউন, সর্ব্বদা সেই কাজের প্রতি লক্ষ্য করুন। তাহা হইলেই কালের হাত এড়াইয়া কালাতীত হইতে পারিবেন। সেই কালই আপনার প্রাণ। কারণ, মহাকাল ঘটস্থ হইয়া কাল উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছে। কাল শব্দে সময়। এই ঘটস্থ কালের সংখ্যা হইতে আমরা সময় পাইয়াছি; নচেৎ মহাকাল অনন্ত, তাহার সংখ্যা নাই। এই সংখ্যা হইতেই সাংখ্য এবং ইহাই অজপা, যাহা ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছে। আর এই কালেরই আদি অন্ত ও মধ্য শূন্য: কারণ সেই অনন্ত কাল যখন ঘটস্থ হন নাই, তখনও শূন্য অর্থাৎ ঘটের আদি ও অন্তে শূন্য। যাহার আদি ও অন্তে শূন্য, তাহার মধ্যাবস্থাও শূন্য। এই কারণেই শাস্ত্রে কালরূপী প্রাণকে শূন্য বলিয়াছেন—"শূন্যধাতু ভবেৎ প্রাণঃ"। তিনিই রুদ্ররূপে সংহার করিয়া

থাকেন। যাহাতে তিনি সংহার না করেন, তাহা করুন, জাগিয়া থাকুন আর ঘুমাইবেন না। জাগিয়া থাকিলে আর চুরি হইবে না; জাগ্রত ঘরে কখনও চুরি হয় না। লক্ষ্যচ্যুত হইলেই চুরি হইবে, অতএব সাবধান হউন। যাহাতে সর্ব্বদা আপনার প্রাণে লক্ষ্য থাকে, তাহা করুন। যে অবস্থায় সর্ব্বদা আপনা আপনি প্রাণে লক্ষ্য থাকে তাহা সহজাবস্থা। ইহা অত্যন্ত দুর্লভ এবং গুরুপদেশ ব্যতীত কথায় মিলে না। গুরুকৃপা বিনা ইহা পাইবার উপায়ন্তর নাই –

দুর্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা।।

হঠযোগপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ সদ্‌গুরুর করুণা বিনা বিষয়াসক্তি ত্যাগ হওয়া দুর্লভ, তত্ত্বদর্শনও দুর্লভ এবং সহজাবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও দুর্লভ।

উৎপন্নশক্তিবোধস্য ত্যক্তনিঃশেষকর্ম্মণঃ।
যোগিনঃ সহজাবস্থা স্বয়মেব প্রজায়তে।।

অর্থাৎ যাঁহার কুন্ডলিনী শক্তির জ্ঞান জন্মিয়াছে,যিনি কায়িক ও মানসিক কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ যোগীর স্বতই সহজাবস্থা উপস্থিত হয়। কবির সাহেব প্রভৃতি জীবন্মুক্ত পুরুষেরাও "সহজ" সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন -

কবির সহজ হি ধুণি লাগি রহে, সেত এহত ঘট্ মাহি।
হৃদে হরি হরি হোৎ হ্যায়,মুখ কি হাজত নাহি।।

অর্থাৎ সহজরূপে ধুনি এই শরীরের মধ্যেই লাগিয়া রহিয়াছে এবং তাহাতেই আপনা আপনি হরি হরি হইতেছে, মুখে চীৎকার করিবার আবশ্যক নাই। ফলকথা, সহজ যে প্রাণ–যাহা আপনা আপনি চলিতেছে–তাহাতেই লক্ষ্য করিয়া থাক; তাহা হইলেই সব জানিতে পারিবে; তখন আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।

বস্তুতঃ শাস্ত্র এবং যুক্তির দ্বারা দেখিতে গেলে, প্রাণায়াম যে ভগবৎ-সাধনের রাজপথ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যে পথে সকলেই যাইতে পারে, সকলেই যাইতে সমর্থ এবং সকলেরই সমান অধিকার আছে, তাহাই রাজপথ। প্রকৃত প্রস্তাবে আত্মাই রাজা এবং আত্মার পথই রাজপথ। সে পথে যাহার যাইতে ইচ্ছা, সেইই যাইতে পারে। সেই আত্মাই প্রাণ এবং প্রাণই আত্মা। সুতরাং সে পথে যাইতে কাহারও বাধা নাই,– সকলেই সকল অবস্থাতেই যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়দিগের যে পথ, তাহা রাজপথ নহে, কেননা, তাহাতে সকলের সমান অধিকার নাই। মনে করুন, আমি সূর্য্যের বা অগ্নির উপাসনা করিব; কিন্তু আমার দর্শনেন্দ্রিয় বা চক্ষু নাই। চক্ষুর অভাবে আমার সূর্য্যের বা

অগ্নির রূপদর্শন অর্থাৎ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইল না। তবে কল্পনায় হইতে পারে বটে, কিন্তু কল্পনা সত্যও হইতে পারে,—মিথ্যাও হইতে পারে; কল্পনায় নিশ্চয়ই জ্ঞান হয় না। সুতরাং ইহা অসম্পূর্ণ। অতএব যাহা অসম্পূর্ণ এবং যাহাতে সকলের অধিকার নাই, তাহা কখনই রাজপথ হইতে পারে না। এইরূপ কর্ণের দ্বারা শব্দাদির উপাসনা করাও রাজপথ নহে; কেননা, শ্রবণ-শক্তির অভাবে শব্দাদির সাধন কখনই হইতে পারে না। সুতরাং ইহাও পরিত্যাজ্য; যেহেতু ইহাতেও অনেক বাধা বিঘ্ন আছে ও সকলের সমান অধিকার নাই। তেমনি যাঁহারা বাক্যের দ্বারা সাধন করিয়া থাকেন তাঁহাদেরও বাক্‌শক্তির অভাব হইলে, আর সাধন হইতে পারে না। কাজে কাজেই ইহাতেও বাধা বিঘ্ন থাকায় তাহাও সকলের পক্ষে সুপথ নহে। তদ্রূপ যাঁহারা ঘ্রাণের বা স্পর্শের দ্বারা মনের লয়সাধন করিয়া থাকেন, তাঁহারাও ঘ্রাণেন্দ্রিয় বা চর্ম্মরোগে স্পর্শেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে, মনের লয় করিতে অক্ষম হন। সুতরাং ইহাও রাজপথ নহে। রাজপথে ইন্দ্রিয়শক্তির অভাব হইলেও কোনরূপে যাওয়া যায়। তবে বলিতে পারেন যে, আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব হইলে, শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাবে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধন করিব; আমার ত একেবারে সকল শক্তিরই অভাব হইবে না,—একের অভাবে অন্যের দ্বারা সাধন করিব, তাহাতে আর ক্ষতি কি? একেবারেই যে নাই, এমত নহে। কারণ, রূপ দর্শন করে কে? চক্ষু কি দর্শন করে? কখনই না। চক্ষু দর্শনের দ্বারস্বরূপ; চক্ষুতে মনঃসংযোগ না হইলে, দর্শন হয় না। তদ্রূপ কর্ণের দ্বারা শব্দ শুনা। শব্দ শুনে কে? আমি শব্দ শুনিতে বসিলাম; কিন্তু আমার মন ওদিকে হাটবাজার করিতে লাগিল। মনের স্বভাবই এই যে, সে এক বস্তুতে কখনই স্থির থাকে না। অতএব অগ্রে মন স্থির কর, তাহার পর দর্শন বা শ্রবণ করিও।

মনের স্থিরতা ব্যতীত কিছুই হয় না। ব্যাকরণবোধ না থাকিলে যেমন সাহিত্য বা দর্শনাদি শাস্ত্রে কোন জ্ঞান জন্মে না, তদ্রূপ মনের স্থিরতা ব্যতীত একেবারে কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সাধন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। কোন কার্য্যই হয় না,—ভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব ইন্দ্রিয়ের পথ রাজপথ নহে। না হয় স্বীকার করিলাম যে, ইন্দ্রিয়ের পথও রাজপথ; কিন্তু মনে করুন, একজন বোবা, যাহার বাক্‌শক্তি ও শ্রবণশক্তি দুইই নাই— বোবা হইতেই বধির হয়—এবং তৎসঙ্গে বসন্ত রোগে তাহার চক্ষু নষ্ট হওয়ায় দর্শনশক্তিরও অভাব হইয়াছে; নাসা রোগে তাহার ঘ্রাণশক্তিও গিয়াছে; চর্ম্মরোগে সে স্পর্শ অনুভব করিতে পারে না —এমন অবস্থায় এরূপ ব্যক্তির কি উপায় হইবে? তাহার কি সাধন হইবে না? সে কিরূপে সাধন করিবে? যদি বলা যায় যে, এমন অবস্থাপন্ন পাপী ব্যক্তির সাধন না হওয়াই ভাল; কেননা, যাহার একেবারে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই অভাব হইয়াছে,

এমন মহাপাপীর উদ্ধার না হওয়াই ভগবানের অভিপ্রেত। এই বাক্য প্রয়োগ করা আমার ন্যায় লোকের পক্ষে শোভা পায়; কিন্তু যিনি সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁহার চক্ষে ত সকলেই সমান। আমার চক্ষে পাপাত্মা পুণ্যাত্মায় প্রভেদ থাকিতে পারে; কিন্তু যিনি সর্ব্বত্র অভেদজ্ঞানে সমদর্শী, তাঁহার সম্বন্ধে একথা বলা কখনই শোভা পায় না।

বিশেষতঃ পুরাণাদি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় যে, উৎকট উৎকট মহাপাপীও ভগবৎ-সাধন দ্বারা উদ্ধার পাইয়াছে; অতএব অবশ্যই এরূপ ব্যক্তিরও সাধনের উপায় আছে। সে উপায়ই কেবল রাজপথ; ইন্দ্রিয়ের পথ রাজপথ নহে। তাহার ইন্দ্রিয় শক্তিরই অভাব হইয়াছে; কিন্তু যে শক্তির দ্বারা সমস্ত জীব চালিত হইতেছে, তাহার সে শক্তির ত অভাব হয় নাই। সে শক্তির অভাব হইলে, সে ব্যক্তি মরিয়া যাইত। অতএব সেই শক্তির দ্বারা সে ব্যক্তি পরাশক্তির সাধন করিতে পারে। সেই শক্তিই আমাদের প্রাণ, যাহা প্রত্যেক ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছে। ইহা কেহই বলিতে পারেন না যে, আমার প্রাণ নাই। প্রাণ সকলেরই আছে; কিন্তু সেই প্রাণে কাহারও লক্ষ্য নাই। এই প্রাণের সাধন সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই হইতে পারে। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে যে সকল কর্ম্মকান্ড ও পূজাপদ্ধতি আছে, প্রায় তাহার সকলগুলিতেই প্রাণায়ামের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। তবে প্রকৃত উপদেষ্টার অভাবে সেই প্রাণাযামের প্রকারভেদ হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ প্রাণায়াম ব্যতীত হিন্দুর প্রায় কোন কর্ম্মই নাই। অতি অল্প কর্ম্মই আছে, যাহাতে প্রাণায়াম নাই। বাস্তবিক প্রাণায়ামই যে রাজপথ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই; কিন্তু কি দুঃখের বিষয়, এমন উৎকৃষ্ট উপায়কেও লোকে ভ্রমে পড়িয়া সামান্য বায়ুসাধন বলিয়া ঘৃণা করিয়া থাকে। আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ যে, যাহার দ্বারা সকল কাজ করিতেছি, —যাহার অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব,—যাহা না থাকিলে, আমি নাই, দিনান্তে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সেই প্রাণের প্রতি লক্ষ্য করি না। আজ যদি আমার প্রাণ না থাকে, তাহা হইলে, সাধনই বা কে করিবে এবং ঐশ্বর্য্যই বা কে ভোগ করিবে!!! আজ আমায় লোকে মান্য করিতেছে,—আদর করিতেছে, —আমার নিকট বসিতে ইচ্ছা করিতেছে, এবং আমিও ভাবিতেছি যে আমি একজন গণ্যমান্য লোক হইয়াছি; কিন্তু একবারও ভাবি না যে, এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণবিয়োগ হইলে, আমার আর কিছুই থাকিবে না। একবারও ভাবি না যে, যাহারা এখন আমায় মান্য করিতেছে,—এত আদর ও যত্ন করিতেছে, এক প্রাণের অভাবে তাহারাই আমায় ঘৃণা করিবে; কেহই আমায় স্পর্শ করিবে না। তখন আমি শবে পরিণত। একদিন সৎকার করিতে বিলম্ব হইলে, আমার এই দেহ পচিয়া দুর্গন্ধময় হইবে। সুতরাং তখন আর কেহই আমার কাছে আসিবে না; সকলেই নাকে কাপড় দিয়া দূরে পলায়ন করিবে এবং বিষ্ঠা অপেক্ষাও আমায় ঘৃণা করিবে। তখন আমার মৃত দেহ

বহন করিবার ভয়ে অনেকেই বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইবে। তখন স্ত্রীপুত্রবন্ধুবান্ধব কাহারও নিকট আমার আদর নাই, সকলেই আমাকে হতাদর করিবে।

দেখুন এক প্রাণের অভাবে আমার কি দুদর্শা!!! এমন হিতকারী ও স্বার্থশূন্য বন্ধু আমাদের আর কে আছে!!! এমন নিঃস্বার্থ বন্ধুর প্রতি আমাদের অনেকেরই লক্ষ্য নাই; বরং তাহার প্রতি ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যই করিয়া থাকি। এই কি আমাদের বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার!!! হায়, আমাদের ন্যায় অকৃতজ্ঞ জগতে আর কে আছে!!! যাহার একমাত্র প্রাণই সম্বল, সেই প্রাণের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া তাহার কি এমন নিশ্চিন্ত থাকা উচিত? আমাদের জামার পকেটে একটি টাকা থাকিলে, পনেরবার তাহাতে লক্ষ্য করি, পাছে টাকাটি পড়িয়া বা হারাইয়া যায়! কিন্তু একবারও ভাবি না যে, প্রাণ না থাকিলে ঐ টাকা কে ভোগ করিবে। টাকা থাকিলে সুখী হইব—এই ভ্রমেই আমাদের টাকার প্রতি এত যত্ন! কিন্তু জগতে আজ পর্য্যন্ত কেবল টাকার দ্বারা কেহ কি কখনও সুখী হইয়াছেন? কেহই না। অনেকেরই ত টাকা আছে দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও ত প্রকৃত প্রস্তাবে সুখী দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং তাঁহারা সর্ব্বদাই শান্তি-সুখে বঞ্চিত। অতুল ঐশ্বর্য্য রহিয়াছে,অথচ শরীর লইয়া এমনি ব্যতিব্যস্ত যে, ভোগবিলাসের জিনিস সম্মুখে থাকিলেও তাঁহাদের ভোগ করিবার ক্ষমতা নাই!!! তাহার উপর বিষয়চিন্তা তুষাগ্নির ন্যায় নিরন্তর অন্তঃশরীর দগ্ধ করিতেছে। সুতরাং ইহা অপেক্ষা কষ্ট আর কি হইতে পারে? প্রাণের প্রতি লক্ষ্য না রাখাই এই কষ্টের একমাত্র কারণ। প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে, শরীর ও মন উভয়ই সুস্থ থাকে এবং প্রকৃত সুখ ও প্রকৃত শান্তি লাভ হয়; নতুবা কেবল ধনের দ্বারা প্রকৃত সুখ কখনই হয় না। প্রকৃত সুখ লাভ করিতে হইলে , নিজের মনকে প্রাণের প্রতিরাখিতে হয় এবং সর্ব্বদা প্রাণের উপর লক্ষ্য রাখিতে রাখিতে মন ও প্রাণ উভয়ই শীতল হয় এবং প্রকৃত সুখও অনুভূত হয়। প্রাণের এই স্থিরাবস্থাই সাধুদিগের একমাত্র দাঁড়াইবার স্থান; ইহা ব্যতীত তাঁহাদিগের অন্য স্থান আর নাই। মহাত্মা কবিরও এই কথা বলিয়াছেন —

কবির অজপা সুমিরণ হোৎ হ্যায় কহো শন্ত কো হি ঠোর।
কর জিহ্বা সুমিরণ করে এই সব মন কি দৌড়।।

অর্থাৎ অজপা স্মরণই সাধুদিগের দাঁড়াইবার একমাত্র স্থান; করের দ্বারা মালা জপ বা জিহ্বার দ্বারা নাম জপ করা এ সকল মনের দৌড় মাত্র। উহাতে কাজ কিছুই হয় না।

কবির অজপা সু্মিরণ হোৎ হ্যায় শূন্য মন্ডল অবস্থান।
কর জিহ্বা তঁহা না চলে মন পঙ্গুল তঁহা জান।।

অর্থাৎ অজপা স্মরণের দ্বারা শূন্য মন্ডলে অবস্থান হয়; কর ও জিহ্বা সেখানে যাইতে পারে না, – খঞ্জ হইয়া যায়।

কবির মাঁলা কাঠকি বহুৎজন করি ফের।
মালা ফের শ্বাস কী যাহে গাঁঠি নাহি সুমের।।

অর্থাৎ কাঠের মালাও অনেকেই ফিরাইয়া থাকে; তাহাতে কিছুই হইবে না; শ্বাসের মালা ফিরাও, যাহাতে সুমেরুর গাঁট নাই। (মালার সংখ্যা যেখানে শেষ হয় সেইখানে একটি বড় মালা থাকে, সেই মালাটিকে সুমেরু কহে। কাঠের মালায় এই সুমেরু থাকে। ইহার দ্বারা জানা যায় যে, কবির সাহেবও প্রাণায়ামের পক্ষপাতী ছিলেন; প্রাণায়াম ব্যতীত জীবের যে অন্য উপায় নাই, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন)। সাধু গোরক্ষনাথ ও তুলসীদাস এবং গুরু নানক ইঁহারাও যে অজপাকে লক্ষ্য করিয়া অনেক উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ প্রাণায়াম যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। অতএব ইহা যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া দেখা যাইতেছে, তখন উহা না করিলে প্রত্যবায় আছে।

মনে করুন, প্রাণ না হয় বায়ুই হইল, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? এই বায়ুই প্রাণ হইলে তাহাই ত আমাদের জীবন,—তাহার অস্তিত্বেই ত আমাদের অস্তিত্ব। তবে কেন তাহার সাধনা না করি? বায়ুকেও ঘৃণা করা উচিত নহে; কেননা বায়ুও সামান্য পদার্থ নহে। শাস্ত্রেই বা বায়ুকে কি বলিয়াছেন, তাহাও দেখা যাউক।

বায়ুরায়ুব লং বায়ুর্বায়ু র্ধতা শরীরিণাম্।
বায়ুঃ সর্ব্বমিদং বিশ্বং প্রভুরায়ুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।।

ইহার দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, বায়ুসাধনও অকরণীয় নহে। অতএব প্রাণায়ামসাধন মানবমাত্রেরই করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রাদি অপর জাতি প্রাণায়ামাদি যোগদান করিতে পারে না; কারণ, ব্রহ্মবিদ্যা শূদ্রাদির আলোচ্য নহে বলিয়া শাস্ত্রে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় শূদ্রাদিরা কি করিবে? পরন্তু প্রাণায়াম যোগসাধন করিবার অধিকার সকলের আছে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার সময়ও এই কথা বলিয়াছেন ঃ–

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্।।

অর্থাৎ পরমাত্মাকে আশ্রয় করিলে, পাপযোনিই হউক, কিংবা স্ত্রীলোকই হউক, বা শূদ্র কিংবা বৈশ্যই হউক, তাহারাও পরমা গতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ভগবানের এই কথার

সহিত শাস্ত্রীয় অন্য বচনে — অনৈক্য হইতেছে। যথা ঃ—

"স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

অর্থাৎ স্ত্রী, শূদ্র ও দ্বিজবন্ধু (পতিতব্রাহ্মণ) ইহারা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী নহে। বহির্লক্ষ্যের অর্থে বস্তুতই বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব অবগত হইলে, উভয় বাক্যেরই একই অর্থ দেখা যায়। অন্যত্র লিখিত আছে —

জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে।
বেদপাঠাদ্ ভবেদ্‌বিপ্রো ব্রহ্মজ্ঞানাত্তু ব্রাহ্মণঃ।।

অর্থাৎ জন্মমাত্রে শূদ্র, তাহার পর সংস্কার হইলে দ্বিজপদবাচ্য; তৎপরে বেদপাঠে বিপ্র এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রাহ্মণ বলা যায়। গৌতমসংহিতায়ও উক্ত আছে —

ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্।
তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রা ইতি স্মৃতাঃ।।

অর্থাৎ যিনি ক্ষান্ত, দান্ত, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয়, তিনিই ব্রাহ্মণ এবং তদ্ব্যতীত অপর সকলেই শূদ্র বলিয়া পরিগণিত।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, যতদিন ব্রাহ্মণপুত্রেরও ব্রহ্মজ্ঞান না হয়, ততদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যায় না। ততদিন তাঁহাকে ব্রাহ্মণপুত্র বা ব্রাহ্মণবংশে জাত এই মাত্র বলা যায়। পরন্তু "ব্রাহ্মণ" "ক্ষত্রিয়" "বৈশ্য" "শূদ্র" এই উপাধিগুলি গুণ ও কর্ম্মগত—বংশগত নহে।

গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্।।

অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ দ্বারা চাতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি; তাহার কর্ত্তা হইলেও আমাকে অব্যয় অকর্ত্তা বলিয়াই জানিও।

সুতরাং যিনি সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তিনিই কেবল ব্রাহ্মণ পদবাচ্য; নচেৎ কেবল যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। যদি তাহাই হয়, তবে অন্যান্য বর্ণের মধ্যে যাহাদিগের যজ্ঞোপবীত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারাই বা ব্রাহ্মণপদবাচ্য হয় না কেন? বস্তুতঃ সাধন ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান হয় না এবং ব্রহ্মজ্ঞান না হইলে, কেহই ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। তবে যিনি ব্রাহ্মণপুত্র, তিনি যে শূদ্রাদি অপেক্ষা অধিক মাননীয় ও পূজ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কেননা, ব্রাহ্মণপুত্রের সাধনমার্গ সহজেই লাভ হয় এবং তাঁহার পক্ষে সাধনও অতি সহজ বলিয়া বোধ হয়। শূদ্রাদির কিছু বিলম্বে হয়— এইমাত্র প্রভেদ। ব্রাহ্মণপুত্রকেও যেমন সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে হয়, শূদ্রাদিরও

তদ্রূপ। শূদ্রাদিরা যে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী নহে, এমত কখনই হইতে পারে না। শাস্ত্রেও যখন দেখিতে পাওয়া যায় যে, শূদ্রাদিরাও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তখন এখনই বা তাহা না হইবে কেন? বেদ-বিভাগকর্ত্তা বেদব্যাস, ধীবর-কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া এবং নারদ ও বিদুর দাসীপুত্র হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। কবজ ঋষি, জাবাল ঋষি, এবং মতঙ্গ ঋষি চন্ডালবংশীয় ছিলেন। বশিষ্ঠ বেশ্যাপুত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁহারাও ব্রহ্মজ্ঞ হইয়াছিলেন। গার্গী আত্রেয়ী প্রমুখ স্ত্রীলোক হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন। ইদানীন্তন সাধুদিগের মধ্যেও ঐরূপ অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। গোরক্ষনাথ গোপবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া যোগপথ অবলম্বন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। নানক ও কবিরও তদ্রূপ নীচবংশজাত। কবির জোলার গৃহে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন; কেহ কেহ বলেন যে, তাঁহার জন্মই জোলার গৃহে হইয়াছিল। তিনিও সদ্‌গুরু লাভ করিয়া সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সূরদাস অতি নীচবংশে মুচির গৃহে জন্মিয়াও যোগমার্গ আশ্রয় করিয়া মুক্তাবস্থা পাইয়াছিলেন। অতএব স্ত্রীশূদ্রাদি প্রাণায়ামাদি যোগ সাধন দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে। সুতরাং ব্রাহ্মণাদি উপাধি যে গুণ ও কর্ম্মগত, – বংশগত নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে –

"স্ত্রী শূদ্রাদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।"

এই যে শাস্ত্রীয় বচন, ইহাই কি মিথ্যা? বাস্তবিক ইহাও মিথ্যা নহে। ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যখন জন্মমাত্রেই সকলেই শূদ্র, তখন প্রণব-দীক্ষা ত কাহারও হইতে পারে না। এজন্য সংস্কার দ্বারা দ্বিজ হইতে হয়। তাহার পর ক্রমে বেদপাঠ দ্বারা বিপ্রপদবাচ্য এবং পরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে হয়।

এক্ষণে দেখা যাউক, সংস্কার কাকে বলে। আমাদের দেশে উপনয়ন বা গায়ত্রীদীক্ষা যাহা প্রচলিত আছে, তাহাই প্রধানতম সংস্কার। কিন্তু আজকাল উহা কেবল নামমাত্রে পরিণত হইয়াছে, কাজে কিছুই নাই। এখন কেবল গাছ কত সুতা গলায় ঝুলান হয় মাত্র; প্রকৃত উপনয়ন বা গায়ত্রী–দীক্ষা আদৌ হয় না। কেবল মুখে বলা হয় যে, সংস্কার হইল! কাজ কোথায়? সংস্কার শব্দের অর্থ জ্ঞান। সে জ্ঞান কল্পনা করিলে হইবে না, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হওয়া চাই। প্রত্যক্ষ না হইলে সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। আজকাল উপযুক্ত আচার্য্যের অভাবে কোন সংস্কারই প্রকৃত প্রস্তাবে হয় না। উপনয়ন সংস্কার গ্রহণ করিতে হইলে, আচার্য্যের সমীপে উপস্থিত হইয়া বেদবিহিত কর্ম্মের প্রার্থনা করিলে, আচার্য্য যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন, তবে তিনি উপযুক্তকালে শিষ্যকে নিকটে আনয়ন করাইয়া, শিষ্যের দিব্যচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। ইহাই প্রকৃত উপনয়ন সংস্কার। যিনি সেই তৃতীয় নেত্র দেখাইয়া দেন, তিনিই গুরুপদবাচ্য,–অন্যে নহে। চক্ষুর

বিষয় কল্পনা করিতে বলিলে হইবে না; তাহা দেখান চাই। শাস্ত্রেও এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত গুরুকে নমস্কার করিতে বলিয়াছেন,–কেবল উপাধিধারী গুরুকে নহে।

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।।

অর্থাৎ যিনি জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই শ্রীগুরুকে প্রণাম করি। ঐরূপ গুরু আবশ্যক। উপনয়নের কার্য্য শেষ হইবার পরে তিনি শিষ্যকে গায়ত্রী ও প্রণবদীক্ষা দেন। ইহাই বেদপাঠ। নচেৎ বেদের মন্ত্র কেবল মুখে উচ্চারণ করিলেই বেদপাঠ করা হয় না –

ন তপস্তপ ইত্যাহু ব্রহ্মচর্য্যং তপোত্তমম্।
ঊর্দ্ধরেতা ভবেদ্যস্তু স দেবো ন তু মানুষঃ।।
ন বেদং বেদ ইত্যাহু বের্দো ব্রহ্ম সনাতনম্।
ব্রহ্মবিদ্যারতো যস্তু স বিপ্রো বেদপারগঃ।।
ন হোমং হোমইত্যাহুঃ সমাধৌ যত্তু হূয়তে!
ব্রহ্মাগ্নৌ হূয়তে প্রাণো হোমকর্ম্ম তদুচ্যতে।।

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারাই ইহার প্রকাশ। সেই পরাশক্তিই বেদমাতা গায়ত্রী এবং তাহারই দীক্ষার নাম গায়ত্রীদীক্ষা। সেই গায়ত্রী পক্ষীর ন্যায় কেবল মুখে আওড়াইলে হইবে না। ইহার সহিত যে কার্য্য আছে, সেই কার্য্য না করিলে কিছুই হইবে না! প্রণব ওঁকার। এই শরীরকেই ওঁকার বলে এবং ওঁকাররূপ শরীরে যিনি রহিয়াছেন, তিনিই বেদমাতা, গায়ত্রী অর্থাৎ অজপা নামক গায়ত্রী।* সেই গায়ত্রীর উপাসনাই প্রাণায়াম। যথা– ওঁভূঃ (মূলাধার), ওঁ ভুবঃ (স্বাধিষ্ঠান–লিঙ্গমূল), ওঁ স্বঃ (মণিপুর–নাভিদেশ), ওঁ মহঃ (অনাহত হৃদয়), ওঁ জনঃ (বিশুদ্ধ–কণ্ঠদেশ), ওঁ তপঃ (আজ্ঞাচক্র–ভ্রূদ্বয়ের মধ্যদেশ) ওঁ সত্যং (সহস্রার–ভ্রূর ঊর্দ্ধদেশ), তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।।*

অর্থাৎ মূলাধারস্থ প্রাণ বায়ুকে ক্রমান্বয়ে ষট্চক্র ভেদ করিয়া ভ্রূর ঊর্দ্ধে অর্থাৎ সহস্রারে বিনা অবরোধে স্থির করিয়া রাখিলেই কোটি সূর্য্যের ন্যায় তেজোবিশিষ্ট অথচ কোমল জ্যোতি দর্শন হয়। ইহা সদ্গুরুপদেশগম্য; ইহা প্রত্যক্ষ দর্শন ব্যতীত কল্পনায় হয় না। প্রত্যক্ষ হইলেই জানা হয় নতুবা জানা হয় না। কিন্তু বুঝাইয়া বলিবার জো নাই; কেননা সেই কোমল জ্যোতিঃ দর্শনের পর যে অবস্থা হয়, তাহা সাধক কেবল নিজেই

* গায়ত্রী তন্ত্র দেখ

বোধ করিতে পারেন এবং তখন "জানি" বা "জানি না" এ দু'ইই থাকে না। বোবাকে সন্দেশ খাওয়াইলে সে যেমন সন্দেশ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না, তদ্রূপ যাঁহার সে অবস্থা হয়, তিনি তাহা অন্যকে বুঝাইতে পারেন না। যাঁহার এরূপ অবস্থা হয়, তিনিই ব্রাহ্মণপদবাচ্য, নতুবা কেবল গলায় সূত্র ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না। গুরুপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠে এই সকল গুপ্ত বিষয় জানা যায় না বলিয়া, ইহাকে "গুরুমুখী বিদ্যা" বলে। কেবল শাস্ত্রাদি দেখিয়া নিজের বুদ্ধিতে এই সকল কার্য্য করিতে গেলে, নানাপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি, এমন কি উৎকট ব্যাধি পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। এই জন্য গুরুপদেশ ব্যতীত কাহারও ঐ সকল কার্য্য করা উচিত নয়। শাস্ত্রেও সেই জন্য উক্তরূপ শাসন বাক্য লিখিত আছে। নতুবা স্ত্রীশূদ্রাদিরা যে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না, ঐ সকল শাসনবাক্যের কখনই এরূপ অভিপ্রায় নহে। শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রবৈশ্যাশ্চ শূদ্রাদ্যাবরজাতয়ঃ।
স্ত্রিয়শ্চ সকলাস্তেষাং শান্তরূপাঃ সদা শুচিঃ।।
তাসাং মধ্যে চ যা কাচিদাগত্য গুরুসন্নিধিম্।
প্রণম্য প্রার্থয়েজ্ জ্ঞানং ধর্ম্মার্থকামমোক্ষদম্।
যদি ন দীয়তে তস্যা জ্ঞানং জ্ঞানবিশারদৈঃ।
তে তথা নরকং যান্তি গায়ত্রীরদিতা যথা।
ব্রহ্মজ্ঞানময়ং হ্যেতন্নাস্তি জাতিবিচারণা।।

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শূদ্র প্রভৃতি নীচ জাতিগণ এবং তাহাদের স্ত্রীগণ যে কেহ গুরুর সমীপে আগমন করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থকামমোক্ষপ্রদ জ্ঞান প্রার্থনা করিলে, যদি জ্ঞানবিশারদ গুরু তাহাকে জ্ঞানদান না করেন, তবে তিনি নরকগামী হন। ইহা ব্রহ্মজ্ঞানময় —ইহাতে জাতি বিচার নাই। যখন পূর্ব্বাপর স্ত্রীশূদ্রাদিরা প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়াদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তখন এখনই বা কেন তাঁহারা উক্ত কার্য্যে অধিকারী না হইবেন বা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিবেন? অতএব তাঁহারা যে ঐ সকল কার্য্য করিতে পারেন এবং করিলে কোন দোষ হয় না, ইহা শাস্ত্র বা যুক্তিবিরুদ্ধ নহে। বরং যাহাতে সকলেই এই পথের পথিক হন, তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। বাস্তবিক সরল ভাবে দেখিতে গেলে, শাস্ত্রীয় কোন বিরোধ সৃষ্টি হয় না; তবে নিজের কোট বজায় রাখিবার জন্য কূট অর্থের দ্বারা শাস্ত্রীয় মতের বিরোধ জন্মান অসম্ভব নয়; কিন্তু তাহা কোন কাজের কথা নয়; কেননা, তাহার দ্বারা কোন মীমাংসা হয় না; বরং যে ভ্রম, সেই ভ্রমই থাকিয়া যায়। ইহাতে লাভ কি? মনে করুন, যদি দ্বিজবন্ধুগণ বেদের

অধিকারী না হয়, তবে এখনকার দিনে বেদের অধিকারী বা কে? দ্বিজ উপাধিধারিগণের মধ্যে দ্বিজবন্ধু নহেন কে? সাক্ষাৎ সম্বন্ধেই হউক বা পরম্পরা সম্বন্ধেই হউক, এখন ত প্রায় 'দ্বিজ' উপাধিধারিমাত্রেই দ্বিজবন্ধু। তাঁহারা যদি বেদের অধিকারী হইতে পারেন, তবে স্ত্রী ও শূদ্রগণ কি দোষ করিল? দ্বিজবন্ধুভাবাপন্ন দ্বিজগণ এবং তৎসঙ্গে স্ত্রী ও শূদ্রগণকে যদি বেদের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হয়, তবে অধিকারীর অভাবে শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সকল ত একেবারে লোপ পাইবে। ইহাই কি উদ্দেশ্য? যদি তাহা না হয়, তবে যদ্দ্বারা ভ্রম দূর হইয়া এই কথার মীমাংসা হয়, এবং সত্য প্রকাশ হয়, তাহাই কর্ত্তব্য।

আমরা সকলেই মালার ন্যায় একটি সূত্রে আবদ্ধ, এক্ষণে আমরা সেই সূত্র হইতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়াতেই, আমাদের এই দুরবস্থা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কে কোন্ পথে পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতেছে, তাহার প্রতি কাহারও লক্ষ্য নাই! কষ্টের একশেষ!! কোন বিষয়েরই ঠিকানা নাই। নানা দলেও সৃষ্টি হইয়াছে; যথা—কবিরপন্থী, নানকপন্থী, গোরক্ষপন্থী, দাদোপন্থী, রামাৎ, বৈষ্ণব, শাক্ত, গাণপত্য ইত্যাদি। এই সকল পথে পরস্পর মনের মিল দেখিতে পাওয়া যায় না; বরং সময়ে সময়ে পরস্পর বিবাদ ও কাটাকাটি মারামারিই হইয়া থাকে। ইহাই কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ?

মনে করুন, যখন মহাত্মা কবির জন্ম গ্রহণ করেন নাই, তখন কবিরপন্থী কোথায় ছিল? অথবা মহাত্মা কবির কি নিজে বলিতেন যে "আমিই এই পথের আদি"। বোধ হয় কখনই তাহা বলিতেন না। কবির এমন অসাধু ছিলেন না যে, নিজের মান নিজেই বাড়াইবেন। ইহা নিতান্ত অসম্ভব। মহানুভব কবিরের শিষ্যেরাই আপনাদিগকে কবির-পন্থী বলিয়া নির্দেশ করেন। সেইরূপ নানক, গোরক্ষনাথ, দাদো প্রমুখ মহাত্মাদিগের শিষ্যেরাও স্ব স্ব গুরুর নামে পরিচয় দিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মারা যখন মায়াময় সংসার হইতে অপ্রকাশ হইলেন, তখন তাঁহাদের কর্ম্মক্ষম উপযুক্ত শিষ্যেরাও গুরুর অনুসরণ করিলেন। কেবল বাক্‌সর্ব্বস্ব ভোজনক্ষম শিষ্যেরাই রহিয়া গেল; কারণ তাহাদের গুরুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিবার ক্ষমতা হয় নাই এবং তাহারা গুরুদত্ত কার্য্যও পায় নাই। কেবল আড়ে আব্‌ডালে যাহা দেখিত, তাহারই অনুকরণ করিত মাত্র। এইরূপ ভোজনক্ষম শিষ্যেরা মহাত্মাদিগের বাক্য বুঝিতে একেবারে অক্ষম; কেন না, সাধুদিগের কথা বুঝিতে বইলে কর্ম্মক্ষম হওয়া আবশ্যক। কর্ম্মক্ষম না হইলে সাধুবাক্য বুঝা বড় কঠিন। সাধুদিগের প্রত্যেক কথাই ভাবে পরিপূর্ণ। সুতরাং যাহারা অনুপযুক্ত, তাহারা তাহা কিরূপে বুঝিবে? যাহাদের আত্মভাব নাই এবং সকল বিষয়েই অভাব, তাহাদের পক্ষে ভাবের বিষয় বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুতরাং তাহাদের দ্বারা সাধনমার্গে প্রভূত অনিষ্টই হইতে লাগিল। পরস্পর মতভেদ এবং পরস্পর স্ব স্ব প্রাধান্য। কেহই আর এখন শিষ্য

নহেন। সকলেই গুরু হইয়া উঠিলেন এবং নিজের নিজের মত আঁটিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ দলাদলি হইয়া উঠিল। যতদিন মহাসমুদ্রবৎ মহাত্মারা বর্ত্তমান ছিলেন, ততদিন কোন দল ছিল না। কারণ মহাসমুদ্রে কোন দল (পানাঝাঁজি বা পাটা বিশেষ) থাকে না। দল ডোবা পুষ্করিণীতেই থাকে। মহাসমুদ্রের অভাবে ডোবা পুষ্করিণী অনেক হইতে লাগিল এবং দলেরও অভাব রহিল না। দল হইলেই নাম ও রূপ চাই; নচেৎ পরস্পর চিনা কঠিন; সুতরাং স্ব স্ব গুরুর নামে দল হইল। পরিচ্ছদেরও রূপভেদ হইয়া গেল। তাহাই ভেক এবং সেই ভেকের জ্বালায় সকল সম্প্রদায়ই অস্থির। কোন সম্প্রদায়েরই শান্তি নাই। শান্তি হইবে কোথা হইতে? সাধন ব্যতীত শান্তি হইতেই পারে না। সুতরাং গুরুর অভাবে সূত্রহারা হইয়া ছিন্নভিন্ন হইতে লাগিল এবং আর্য্যভূমি হইতে মহার্ঘরত্নস্বরূপ মহাত্মাদের অভাব হওয়ায় চতুর্দ্দিকে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইতে লাগিল। যাঁহারা গুরুপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অথচ গুরুর পশ্চাৎ গমন করিবার ক্ষমতা লাভ করেন নাই, তাঁহারা কোন দলে না ঢুকিয়া নিবিড় কাননে গিরিগহ্বরে বা গৃহস্থাশ্রমে, —যিনি যেখানে রহিলেন, তিনি সেই খানেই অতি প্রচ্ছন্নভাবে "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া গুরুপদেশ মত সাধন করিতে লাগিলেন। ইহাতে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শিষ্যদিগের মধ্যে যদি কেহ কেহ উপদেশ পাইত এবং কেহ কেহ পাইত না, তবে যাহারা উপদেশ পাইত না, তাহাদিগকে কেমন করিয়া শিষ্য বলা যাইতে পারে? বস্তুতঃ তাহারা উপদিষ্ট শিষ্য নহে; কেবল উপদেশপ্রার্থী মাত্র। সাধুদিগের সহিত উপদেশপ্রার্থী এরূপ অনেক লোক থাকে; তাহারা সাধুদিগের নাম করিয়া তদীয় শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিয়াও থাকে। সুতরাং সাধারণের মনে সহজেই এরূপ ধারণা হয় যে, ইহারা অমুক সাধু বা অমুক ঋষির শিষ্য। এরূপ শিষ্যেরা সাধুদিগের আশ্রমে থাকিয়া ভোজনাদি করিত এবং তাঁহাদিগের নিকট অনেক সময়ে অনেক প্রকার মৌখিক নৈতিক উপদেশও পাইত। সুতরাং তাহাদিগকে শিষ্য বলায় দোষ কি? বিশেষ দোষ হইতেও পারে না। পরে গুরু যখন যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিতেন, তখন তাহাকেই প্রকৃত উপদেশ দিতেন এবং তিনিও সেই উপদেশ পাইয়া আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সাধন করিয়া চলিতেন। যখন আর্য্যঋষি বা আর্য্য মহাত্মারা বর্ত্তমান ছিলেন, তখন আর এরূপ নানা প্রকার পথ ছিল না। তখন সকলেই একসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং সেই সূত্র দেখাইবার লোকও ছিল। সুতরাং তখন সকলেই এক ধর্ম্মাবলম্বী ছিল এবং সেই ধর্ম্মই যথার্থ আর্য্যধর্ম্ম। ক্রমশঃ সেই আর্য্য-ধর্ম্মরূপ সুবর্ণরত্নে খাইদ মিশিয়া মিশিয়া এক্ষণে উহা কেবল খাদেই পরিণত হইয়াছে। সে খাইদ উড়াইতে না পারিলে, খাঁটী সোনা বাহির হইবে না। প্রাচীনকালে আর্য্যসন্তানগণ যে সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, আমরা পুনরায় যদি সেই সূত্র ধরিতে পারি,

তাহা হইলেই ঐ খাইদ উড়িতে পারে, — নচেৎ নহে।

এক্ষণে দেখা যাউক, সেই সূত্র কি এবং কোথাই বা তাহা পাওয়া যায়। এই সূত্রই যে আমাদের প্রাণ বেদ উপনিষৎ পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সূত্ররূপী ভগবান্ প্রত্যেক জীবে শ্বাসরূপে বিরাজ করিতেছেন। সুতরাং সেই সূত্ররূপী নারায়ণকে অন্বেষণ করিতে হইলে, প্রথমেই আমাদের নিজ নিজ দেহের মধ্যে অন্বেষণ করা আবশ্যক। ভগবান্ যে প্রতি ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত; সুতরাং এ বিষয়ে বোধ হয় কাহারও মতভেদ হইবে না। প্রবাদ আছে যে, মহর্ষি নারদ ত্রিতন্ত্রবিশিষ্ট বীণাযন্ত্রে হরিগুণ গান করিতেন। সেই বীণাযন্ত্রটি কি? তাঁহার ন্যায় মহাত্মা যে সাধারণ লোকের মত কেবল এক সামান্য অলাবু ও কাষ্ঠনির্ম্মিত বীণাযন্ত্র লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ইহাই কি সম্ভব? কখনই নহে। এই শরীরেই সেই বীণাযন্ত্র এবং ইহার মধ্যেই ঐ তন্ত্র আছে। সেই তন্ত্র তিনভাগে বিভক্ত হওয়ায় উহাকে ত্রিতন্ত্রী কহে এবং এই তিন তন্ত্রে স্বতঃই প্রণব ধ্বনি হইতেছে। প্রণব = ওঁকার অর্থাৎ অ–উ–ম্ (ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর) সুতরাং প্রণবের মধ্যেই বিষ্ণু অর্থাৎ "হরি" "হরি" ধ্বনি রহিয়াছে। নারদ সর্ব্বদাই সেই তন্ত্রে এইরূপ "হরি" "হরি" ধ্বনি করিতেন অর্থাৎ তাহাতেই মন লাগাইয়া ওঁকার ধ্বনি শুনিতেন। ইহাই বাজান এবং নারদ এই বীণাযন্ত্র ঐরূপেই বাজাইতেন।

বাস্তবিক এই শরীররূপ যন্ত্রমধ্যে ঐ তন্ত্রে প্রাণরূপে ব্রহ্মসূত্র রহিয়াছে; কিন্তু আমরা সেই সূত্রহারা হইয়া পড়িয়াছি। এই প্রাণই হরি এবং হরিই প্রাণ। সেই জীবনস্বরূপ হরিতে লাগিয়া থাকুন; তাহা হইলে, আপনিও হরি হইয়া যাইবেন অর্থাৎ ত্রিতাপের নাশ হওয়ায় অব্যক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন। ঐ অবস্থা অব্যক্ত বলার তাৎপর্য এই যে, উহা মুখে বলিয়া প্রকাশ করা যায় না। সেই অব্যক্ত অবস্থা একমাত্র প্রাণের সাধন দ্বারাই পাওয়া যায়। কেননা, অব্যক্ত হইতেই প্রাণের উৎপত্তি। সুতরাং এই প্রাণ ছাড়িয়া আমরা যাহা কিছু করিতে যাইব, তাহাই অব্যক্ত হইতে দূর। এইরূপে আমরা ক্রমশঃ সেই অব্যক্ত হইতে এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। আমরা অব্যক্তের যত নিকট থাকিব, ততই জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইব এবং যত দূরে যাইব, ততই অজ্ঞানে আচ্ছন্ন হইব,—কোন ফলই হইবে না। আমরা যাহা কিছু করি, তাহা মনের বশীভূত হইয়া করি, সেই মনের ধর্ম্মই চঞ্চলতা। এক মুহূর্ত্তও উহা স্থির থাকে না এবং এক বিষয়েও সর্ব্বদা থাকিতে চাহে না। সেই মনকে স্থির করিতে না পারিলে সাধনাদি কিছুই হইবে না। যদি বলা যায়, ভগবৎসাধনে আবার মনঃস্থৈর্য্যের আবশ্যকতা কি? মন স্থির হইল না বলিয়া কি ভগবৎসাধন হইবে না? ইহা স্বতঃই মনে হয় বটে, কিন্তু যদি আমার ব্যাকরণ বোধ না থাকে তাহা হইলে

সাহিত্য ও দর্শনাদি শাস্ত্রে কি আমার জ্ঞান জন্মিতে পারে? কখনই পারে না। ব্যাকরণ সকল শাস্ত্রের দর্পণস্বরূপ্। দর্পণে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব বা স্থূল শরীরের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপ ব্যাকরণের সাহায্যে সাহিত্য দর্শনাদি শাস্ত্রের স্থূল অর্থ পরিগ্রহ হয়। স্থির মন স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় এবং তদ্দ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। চঞ্চল মনের দ্বারা উহা কখনই সম্ভবে না। স্থিরতার অভাবে মনের মলিনতা দূর না হইলে, উহা দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছও হয় না। সুতরাং তাহাতে কোন বস্তুর প্রতিবিম্বও পড়ে না। সেই স্বচ্ছ মন যাহাতে লাগাইবেন, তাহাতেই তাহার প্রতিবিম্ব পড়িবে। অতএব অগ্রে মন স্থির করা আবশ্যক, নচেৎ সব বৃথা।

মনে করুন, আমি কর্ণ দ্বারা একটি শব্দ শুনিতে বসিলাম; কিন্তু শব্দ শুনিবে কে? কর্ণ কখনই শব্দ শুনে না। অনেক সময় এমন হইয়া থাকে যে, আমি ঘরে বসিয়া কাগজ বা পুস্তক পাঠ করিতেছি, অথচ সেই সময়ে ঘরের ভিতর ঘড়ি বাজিয়া গেল,—আমি তাহা শুনিতে পাইলাম না। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যায় যে, কর্ণ কখনও শব্দ শুনে না। কর্ণই যদি শব্দ শুনিত, তাহা হইলে যখন ঘড়ি বাজিল, তখন কি আমার কর্ণ ছিল না? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের অভাব হয় নাই। তবে শব্দ শুনিতে পাই নাই কেন? তাহার একমাত্র কারণ এই যে, মন তখন অন্য বিষয়ে যুক্ত থাকায়, উহা ঘড়ির শব্দ গ্রহণ করে নাই এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের সহিত মনের সংযোগ না হওয়ায় কর্ণও তাহা শুনে নাই। অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধেও এইরূপ। অতএব অগ্রে মনকে স্থির করা আবশ্যক। মনকে স্থির করিতে পারিলে, সকল কর্ম্মই সুখসাধ্য হয়; নতুবা সবই বিফল – কোন কাজেরই হয় না এবং সকল কর্ম্মেই ভ্রষ্ট হইতে হয়। মন স্থির হইলে, কর্ম্মমাত্রই সুসম্পন্ন হইতে পারে। যাঁহার মন যে পরিমাণে স্থির অর্থাৎ যাঁহার একাগ্রতা যত বেশী, তিনি সেই পরিমাণে বুদ্ধিমান্। এই জন্যই ভগবান্ গীতাতে বলিয়াছেন ঃ—

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্।।"

অর্থাৎ যাহার মন ব্রহ্মে যুক্ত নহে, তাহার বুদ্ধি ও আত্মভাব নাই, এবং যাহার আত্মভাব নাই তাহার শান্তি নাই; যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ কোথা?

সুতরাং যাহাতে মন স্থির, অগ্রে তাহারই উপায় করা আবশ্যক। নতুবা যখন ষড় রিপু আক্রমণ করিবে, তখন সাধন ভজন সবই পড়িয়া রহিবে,—কিছুতেই উহাদিগের বেগ নিবারিত হইবে না। প্রাণায়াম ব্যতীত ইন্দ্রিয়গণ সংযত ও মন স্থির হয় না। অতএব প্রথমে প্রাণায়ামের অভ্যাস করা উচিত। ঐ প্রাণায়ামের দ্বারাই ক্রমশঃ প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি হইয়া থাকে।

প্রাণায়ামদ্বিষট্কেন প্রত্যাহারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
প্রত্যাহারদ্বিষট্কেন জায়তে ধারণা শুভা।।
ধারণাদ্বাদশ প্রোক্তা ধ্যানং ধ্যানবিশারদৈঃ'
ধ্যানদ্বাদশকেনৈব সমাধিরভিধীয়তে।।

গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ।

প্রাণায়াম উত্তমরূপে অভ্যস্ত হইলে, তাহার ১২টিতে প্রত্যাহার, ১৪৪টিতে ধারণা, ১৭২৮টিতে ধ্যান এবং ২০৭৩৬টিতে সমাধি হয়। ১৭২৮টি উত্তম প্রাণায়াম দ্বারা যে ধ্যানাবস্থা হয়,তাহা হৃদয়ঙ্গম হইলে, তাহার পরের অবস্থা বোধগম্য হয় এবং সেই পরাবস্থাটি যে কি, তৎসম্বন্ধে স্বতঃই মনে মনে প্রশ্ন ও বিচার হইয়া থাকে; সেই বিচারের নাম ''তর্ক''। উহা আপনা আপনিই হইয়া থাকে। তাহার পর ২০৭৩৬ প্রাণায়াম দ্বারা আপনা আপনি ঐ তর্কের মীমাংসা হইয়া যে অবস্থা হয়, তাহাকেই ''সমাধি'' এবং ''যুক্তাবস্থা'' কহে। সে অবস্থায় অহংজ্ঞান না থাকায় সর্ব্বত্র সমভাবের উদয় হয় অর্থাৎ তখন জগৎ আত্মময় দৃষ্ট হয়। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, উপরিউক্ত নিয়মে যোগাভ্যাস করিলে, যম নিয়ম আসন পরিত্যাগ করিতে হয় এবং ঐ সকল পরিত্যাগ করিলে, অষ্টাঙ্গ যোগের সহিত মতভেদ হয় অর্থাৎ যোগ অষ্টাঙ্গ থাকে না এবং যম নিয়ম আসন পরিত্যাগ করিয়া প্রাণায়াম করিলে শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্ম করা হয়। সুতরাং যম নিয়ম আসন বর্জ্জন করিয়া প্রাণায়াম অকরণীয়।

প্রথমেই প্রাণায়ামের অভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলে, যম নিয়ম ও আসন যে পরিত্যক্ত হয়, এমত নহে এবং উহা শাস্ত্র বা যুক্তির বিরুদ্ধেও নহে। শাস্ত্রে ষড়ঙ্গ যোগেরও উল্লেখ আছে; যথা–

প্রত্যাহারস্তথা ধ্যানং প্রাণায়ামোহথ ধারণা।
তর্কশ্চৈব সমাধিশ্চ ষড়ঙ্গো যোগ উচ্যতে।।

অমৃতবিন্দুপনিষৎ।

প্রথমে নিয়ম অনাবশ্যকবোধে গোরক্ষনাথও যোগকে ষড়ঙ্গ বলিয়া গিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতায় আছেঃ–

আসনং প্রাণসংরোধঃ প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
ধ্যানং সমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি স্মৃতানি ষট্।।

ষড়ঙ্গ যোগ যে অশাস্ত্রীয় নহে, তাহা উক্ত শ্লোকদ্বয়ের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে; কিন্তু ইহাতেও মতভেদ আছে। সেই প্রভেদ এই যে, উপনিষদে আসনের উল্লেখ না করিয়া, তৎপরিবর্ত্তে তর্কের উল্লেখ আছে এবং গোরক্ষসংহিতায় তর্কের পরিবর্ত্তে আসনের

উল্লেখ আছে। বস্তুতঃ এ প্রভেদ প্রভেদই নহে। গোরক্ষসংহিতায় আসনের কথা মাত্র লিখিত আছে; সুতরাং যাঁহার যে আসন অভ্যস্ত, তিনি সেইটি করিলেই তাঁহার গোরক্ষসংহিতার মতে কার্য্য করা হইল। ঘেরন্ড সংহিতা প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থে ৮৪ প্রকার আসনের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার সকলগুলিই যে করিতে হইবে, বা করা একান্ত আবশ্যক, এমত নহে। আসন সম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিয়াছেন,—

"স্থিরসুখমাসনম্"

পাতঞ্জল দর্শন

অর্থাৎ যাহাতে স্থির এবং সুখবোধ হয়, এমত আসন করিয়া যোগাভ্যাস করিবে। যে কোন রকম হউক এক রকম আসন করিলেই যখন চলিতে পারে, তখন আসনের কথা অনাবশ্যক বোধে উপনিষদে তাহার উল্লেখ নাই। আসনের পরিবর্ত্তে ধ্যানের পরের অবস্থা "তর্কের" উল্লেখ করিয়া যোগের ছয়টি অঙ্গ বজায় রাখিয়াছেন। গোরক্ষসংহিতায় তর্কের উল্লেখ নাই; কেননা ধ্যানের পর তর্ক আপনা আপনিই স্বতঃই উদয় হয়, ইচ্ছা করিয়া করিতে হয় না। বাস্তবিক ইহাতে মতভেদ কিছুই নাই; তবে কূট তর্ক বা কূট অর্থের দ্বারা সবই হইতে পারে; কিন্তু তাহা বিতন্ডা মাত্র। ঐ বিতন্ডায় কোন লাভ নাই।

এইরূপ মতভেদের সামঞ্জস্য করিতে হইলে, সদ্গুরুর উপদেশে ঐ সকল কার্য্য করিয়া নিজে বুঝিতে হয়। তখন ভাল মন্দ আপনা আপনিই বাহির হইয়া পড়ে এবং সব গন্ডগোলও মিটিয়া যায়। কেবল কথায় ইহার মীমাংসা হয় না। তবে প্রাণায়াম ঠিক হওয়া চাই।

প্রাণায়াম ত্রিবিধি;— উত্তম, মধ্যম ও অধম। প্রথম অভ্যাসীর প্রাণায়াম অধম, ক্রমে অভ্যাসের দ্বারা মধ্যম এবং অবশেষে উত্তম হয়। উত্তম প্রাণায়ামের দ্বারা প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, তর্ক ও সমাধির অবস্থা ক্রমশঃ লাভ হইয়া প্রত্যক্ষ ফললাভ হয়।

এস্থলে আবার এই প্রশ্ন হইতে পারে যে, আসনের আবশ্যকতা না থাকিলেও যম নিয়মের আবশ্যকতা যে নাই তাহা কিরূপে বুঝিব? বস্তুতঃ যম নিয়ম যে পরিত্যাগ করিতে হইবে, বা উহাদের আবশ্যকতা নাই, একথা পূর্ব্বেও বলা হয় নাই। তবে প্রথমে যম নিয়মের অভ্যাস করিবার আবশ্যকতা নাই; কারণ ঐ গুলি প্রাণায়াম দ্বারাই সাধিত হয় অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা যখন ইচ্ছার নাশ হয়, তখনই বাস্তবিক যম নিয়ম সিদ্ধ হয়। নচেৎ "আমি স্ত্রী পুত্র গৃহাদি বা যাবতীয় কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি" কেবল মুখে এরূপ বলিলেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না; যেহেতু ইহাতেও আমার নিজের ইচ্ছা রহিয়াছে, অথবা কোন না কোন ফলের উদ্দেশে আমাকে ঐ সকল ত্যাগ করিতে হইয়াছে। আজকাল প্রায় সকলেরই একটা না একটা কামনা আছেই আছে। সুতরাং তাহাদের যে ত্যাগ,

তাহা ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ত্যাগ। ইহাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা যাইতে পারে না। কারণ গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।

এই দেহ ধারণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে কর্ম্মত্যাগ করা যায় না; তবে যিনি সমস্ত কর্ম্মের ফলকামনারহিত হইয়া কর্ম্ম করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ত্যাগী। আসক্তি থাকিলেই ফলাকাঙ্ক্ষা থাকে। আসক্তি সত্ত্বে কখনই ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হওয়া যায় না। আসক্তিপূর্ব্বক ভোগ বা কর্ম্ম বন্ধের কারণ। বাসনাসত্ত্বেও স্ত্রীপুত্র-গৃহরত্নাদি ও তৎসঙ্গে অন্যান্য সাংসারিক কর্ম্ম ত্যাগ ও গৈরিক বস্ত্র পরিধান করিয়া, ফলমূলাহারী হইলেও প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয় না। উহা রাজসিক বা তামসিক ত্যাগের মধ্যে পরিগণিত। প্রাণায়াম দ্বারা যে অবস্থায় একেবারে ইচ্ছার নাশ হয়, সেই অবস্থাই যথার্থ যম ও নিয়ম এবং সেই অবস্থাতেই প্রকৃত সাত্ত্বিক ত্যাগ হয়।

আজকাল প্রায় অনেকেই কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া, যম বা নিয়মের বহিরঙ্গ সাধন করিয়া থাকেন। তাহাতে কোন ফল হয় না; তবে লোক ভুলাইতে পারা যায় মাত্র। আমাদের দেশে অনেকেরই এরূপ ভ্রমধারণা আছে যে, স্ত্রীপুত্র — গৃহরত্নাদি সাংসারিক বিষয়বৈভব পরিত্যাগ না করিলে, কিছুতেই ভগবৎসাধন হইতে পারে না। ইহা নিতান্তই ভ্রম। হায়, আমরা কি ভ্রমেই পড়িয়াছি!!! ভগবানের অপেক্ষাও আমাদের বুদ্ধি বেশী!!! যদি স্ত্রীপুত্র — গৃহরত্নাদিই বন্ধের কারণ হয়, তাহা হইলে, ঐ সকলের সৃষ্টি হইল কেন? আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের বুদ্ধি বেশী মনে করি বলিয়া, স্ত্রীপুত্রদি ত্যাগ করিয়া,—গৈরিক বসন ধারণ করিয়া, ভন্ড সন্ন্যাসীর বেশে বহুরূপী সাজিয়া আমরা এদেশে সেদেশে ঘুরিয়া বেড়াই।

এক্ষণে দেখা যাউক, সন্ন্যাসী শব্দের অর্থ কি এবং শাস্ত্রেই বা সন্ন্যাসী কাহাকে বলে। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন ঃ—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্নচাক্রিয়ঃ।।

অর্থাৎ যিনি ফলাকাঙ্ক্ষারহিত হইয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল করেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী এবং যোগী। নতুবা আমি আগুন স্পর্শ করি না, বা কোন কর্ম্ম করি না, বলিলে সন্ন্যাসী বা যোগী হইতে পারা যায় না। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে সন্ন্যাসীর উক্তরূপ যে লক্ষণ বলিয়াছেন, এখন তাহা কৈ? আজকালের সন্ন্যাসী অন্যরূপ অর্থাৎ সমস্তই বিপরীত।

স্ত্রীপুত্রধনরত্নাদি যদি বন্ধনের হেতু হইত এবং ঐ সকল ত্যাগ ব্যতীত যদি সন্ন্যাসী হওয়া না যাইত, তবে ব্যাস, বশিষ্ঠ, গৌতম ও জনকাদি ঋষিরাও মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হন নাই।

অতএব স্ত্রী পুত্র ও বিষয়াদিকে বন্ধনের কারণ বলিতে গেলে, পবিত্রহৃদয় ঋষিদিগকেও কলঙ্কিত করা হয়। সুতরাং স্ত্রীপুত্রাদি বন্ধনের হেতু বা কারণ নহে। ঐ সকলের প্রতি আসক্তিই বন্ধের কারণ। মনে করুন, আমি না হয় স্ত্রীপুত্রদি সমস্ত ত্যাগ করিলাম; কিন্তু মনে মনে অহরহঃ ঐ সকলের যে চিন্তা রহিল, তাহা পরিত্যাগ করিবার ক্ষমতা ত আমার নাই; কারণ আমার ইন্দ্রিয়-সংযম হয় নাই; সকল রিপুই বর্ত্তমান। যাহারা পরম শত্রু, তাহাদিগকে যখন পরিত্যাগ করিতে পারি নাই এবং তাহারা যখন আমার সঙ্গেই রহিল, তখন তাহাদিগের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করা আমার ন্যায় অসংযমী পুরুষের পক্ষে কি কখনও সাধ্য হইতে পারে? যখন সে রিপু আমাকে আক্রমণ করে, সে তন্মুহূর্ত্তেই আমাকে মোহিত করিয়া আপন কার্য্য চরিতার্থ করে। সুতরাং লোকলজ্জা বা রাজদণ্ডের ভয়ে অনেক সময়ে কার্য্যে পরিণত না হইলেও মনে মনে সকল কার্য্যই হইয়া যায়। অনেক সময়ে কার্য্যে পরিণত হইতেও দেখা যায়। ইহা কি মিথ্যাচার নহে? এইরূপ কর্ম্মীকেই ভগবান্ গীতাতে "মিথ্যাচার" বলিয়াছেন।

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে।।

অর্থাৎ যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সকল স্মরণ করিয়া থাকেন, সেই মূঢ়াত্মাকে কপটাচার কহে। এরূপ কপট আচারে লাভ কি? অতএব যাহাতে কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহারই উপায় দেখা উচিত। কপটাচার ত্যাগ করিয়া স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি যে আসক্তি আছে, তাহা যাহাতে যায়, তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক। সদ্গুরুর অন্বেষণ করিয়া তাহার নিকটে উপদেশ পাইলে, কিছুই ছাড়িতে হয় না। আমাদের "গাছে না উঠিতেই এক কান্দি"। কারণ বৈরাগ্যের সঙ্গে খোঁজ নাই, কেবল বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিতেই আমরা ব্যস্ত। আমাদের এমনই ভ্রম যে, ঘর বাড়ী ছাড়িয়াই সংসার ছাড়িতে চাহিয়া থাকি। কিন্তু একথা একবারও ভাবি না যে, সংসার কি এবং তাহা ছাড়িয়াই বা যাইব কোথা? যদি বলি বনে যাইব, তাহা হইলেই কি ঠিক উত্তর হইল? মহর্ষি অষ্টাবক্র বলিয়াছেন ঃ—

বাসনা এব সংসার ইতি সর্ব্বা বিমুঞ্চ তাঃ।
তত্ত্যাগো বাসনাত্যাগাৎ স্থিতিরদ্য যথা তথা।।

বাসনাই সংসার—এই বিবেচনা করিয়া তুমি সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ কর। যেখানে সেখানেই অবস্থান কর না কেন, বাসনা ত্যাগেই প্রকৃত প্রস্তাবে সংসার ত্যাগ হয়।

সুতরাং বনও সংসার ছাড়া নহে। থাকিবার জন্য এখানে যেমন দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহের আবশ্যক, বনেও তেমনি পর্ণকুটীর অথবা পর্ব্বত গহ্বর কিংবা অন্য একটি না একটি স্থানের আবশ্যক। তবে গৃহত্যাগ হইল কৈ? যাহা ছিল, তাহাই ত রহিল। আসক্তি ছাড়িতে পারি নাই, সঙ্গেই আছে। সুতরাং দ্বিতল গৃহেও যেরূপ আসক্তি ছিল, বনে আসিয়া পর্ণকুটীরেও সেইরূপ হইল। অতএব যখন দেখিতেছি যে, আমার থাকিবার একটি স্থান চাই, অথচ যেখানেই থাকিব, সেইখানেই আসক্তি হইবে, তখন যাহা আছে, তাহা ছাড়িবার প্রয়োজন কি? বরং যাহাতে সাধনার দ্বারা ঋষিদিগের ন্যায় আসক্তিশূন্য হওয়া যায়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। আসক্তির নাশ হইলে, কর্ম্ম করিয়াও আবদ্ধ হইতে হয় না। রাজর্ষি জনক অনাসক্ত ভাবে সমস্ত রাজকার্য্য করিয়াও বদ্ধ হন নাই।

আমাদের হয় ত এক ছটাক জমি বা দশকুড়ি টাকা পুঁজি মাত্র। জনকের তুলনায় তাহা কিছুই নয় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু আমরা ইহার জন্য এতই ব্যস্ত ও চিন্তাগ্রস্ত সে, সর্ব্বদাই বলিয়া থাকি, "সময় নাই, – বড় কাজের ভিড়, – দিবারাত্র ঝঞ্ঝাট,–সাধন ভজন করি কখন? কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আলস্যে, বিলাসিতায়, গল্পে ও নাচ–তামাসায় আমরা কত সময় নষ্ট করিতেছি, অথচ সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করি না, কেবল, ভগবৎসাধনের জন্যই সময় পাই না বলিয়া থাকি। সাধন ভজন করিবার যে আমার ইচ্ছা নাই, তাহা বলিতে পারি না; কেননা, তাহা হইলে লোক সমাজে আমার 'ধার্ম্মিক' উপাধি গ্রহণ করা হইবে না; অথবা লোকে নিন্দা করিবে বা লোকের কাছে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে পারিব না। সুতরাং বলিতে হয় যে, সময় অভাবে কিছু করিতে পারি না। বাস্তবিক ইহা কেবল ওজর এবং বাজে কথা মাত্র।

আপাততঃ এরূপ মনে হইতে পারে যে, গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সাধনাদি করিতে অন্য কোন বাধা না থাকিলেও নির্জ্জন স্থানের আবশ্যক; সংসারে তাহা নাই। কেননা, স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গ সর্ব্বদা নিকটে থাকায় মায়াবশতঃ প্রায় সকল সময়েই অনেক প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হয়। সুতরাং প্রাণায়ামাদি যোগসাধনের অত্যন্ত ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা। অতএব যোগসাধনের পক্ষে গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা নির্জ্জন বনই ভাল। বস্তুতঃ এইরূপ মনে হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু একটু স্থির ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা সাধনের উপযুক্ত শ্রেষ্ঠ আশ্রম আর নাই। এই জন্যই ঋষিদিগের অনেকেই পুত্রদারাদি লইয়াও গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস করিতেন।

ভাবিয়া দেখুন, জগতে নির্জ্জন স্থান পাইব কোথায়? নির্জ্জন শব্দের অর্থ জনশূন্য। এমন স্থান কোথায়? বনে কি কিছু নাই? সেখানেও ত অনেক জীব আছে। তবে বনকে

জনশূন্য কিরূপে বলি? ভাল, তা হয় স্বীকার করিলাম যে, বনে এমন স্থান আছে, যেখানে কোন জীবজন্তু নাই, কিন্তু তাহা হইলেও 'আমি' ত আছি। আমি কি জীব নহি? অতএব আমি থাকিতে কোন স্থানই জনশূন্য হইতে পারে না। আমিত্বের লোপ হইলে, বনে বা গৃহে যেখানেই থাকি না কেন, সেই স্থানই প্রকৃত-প্রস্তাবে নির্জ্জন। বরং গৃহস্থাশ্রম অপেক্ষা বনে আশঙ্কা আরও বেশী। যেহেতু ঐ স্থান হিংস্র জন্তুপূর্ণ। কোথাও বা শ্বাপদকুল ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে, কোথাও বা ভয়ানক অজগর সর্প মুখব্যাদান পূর্ব্বক যেন জগৎকেই গ্রাস করিবার উদ্দেশে ভীমমূর্ত্তিতে বিচরণ করিতেছে। আবার কোথাও বা মত্ত মাতঙ্গগণ বিকট রবে বনমূল নিনাদিত করিতেছে এবং সেই বিকট নাদের প্রতিধ্বনিতে মেরুপৃষ্ঠ পর্য্যন্ত কম্পিত হইতেছে। সুতরাং তথায় সর্ব্বদাই শঙ্কিত ভাবে থাকিতে হয়। কখন্ প্রাণ যায়, —কখন কোন হিংস্র জন্তুর গ্রাসে পতিত হইতে হয়, সর্ব্বদাই এই ভয়ে প্রাণ আকুল। যখন আমি সর্ব্বদা ভয়েই ব্যতিব্যস্ত, তখন সাধন করিবে কে?

অপিচ—

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাৎ
যতঃ স আস্তে সহষট্‌সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতে বুর্ধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিন্নু করোত্যবদাম্।।

শ্রীমদ্‌ভাগবত ৫ম স্কন্ধ।

অর্থাৎ বিষয়মত্ত ব্যক্তি বনে গিয়াও সংসারেই থাকেন, যেহেতু সে ব্যক্তি সর্ব্বদা ছয়টি রিপুর সহিত অবস্থান করে, সুতরাং গৃহস্থাশ্রম জিতেন্দ্রিয় আত্মজ্ঞানী পন্ডিতগণের কি অনিষ্ট করিবে? পরন্তু যখন উদর ও ক্ষুধা সঙ্গেই আছে, তখন খাইতেই হইবে, অথচ আহারীয় দ্রব্য সঙ্গে নাই। সুতরাং তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। লোকালয় নাই যে, কাহারও বাড়ীতে অতিথি হইব। কাজেই ফলমূল ব্যতীত আর উপায় নাই। কিন্তু ঐ সকল ফলমূল অনায়াসলভ্য হইলেও হিংস্র জন্তু দ্বারা রক্ষিত বলিয়া আহরণ করা দুষ্কর। কেননা উহাতে প্রাণের আশঙ্কা আছে; আহরণ করিতে গেলেই হিংস্র জন্তুগণ আমায় হিংসা করিবে। কিন্তু যদি আমি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া সাধন দ্বারা হিংসা জয় করিয়া বনে আসিতাম, তাহা হইলে আর বনের পশুরাও, আমায় হিংসা করিত না। মহর্ষি পতঞ্জলি বলিয়াছেন ঃ—

অহিংসাপ্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্বত্র বৈরত্যাগঃ।

পাতঞ্জল দর্শন।

অর্থাৎ অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে, সর্ব্বত্রই বৈরত্যাগ হয় অর্থাৎ কেহই শত্রু

থাকে না। হিংসা সর্ব্বত্র সমান। আমাতে যে হিংসাবৃত্তি আছে, পশুতেও সেই হিংসাবৃত্তি আছে। এই উভয়ের বস্তুগত পার্থক্য কিছুই নাই। তবে পরিমাণের তারতম্য থাকিতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ দুইই এক। সুতরাং হিংসাকে জয় করিতে পারিলে, হিংসার দ্বারা আর আমার অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না। তখন কোন হিংস্র জন্তু হঠাৎ আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেও তাহার মস্তক উত্তোলন করিবার ক্ষমতা থাকে না। তখন তাহাকে আমার নিকট অবনতমস্তকে দন্ডায়মান থাকিতে হয়। যখন আমার হিংসা রহিয়াছে,– তাহাকে জয় করিতে পারি নাই, তখন আমার প্রতিপদেই বিপদের আশঙ্কা রহিয়াছে। কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্য ইহারা পরম শত্রু। ইহারাও সঙ্গে আছে, ইহাদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া বনে আসি নাই। কাজে কাজেই কোন বিষয়ে সুখও পাইতেছি না। সাধনের পথ পাই নাই যে, তদ্দ্বারা আত্মানন্দ অনুভব করিব। সুতরাং সে অবস্থায় সর্ব্বদাই অসুখ ও সর্ব্বদাই অশান্তি।

বনে সুখ না পাইয়া গৈরিক বস্ত্র, ত্রিশূল, চিমটা ও জটাজুট ধারণ করিয়া সাধু সাজিয়া আবার লোকালয়ে আসিলাম এবং বাহ্যদৃষ্টিতে লোকের কাছেও সাধু হইলাম। অনেকেই আমাকে সাধু সন্ন্যাসী বা স্বামীজী বলিয়া সম্বোধন করিতে লাগিল এবং আমিও তাহাদের কথায় অহঙ্কারে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলাম। এরূপ সন্ন্যাসী হওয়ায় লাভ কি? একে ত আমি নিজে ঠকিলাম, সাধুর ভান করিয়া আবার অপরকে ঠকাইবার চেষ্টা করি কেন? লোক ভুলাইবার জন্য নিজের অন্তরের কথা গোপন করিয়া "আমি বড় সুখে আছি," "গৃহস্থাশ্রমে সুখ নাই" বা গৃহে থাকিয়া সাধন ভজন হয় না, সাধন ভজন করিতে গেলে, গৃহত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় সন্ন্যাসী হওয়া চাই" নিজে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই প্রকার মিথ্যা কথা বলিয়া থাকি। ঐরূপ না বলিলে দুই একটি চেলা বা সঙ্গী মিলে কৈ? সুতরাং লোক সংগ্রহের জন্য এবং নিজের সেবার জন্য গৃহস্থাশ্রমের নিন্দা করিয়া, – গৃহত্যাগ করিয়া বনে যাওয়াকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকি।

পরন্তু ভাগ্য ক্রমে যদি কোন সাধু পুরুষের দর্শন লাভ হয়, তাহা হইলে, তিনি কখনই সংসার ত্যাগ করিয়া বনে যাইতে বলিবেন না। বরং গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইলে, তিনি বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে ও বিবাহাদি করিয়া সংসারী হইতে বলিয়া দিবেন। তাঁহারা বলেন যে, যখন সময় হইবে, তখন ঘরে বসিয়াই পাইবে; তবে ঘরে থাকিয়া সেই সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে পাইবার ইচ্ছা সর্ব্বদা অন্তরে রাখিবে ও সদ্‌গুরুলাভের চেষ্টা করিবে, এবং যখন যে কর্ম্ম উপস্থিত হইবে, তাহা আনন্দের সহিত করিবে। কেননা কর্ম্মই ব্রহ্ম, কর্ম্মে কখনও তাচ্ছিল্য করিও না। সময় হইলেই সদ্‌গুরুর অনুসন্ধান পাইবে এবং তাঁহার উপদেশে ব্রহ্মমার্গে বিচরণ করিয়া সুখী হইতে পারিবে নতুবা পন্ডশ্রম মাত্র – কিছুই

লাভ হইবে না।

এ সকল কথা শুনে কে? আমার গুরু হইবার ইচ্ছা আছে, তাই আবার লোকালয়ে আসিয়া সাধুর বেশ ধারণ ও সাধুর ভান করিয়া বেড়াইতেছি। পূর্ব্বেও ছিলাম গৃহে, এখনও সেই গৃহে; আহারাদিও বেশ আছে। নাই কেবল বিবাহিতা স্ত্রী ও শাদা কাপড়। তাহার উপর আবার স্বামী উপাধি ধারণ করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে আমি দাসেরও উপযুক্ত নহি, অথচ স্বামী হইলাম। মুখেও বলিয়া থাকি আমি বানপ্রস্থ ধর্ম্ম, অবলম্বন করিয়া যোগী সন্ন্যাসী বা সাধু হইয়াছি। বেদান্তের ও যোগশাস্ত্রের দুই চারিখানা পাতাও উল্টাইয়া যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করিয়া পাণ্ডিত্য দেখাইতেও শিখিয়াছি। বানপ্রস্থ পথাবলম্বন ব্যতিরেকে গার্হস্থাশ্রমে প্রাণায়ামাদি সাধন দ্বারা কোন ফললাভ হয় না, এইরূপ অসার ও অযৌক্তিক কত কথাই বলিয়া থাকি।

বাস্তবিক বানপ্রস্থ অবলম্বন ব্যতীত যে কিছুই হয় না, একথা ঠিক। কিন্তু সে বানপ্রস্থ কি? বা কাহাকে বলে? বানপ্রস্থ পদে দুইটি শব্দ আছে; যথা, বান + প্রস্থ। বান = বন + ষ্ণ; প্রস্থ = প্রকৃত রূপে স্থিতি। বানপ্রস্থ অর্থে বনে প্রকৃষ্টরূপে স্থিতি বুঝায়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, বাহিরে বন বা অরণ্যে স্থিতিলাভ করা দূরে থাকুক, তাহার নিকটেও যাওয়া অতীব ক্লেশকর এবং সাধুরাও সেই বনে যাইতে উপদেশ দেন না বরং তাঁহারা স্ত্রীপুত্র লইয়া গৃহে থাকিতেই বলেন। এরূপ স্থলে কি করা যায়? সাধুরা যখন গৃহে থাকিতেই বলেন, অথচ শাস্ত্রেও বানপ্রস্থের উল্লেখ আছে, তখন নিশ্চয়ই ইহার কোন গূঢ় রহস্য আছে; সে রহস্য সাধারণের জানা নাই। ভাল, দেখা যাউক, গৃহের নিকটে কোনও বন আছে কি না। সাধুবাক্য এবং শাস্ত্র কখনই মিথ্যা নহে; কেননা শাস্ত্রও আপ্তবাক্য। সুতরাং সাধুবাক্যে ও শাস্ত্রে অনৈক্য হইতেই পারে না। তবে আমরা আপ্ত হইতে পারি নাই বলিয়া, শাস্ত্রে প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারি না। ব্যাকরণের সাহায্যে প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সে যাহা হউক, গৃহের নিকটে বন আছে কিনা, এস্থলে তাহাই আলোচ্য; বাহ্যজগতে যাহা কিছু আছে, এই দেহরূপ ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডেও সে সবই আছে।

দেহেহ স্মিন্ বর্ত্ততে মেরুঃ সপ্তদ্বীপসমন্বিতঃ।
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলাঃ ক্ষেত্রাণি ক্ষেত্রপালকাঃ।।
ঋষয়ো মুনয়ঃ সর্ব্বে নক্ষত্রাণি গ্রহাস্তথা।
পুণ্যতীর্থানি পীঠানি বর্ত্তন্তে পীঠদেবতাঃ।।
সৃষ্টিসংহারকর্ত্তারৌ ভ্রমন্তৌ শশিভাস্করৌ।
নভো বায়ুশ্চ বহ্নিশ্চ জলং পৃথ্বী তথৈবচ।।

ত্রৈলোক্যে যানি ভূতানি তানি সর্ব্বাণি দেহতঃ।
মেরুং সংবেষ্ট্য সর্ব্বত্র ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে।।

শিবসংহিতা।

সুতরাং বনে যাইবার জন্য দূরে যাইতে হয় না। এই দেহেই সেই বন আছে এবং কামাদি ছয় রিপু ও একাদশ ইন্দ্রিয় হিংস্র জন্তুরূপে বাস করিতেছে। সেই জন্যই সাধকবর রামপ্রসাদ সেন সঙ্গীতচ্ছলে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন ঃ—

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।
মূলাধারে সহস্রবারে সদা যোগী করে রমণ"।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।

ইহার দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, সাধকের এক ভাব এবং ব্যাকরণাদি দ্বারা সাধিত যে অর্থ, তাহার আর এক ভাব। ব্যাকরণাদির সাহায্যে যে অর্থ বোধ হয়, তাহার দ্বারা কাজ না হইয়া কেবল বাগ্‌বিতন্ডা ও তর্কবিতর্কই হইয়া থাকে। ষড়দর্শনাদি শাস্ত্রপাঠমাত্রে এপর্য্যন্ত কাহারও ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই। দেহের মধ্যে যে ষট্‌চক্র আছে, ঐগুলি ভেদ করিয়া, যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারই যথার্থ ষড়দর্শনের জ্ঞান হইয়াছে; নতুবা কেবল গ্রন্থপাঠে যে অদর্শন, সেই অদর্শনই থাকে—কোন জ্ঞানই হয় না; কতকগুলি শব্দ মুখস্থ হয় মাত্র। যিনি কখনও চিনি খান নাই বা কখনও চিনি দেখেন নাই, তিনি যেমন চিনির গুণকীর্ত্তন শুনিয়া বা চিনির গুণ পুস্তকে পাঠ করিয়া, চিনির মিষ্টতাবোধ বা চিনির জ্ঞান লাভ করিতে পারেন না, তেমনি সাধনমার্গ অবলম্বন না করিয়া, কেবল শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। বেদ পুরাণাদি পাঠ করিয়া নারদেরই যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই, তখন অন্যে পরে কা কথা।

সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্ত্বেন নারদোঽতি শুশোচ হি।।
বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্ব্বৈশ্চ শোচিতা।।

পঞ্চদশী।

অর্থাৎ নারদ পুরাণের সহিত পঞ্চবেদ ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্ববিৎ হইতে না পারায়, শোকাকুল হইয়াছিলেন; বেদাধ্যয়নের পূর্ব্বে কেবল মাত্র ত্রিতাপে তাপিত ছিলেন; কিন্তু বেদাধ্যয়নের পর পাঠ বিস্মরণ, অবমাননা ও গর্ব্বহেতু তাঁহার মনের আরও অশান্তি হইয়াছিল।

শাস্ত্রের গূঢ় রহস্য সদ্‌গুরুর উপদেশে কেবলমাত্র সাধনের দ্বারাই অবগত হওয়া যায়,—নচেৎ নহে। সাধকবর রামপ্রসাদ সেন যে পদ্মবনের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা এই দেহের মধ্যেই আছে। অনেক সাধকও এই দেহকেই বৃন্দাবন বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রামপ্রসাদ যে পদ্মবনের কথা বলিয়াছেন, সেই পদ্মবন মূলাধার হইতে সহস্রার পর্য্যন্ত স্থানে আছে এবং সেই বনে হংসও বিচরণ করিতেছে। সে হংস পক্ষী নয়; উহা আমাদের প্রাণ, যাহা শ্বাসরূপে প্রতি ঘটেই বিরাজ করিতেছে এবং যাহা জীবমাত্রেই প্রত্যহ ২১৬০৭ বার অজপারূপে জপ করিতেছে। ইহার মধ্যে যে গুপ্ত রহস্য আছে, তাহা সদ্‌গুরু লাভ না হইলে, অবগত হওয়া যায় না; গুরুপদেশে এই দেহরূপ বৃন্দাবনে থাকিতে থাকিতে, প্রকৃষ্টরূপে স্থিতিলাভ হইলেই বানপ্রস্থ ধর্ম্ম প্রকৃতরূপে অনুষ্ঠিত ও প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে স্থিতিলাভ হয়। আজ্ঞাচক্রে স্থিতি হইলেই ইচ্ছার নাশ হয় এবং ইচ্ছার নাশেই যথার্থ সন্ন্যাসী হওয়া যায়, নতুবা নহে। কিন্তু আমি ত এখন ইচ্ছার দাস; তবে কি একখানা গৈরিক বস্ত্র বা কৌপীন ধারণ করিয়াছি বলিয়াই সন্ন্যাসী, দণ্ডী, ব্রহ্মচারী, পরিব্রাজক বা পরমহংস হইব? তাহা কখনই হইতে পারে না।

প্রথমতঃ—সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি? কেবল গৈরিক বস্ত্র ধারণ করাই কি সন্ন্যাস? তাহা হইতে পারে না। সন্ন্যাস শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্য— ভগবান্ ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে অর্পণ। তাহা কি আমার হইয়াছে? যখন আমি ইচ্ছার দাস, সমস্তই নিজের ইচ্ছাবশে করিতেছি, এবং "আমি" "আমার" ও সম্পূর্ণ রহিয়াছে, তখন আমার সন্ন্যাস কোথায়? তবে লোকে জানে আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু কাজে কিছুই নহি। কর্ম্মের সঙ্গে আমার খোঁজ নাই, শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া আত্মযোগ বা কর্ম্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া বসিয়াছি। কর্ম্মযোগ ব্যতীত যে সন্ন্যাস লাভ হয় না, শাস্ত্র পাঠ করিয়াও তাহা আমার জানা হয় নাই, কেননা, কোন যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে শা[illegible] অধ্যয়ন না করিয়া, অযুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে করিয়াছি। কর্ম্মী ব্যতীত অপরের কাছে [illegible] স্ত্র বিষয়ক জ্ঞান হয় না। সুতরাং শাস্ত্রের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে না পারিয়া, কেবল ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতেছি। সন্ন্যাস শব্দেরও ঐরূপ ভাষার্থ পড়িয়া নিজেও মজিয়াছি এবং অপরকেও মজাইবার চেষ্টা করিতেছি। এইরূপ ভ্রমে পড়িয়া অনেকেই কষ্ট পাইতেছেন। বস্তুতঃ আজকাল যে সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করা হয়, তাহা প্রকৃত সন্ন্যাস নহে—

ব্রহ্মজ্ঞানে সমুৎপন্নে বিরতে সর্ব্বকর্ম্মণি।
অধ্যাত্মবিদ্যানিপুণঃ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ।।
বিহায় বৃদ্ধৌ পিতরৌ শিশুং ভার্য্যাং পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বাঽসমর্থান্ বন্ধুংশ্চ প্রব্রজন্নারকী ভবেৎ।।

অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে,– সমুদায় কর্ম্মের আসক্তি রহিত হইলে, অধ্যাত্মবিদ্যাপারদর্শী ব্যক্তি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিবেন। যিনি বৃদ্ধ পিতামাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা, শিশু পুত্রকন্যা এবং অসমর্থ বন্ধুগণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) গ্রহণ করেন, তিনি নরকভাগী হন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন,– যোগ ব্যতীত সন্ন্যাস হয় না –

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি।।

অর্থাৎ হে মহাবাহো। কর্ম্মযোগ ব্যতীত সন্ন্যাস পাওয়া কঠিন; কিন্তু যোগযুক্ত মুনি অচিরাৎ ব্রহ্মকে পান। পরন্তু আমরা ইহার বিপরীত কার্য্যই করিয়া থাকি এবং শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য না জানায়, আমাদের সকল কার্য্যই এই প্রকার বিপরীত ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; সুতরাং বিপরীত ফলও দৃষ্ট হয়।

দ্বিতীয়তঃ– দন্ডী কাহাকে ...স ? দুই পাতা বেদান্ত পড়িয়া একটি বংশদন্ড ধারণ করিলেই কি দন্ডী হওয়া যায় ? কখনই নহে। কর্ম্মযোগের আশ্রয় ব্যতীত দন্ডধারণ হয় না। দন্ড শব্দের মূল (দম ধাতু = দমন করা) যদ্দ্বারা দমন করা যায়। এক্ষণে দেখা যাউক, কি দমন করিতে হইবে। দন্ডের দ্বারা যে শৃগাল কুকুর তাড়াইতে হইবে, এমত অর্থ, বোধ হয় কখনই নহে। দন্ড শব্দে যদ্দ্বারা ইন্দ্রিয় দমন হয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। কর্ম্মযোগ ব্যতীত শাস্ত্রাদিপাঠে বা কথায় ইন্দ্রিয়দমন হয় না। কর্ম্মই ব্রহ্ম, যাহা জীবমাত্রেই অজপারূপে বিরাজ করিতেছে। সেই অজপারূপ কর্ম্মই দন্ড এবং সেই দন্ড যিনি ধারণ করিয়া আছেন, তিনিই দন্ডী; নচেৎ একটি বংশদন্ড ধারণ করিলে, দন্ডী হওয়া যায় না।

মৌনানীহানিলায়ামা দন্ডা বাগ্দেহচেতসাম্।।
ন হ্যেতে যস্য সন্ত্যঙ্গ বেণুভির্ন ভবেদ্ যতিঃ।।

শ্রীমদ্ভগবত ১১শ স্কন্ধ।।

অর্থাৎ মৌন, অনীহা (নিস্পৃহতা) এবং অনিলায়াম (প্রাণায়াম) এই তিনটি বাক্য, দেহ এবং চিত্তের দন্ড (নিয়ামক); এই তিনটি যাঁহার নাই, তিনি যতি নহেন; কেবল বংশদন্ড ধারণ করিলেই যতি হয় না। * কেবল বংশদন্ডধারী মাদৃশ দন্ডীর দ্বারা দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

---

* মৌন অর্থাৎ যাঁহার বাক্য সংযম হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহার মন ব্রহ্মে লয় হওয়ায় কথা কহিবার ইচ্ছা নাই। জোর করিয়া কথা বন্ধ করিয়া থাকা, অথবা কথা না কহিয়া ইঙ্গিতের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা, মৌনের লক্ষণ নহে। যেমন দুগ্ধপোষ্য বালক অথবা বোবা ইহাদের কথা কহিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু শক্তি নাই বলিয়া কথা কহিতে পারে না, ইহাদিগকে মৌনী বলা যায় না। "মুনিঃ সংলীনমানসঃ।"

অনীহা– অর্থাৎ নিস্পৃহতা, যাহা ইচ্ছা রহিত অবস্থায় হয়, যখন ইচ্ছা নাই, তখন চিন্তা নাই; চিন্তা নাই তো ক্ষয়ও নাই। "চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাম্"। অনিলায়াম প্রাণায়াম = প্রাণায়াম, দ্বারা চিত্তের লয় হয় (ব্রহ্মে), সুতরাং উহা চিত্তের দন্ডস্বরূপ।

তৃতীয়তঃ—ব্রহ্মচারী কে? যিনি ভগবান্ ব্রহ্মে বিচরণ করেন অর্থাৎ যাঁহার মন সর্ব্বদাই শূন্যস্বরূপ ব্রহ্মে লাগিয়া আছে, তিনিই ব্রহ্মচারী। ঐরূপ হওয়াও কর্ম্মযোগ-সাপেক্ষ। কর্ম্মযোগের দ্বারা মন যখন ইন্দ্রিয় বিষয় হইতে বিরত হইয়া ব্রহ্মে যুক্ত হয়, তখনই ব্রহ্মচারী; নচেৎ গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক কেবল ফলমূলাহার ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে, ব্রহ্মচারী হওয়া যায় না। উক্তরূপ আহারে ইন্দ্রিয়গণের দমন না হইয়া বরং উত্তেজনাই হইয়া থাকে। সুতরাং আমার ন্যায় কর্ম্মশূন্য এইরূপ ব্রহ্মচারীর দ্বারা জগতের ইষ্ট ভিন্ন ইষ্টের আশা কিরূপে সম্ভবে?

চতুর্থতঃ – পরিব্রাজক শব্দেরও প্রকৃত তাৎপর্য্য ঐরূপ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেরূপ পরিব্রাজক অতি বিরল। আজকাল আমার ন্যায় ভেকধারী পরিব্রাজকের অভাব নাই। লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সামান্য অর্থের জন্য আমি লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াই!! একটা গৈরিক আলখাল্লা গায়ে দিয়া এদেশ সেদেশ ঘুরিয়া বেড়ানই কি পরিব্রাজকের ধর্ম্ম? পরিব্রাজক শব্দের অর্থ কি? শব্দার্থ দেখিতে গেলেও দেখা যায় যে, পরিব্রাজক = পরি (সর্ব্বতোভাবে) + ব্রজ (গমন কৃ + অক) অর্থাৎ যিনি সর্ব্বতোভাবে গমন করেন। এখন দেখা যাউক, কোথায় যাইতে হইবে। দেশবিদেশ পর্য্যটনই কি উদ্দেশ্য? তাহা কখনই হইতে পারে না। কেননা, দেশবিদেশ বা তীর্থ ভ্রমণে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। শাস্ত্রেও লিখিত আছে,–

ইদং তীর্থমিদং তীর্থং ভ্রমন্তি তামসা জনাঃ।
আত্মতীর্থং ন জানন্তি কথং মোক্ষো বরাননে।।

অর্থাৎ এই তীর্থ এই তীর্থ,– করিয়া তামসিক জনেরাই ঘুরিয়া বেড়ায়। হে বরাননে! আত্মতীর্থ যিনি জানেন না, তাঁহার মোক্ষ কোথায়?

অতএব এখানে গমন শব্দে ভগবান্ ব্রহ্মে মনের লয় করিবার জন্য দেহস্থিত ষট্চক্রপথে গমনাগমন বুঝিতে হইবে। দেহের মধ্যেও একটি দেশ আছে। তাহাকে 'উপদেশ' কহে। সেই উপদেশ প্রাপ্ত হইলেই ধ্যানাবস্থা পাওয়া যায়। ইহা কর্ম্মযোগ সাপেক্ষ। কর্ম্মযোগের সাহায্য ব্যতীত জীবের উপায়ান্তর নাই। সাধারণতঃ পরিব্রাজক উপাধি ধারণ করা কঠিন নহে; কিন্তু কর্ম্ম করিয়া পরিব্রাজক হওয়া বড় কঠিন। শাস্ত্রে পরিব্রাজকের যে সকল লক্ষণ ও কার্য্য বলিয়াছেন, আমার ন্যায় পরিব্রাজকের ত সে সকলের কিছুই নাই। যথা–

সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগো ভৈক্ষ্যাশ্যং ব্রহ্মমূলতা।
নিষ্পরিগ্রহতা দোহসমতা সর্ব্বজন্তুষু।।
প্রিয়াপ্রিয়পরিষ্বঙ্গে সুখদুঃখাবিকারিতা।

সবাহ্যাভ্যন্তরং শৌচং সুখদুঃখাবিকারিতা।
সর্ব্বেন্দ্রিয়সমাহারো ধারণাধ্যাননিত্যতা।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেষ পরিব্রাড়্বর্য্য উচ্যতে।।

গরুড় পুরাণ।

এই সকল লক্ষণ নিজের সঙ্গে মিলাইলেই আমার চক্ষুঃকর্ণের বিবাদ মিটিয়া যায়। তখন কেহ পরিব্রাজক বলিয়া ডাকিলে আমার মুখে আর কথা সরে না।

পঞ্চমতঃ– সন্ন্যাসী প্রভৃতির যেরূপ অবস্থা, পরমহংসেরও তদ্রূপ অবস্থা; অর্থাৎ নামে পরমহংস,–কাজে নহে। পরমহংস এই শব্দের অর্থবোধ আমার নাই। হংসেরই যখন ব্যুৎপত্তি জানা নাই, তখন পরমহংসের তাৎপর্য্য জানিব কিরূপে? কর্ম্মযোগ বা আত্মকর্ম্মের আশ্রয় ব্যতীত পরমহংসের অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। জীব দিবারাত্রে 'হংস' এই মন্ত্র ২১৬০০ বার জপ করিতেছে। কর্ম্মযোগের দ্বারা এই 'হংস' স্বতঃ স্থির হইলে যে অবস্থা হয়, তাহাই পরমহংসের অবস্থা অর্থাৎ হংসের অতীত অবস্থা। কর্ম্মযোগের দ্বারা যিনি এই অবস্থা লাভ করেন, তিনিই পরমহংস এবং তিনি সকলেরই প্রণম্য। কিন্তু কৈ, আমার ত সে অবস্থা লাভ হয় নাই, তবে আমি পরমহংস কিসের? আমি কেবল মুখের পরমহংস– কাজের নহি। আমার ন্যায় এই প্রকার কর্ম্মশূন্য পরমহংসের আজকাল অভাব নাই।

মুখে না হয় বলিলাম, "আমি সকল কর্ম্মই ত্যাগ করিয়াছি", কিন্তু বস্তুতঃ আমার কোন কর্ম্মেরই ত্যাগ হয় নাই; কেননা আমি সকল কর্ম্মই আসক্তির সহিত করিয়া থাকি। এরূপ স্থলে আমার কর্ম্মত্যাগ কোথায়? কর্ম্ম কাহাকে বলে, তাহাও জানিনা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কর্ম্ম কি, তাহা যদি আমার জানা থাকিত, তাহা হইলে, আর আমাকে আসক্তির অবস্থায় কর্ম্মত্যাগ করিতে হইত না। কর্ম্ম যে ত্যাগ করা যায় না, তাহাও আমি জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে আর ওরূপ করিতাম না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, "কর্ম্ম নাকি আবার ত্যাগ করা যায় না। মনে করিলেই ত ত্যাগ করা যাইতে পারে।" কিন্তু মনে করুন, আমি কোন কর্ম্ম করিলাম না,– বসিয়া রহিলাম, তাহাতেই কি আমার কর্ম্মত্যাগ হইল? কখনই না, কারণ অন্য কোন কর্ম্ম না করিলেও জন্মের সহিত আমি যে প্রাণকর্ম্ম পাইয়াছি, তাহা ত বন্ধ হয় নাই। আমি ইচ্ছা করি, বা না করি, উহার আর বিরাম নাই– চলিয়াছেই। যাহা করা যায়, তাহাই যখন কর্ম্ম, তখন শ্বাস প্রশ্বাস ত্যাগ ও গ্রহণটাও আমার কর্ম্ম। এই কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণকালও থাকিতে পারে না–

নহি দেহভৃতা শক্যং তক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে।।

গীতা।

অর্থাৎ দেহীগণ নিঃশেষরূপে কর্ম্মসকল ত্যাগ করিতে পারে না। কিন্তু যিনি কর্ম্মফলত্যাগী, তিনিই ত্যাগী বলিয়া অভিহিত হন। তবে আমার কর্ম্মত্যাগ কোথায়? অতএব কর্ম্মত্যাগ করিতে হইলে, অগ্রে প্রাণের কর্ম্ম স্বতঃ রহিত করিবার চেষ্টা করা আবশ্যক। প্রাণকর্ম্ম রহিত হইলে, কর্ম্মত্যাগ আপনা আপনিই হইবে। তখন আর ইচ্ছা করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে না। ত্যাগ করাটাও কি ইচ্ছা নহে? আমি ত্যাগ করি কেন? অবশ্যই আমার কোন না কোন ভবিষ্যৎ কামনা আছে, সেই জন্যই আমি ত্যাগ করিতেছি। কিন্তু ইচ্ছাই যখন বন্ধের কারণ, তখন এইরূপ ত্যাগের দ্বারা কখনই আমার মুক্তি বা সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। কেননা,ঐরূপ ত্যাগে কখনই ইচ্ছার নাশ হয় না। একটি বিষয় ত্যাগ করিতে না করিতেই মন অমনি আর একটিতে আকৃষ্ট ও আসক্ত হইয়া থাকে। অতএব প্রকৃত ত্যাগ করিতে হইলে, অগ্রে ইচ্ছার নাশ করা চাই। প্রাণের চঞ্চলাবস্থাই সেই ইচ্ছার মূলীভূত কারণ। অতএব কর্ম্মযোগের দ্বারা প্রাণের সেই চঞ্চলতা দূর করিয়া, তাহার স্থিরত্বসাধন করিলে, তবে ইচ্ছার নাশ হইতে পারে-নচেৎ নহে।

প্রাণ স্বতঃ স্থির হইলে, প্রাণকর্ম্মও রহিত হইয়া যাইবে এবং প্রাণকর্ম্ম রহিত হইলে, জ্ঞানোদয়ে ত্যাগও আপনা আপনি হইবে। তখন আর নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করিতে হইবে না। নতুবা বেদ, বেদান্ত, পঞ্চদশী ও দর্শনশাস্ত্রাদি অধ্যয়ন মাত্র করিয়া যদি বলা যায় যে, "কর্ম্মযোগ আবার কি? জ্ঞান ব্যতীত কেবল কর্ম্মযোগে কিছুই হয় না এবং সেই জ্ঞান শাস্ত্রাদির পাঠ ও আলোচনার দ্বারা হইয়া থাকে", তাহা হইলে ধৃষ্টতা বা বাতুলতা প্রকাশ করা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কেননা, সাধন ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠে এপর্য্যন্ত কাহারও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় নাই। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, বর্ত্তমানকালের পন্ডিতগণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া, সাধুশ্রেণীভুক্ত হইতে পারিতেন; কিন্তু কৈ, তাহা ত দেখা যায় না। বরং এরূপ অনেক দেখা যায় যে, সাধু শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই লেখা পড়া না জানিয়া, বা শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়াও কেবল আত্মকর্ম্মদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইয়াছেন।

শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কেবল কতকগুলি কথা শিখা যায় মাত্র,—ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ক কথা মুক্তির কারণ নহে, সদ্‌গুরুপদিষ্ট সাধন অর্থাৎ কর্ম্মযোগই মুক্তির কারণ। জলপানেই পিপাসা দূর হয়—জল জল করিয়া চীৎকার করিলে, পিপাসা

মিটে না। তদ্রূপ শাস্ত্রাদিপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান হয় না, বরং বৃথা বাক্যব্যয়ে শাস্ত্রের মীমাংসা না হইয়া ক্রমশঃ নাস্তিকতাই আসিয়া পড়ে। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাঁহার হৃদয়ে সদাই শান্তি বিরাজ করে; কিন্তু আজকাল কোন শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতেরই ত তাহা দেখা যায় না। বরং শান্তির পরিবর্ত্তে অভাবই দৃষ্ট হয়। শান্তি সাধনের ধন; বিপরীত বুদ্ধি বশতঃ অগ্রে কর্ম্মযোগের আশ্রয় ত্যাগ করিলে, শান্তি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িতে হয়। অতএব প্রথমেই কর্ম্মত্যাগ না করিয়া, যাহাতে কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ হয়, স্বতঃ পরতঃ অগ্রে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। নতুবা কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া বা বহুরূপীর ন্যায় সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া, জ্ঞান জ্ঞান ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিয়া বেড়াইলে কিছুই হইবে না। গীতাতে ভগবান্ বলিয়াছেন—

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি।।

অর্থাৎ লোকে কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, নৈষ্কর্ম্ম্যের অবস্থা লাভ করিতে পারে না। কেবল মাত্র সন্ন্যাসেই (কর্ম্মত্যাগেই) সিদ্ধি (ইচ্ছারহিত অবস্থা) পাওয়া যায় না। ইচ্ছা রহিত না হইলে ত্যাগ হয় না; ত্যাগ না হইলে শান্তি হয় না এবং শান্তি ব্যতীত সুখ হয় না। "অশান্তস্য কুতঃ সুখম্" (গীতা ২য় অঃ ৬৬তম শ্লোক) অর্থাৎ শান্তি ব্যতীত সুখ কোথায়? কর্ম্মযোগের অভ্যাস দ্বারা যখন সাধ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ দর্শন অর্থাৎ স্পষ্ট অনুভব হয়, তখনি তাহা জানা হয়। সেই জানার নামই জ্ঞান। শাস্ত্রপাঠের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, তাহা কল্পনা বা অন্যের কথা মানিয়া লওয়া মাত্র। সুতরাং তাহাতে সন্দেহ ভঞ্জন না হইয়া, সময়ে সময়ে বরং বিপরীত ফলই দেখা যায়। যে সকল মহাত্মার দ্বারা শাস্ত্র সকল প্রণীত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রকৃত ভাব অবগত হওয়া বড় কঠিন। কারণ, তাঁহারা যে সকল ভাব বা অবস্থার বিষয় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কর্ম্মী ব্যতীত অপরের বোধগম্য হওয়া অসম্ভব। এই জন্যই অজ্ঞানীরা "নানা মুনির নানা মত" এই কথা বলে এবং শাস্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস ও ঘৃণা করিয়া থাকে।

শাস্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ একই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদের কখনও মতভেদ হইতে পারে না। তাঁহাদের মতভেদ আছে বলিলে, প্রকারান্তরে তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বলা হয়।প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবে আমাদের মতভেদ রহিয়াছে বলিয়া, আমরা সকল ঋষির একমত দেখিতে পাই না। আমরাই ভেদজ্ঞানপূর্ণ, সুতরাং আমরা নানা মুনির নানা মত দেখিয়া থাকি। যাহার যেমন ভাব, তিনি তেমনি বুঝিয়া থাকেন। যেমন,শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি করিতেন, তখন যশোদা মনে করিতেন— "গোপাল,ননী খাইবার সময় হইয়াছে বলিয়া, আমায় ডাকিতেছে"; গোপবালকগণ

মনে করিত—"কানাই গোচারণের জন্য আমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন"; ধেনু বৎসগণ মনে করিত—"আমাদের গোষ্ঠে বা মাঠে যাইবার সময় হইয়াছে, তাই রাখাল কানাই ডাকিতেছে"; এবং সাধকগণ মনে করিতেন—'যেন প্রণবধ্বনি হইতেছে।' এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি এক বই দুই রকম নহে; অথচ যাহার যেমন ভাব, সে সেই ভাবেই বুঝিয়া লইত। সেইরূপ ঋষিদিগের বাক্যার্থ এক, কিন্তু আমাদের যাহার যেমন ভাব, আমরা সেইরূপ বুঝিয়া থাকি। শ্রীকৃষ্ণ কুটস্থ চৈতন্য সকল ঘটেই বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু সকল ঘটে প্রকাশ নহেন। যে সকল ঘটে প্রকাশ, তাঁহারাই ঋষি। তাঁহাদের আর নানা মত হইতে পারে না। আমরা জড়বুদ্ধি; এজন্য আমরা নানা মত দেখিয়া থাকি। সুতরাং আমাদের পক্ষে শাস্ত্র পাঠ করা অপেক্ষা পাঠ না করাই ভাল। কেননা, শাস্ত্র পাঠে যদি আমার সংশয়চ্ছেদ বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ নাই হয়, তাহা হইলে, আর আমার শাস্ত্র পাঠে আবশ্যক বা ফল কি?

আরও দেখুন, যখন শাস্ত্র অনন্ত এবং জীবের আয়ু অল্প তখন এত সময়ই বা কৈ, যে সমুদায় পড়িয়া শেষ করি? অতএব শাস্ত্রের যে সারভাগ, তাহাই আশ্রয় করা উচিত। উত্তর গীতাতে ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন—

অনন্তশাস্ত্রং বহু বেদিতব্যং
স্বল্পশ্চ কালো বহবশ্চ বিঘ্নাঃ।
যৎ সারভূতং তদুপাসিতব্যং
হংসো যথা ক্ষীরমিবাম্বুমিশ্রম্।।

অর্থাৎ শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞাতব্য অনেক; আয়ুঃ অল্প এবং বিঘ্নও বহু এস্থলে, জলমিশ্রিত দুগ্ধ হইতে হংসের দুগ্ধ পানের ন্যায় (ঐ অনন্তের মধ্যে) সারাংশটুকুই অবলম্বনীয়। একমাত্র যোগীরাই সেই সারটুকু জানেন।জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে উক্ত আছে—

মন্থিত্বা চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি চৈব হি
সারস্তু যোগিভিঃ পীতস্তক্রমশ্নন্তি পন্ডিতাঃ।।

অর্থাৎ চারি বেদ ও সকল শাস্ত্র মন্থন করিয়া, নবনীতরূপ সারভাগ যোগীরা পান করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ঘোল অর্থাৎ অসার ভাগ লৌকিক পন্ডিতেরা পান করেন। বাস্তবিক শাস্ত্র পাঠ করিয়া যদি তাহার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত হওয়া না যায়, তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট আর নাই। যথা—

আলোচ্য চতুরো বেদান্ সর্ব্বশাস্ত্রাণি সর্ব্বদা।
যোহহং ব্রহ্ম ন জানাতি দর্ব্বী পাকরসং যথা
যথা খরশ্চন্দনভারবাহী

ভারস্য বেত্তা নতু চন্দনস্য।
তথৈত শাস্ত্রাণি বহূন্যধীত্য
সারং ন জানন্ খরবৎ বহেৎ সঃ।।

উত্তর গীতা।

দর্ব্বী শব্দের অর্থ হাতা। হাতা যেমন সকল অন্নব্যঞ্জক পাক করিয়াও তাহার রসাস্বাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ আমার ন্যায় জড়বুদ্ধি মানবগণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না; অথবা গাধা যেমন চন্দনের বোঝাই বহিয়া থাকে, তাহার গুণ বুঝিতে পারে না, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও যিনি সার জানেন না, তিনি গাধার ন্যায় ভারই বহন করেন মাত্র।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই, কেননা, যুক্ত না হইলে বুদ্ধি স্থির হয় না। স্থিরবুদ্ধি ব্যতীত কোন কার্য্যও হয় না। অযুক্ত ব্যক্তির বুদ্ধি চঞ্চল। চঞ্চল বুদ্ধি থাকা না থাকা সমান। ইহাতে এমন বোধ হইতে পারে যে, তবে কি শাস্ত্র অপাঠ্য? না, তাহা মনে করা ভুল। একমাত্র কর্ম্মযোগ যে আত্মজ্ঞান লাভের মূল কারণ, শাস্ত্র তাহার সাক্ষিস্বরূপ—ইহাতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা জন্মে। আমি গুরুপদেশে যে কর্ম্ম পাইয়াছি, সেই কর্ম্ম ঋষিদিগের অনুমোদিত, এবং অভ্রান্ত, শাস্ত্র তাহা দেখাইয়া দেয়। যুক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে শাস্ত্র পাঠ করিলে, উহা অপাঠ্য নহে।কারণ যুক্ত ব্যক্তি শাস্ত্রের সারভাগ দেখাইয়া দিয়া ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় কর্ম্মযোগের উপদেশ দিয়া থাকেন। পরে ঐ কর্ম্মযোগের প্রভাবে আত্মজ্ঞান লাভ হইলে, সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী হইতে পারা যায়। নচেৎ শাস্ত্রপাঠ বিড়ম্বনা মাত্র।

অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, কর্ম্মযোগের আশ্রয় লওয়া আবশ্যক। নতুবা ধ্যানাবস্থা পাওয়া যায় না। ধ্যানের পর সমাধি বা যুক্তাবস্থা। সেই ধ্যান করি কাহার? যাঁহার বিষয় ভাবনা বা চিন্তা করিব, তৎসম্বন্ধে আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান নাই। বরং তাঁহার সম্বন্ধে শাস্ত্র এবং লোকের মুখে নানা কথাই শুনতে পাই। কেহ বলেন, তিনি সাকার, কেহ বলেন তিনি নিরাকার, কেহ বা তাঁহার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। সুতরাং আমরা পরস্পরের মত খন্ডন করিবার জন্য বিষম তর্ক ও গন্ডগোল করিয়া থাকি এবং অপর পক্ষকে পরাস্ত করিবার জন্য নানা কূটতর্কের অবতারণাও করিয়া থাকি। সত্যের প্রতি আমার লক্ষ্য নাই, কেবল তর্কে জয়ী হইবার চেষ্টা। মিথ্যাকে সত্য সাজাইতেও কুণ্ঠিত নহি। নিজে বুঝি না, অথচ অপরকে বুঝাইবার জন্য ব্যাকুল, গলাবাজিতেও খুব মজবুত। শাস্ত্রপাঠে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া 'অস্তি' 'নাস্তি' সম্বন্ধে এরূপ ঘোর আন্দোলন করিয়া থাকি যে, আমার গগনভেদী চীৎকারে ও বক্তৃতায় দিক্ সকল কম্পিত হইয়া

থাকে। বিচারে কাহাকেও জয়ী হইতে দিব না, ইহা আমার দৃঢ় সঙ্কল্প। অথচ তিনি সাকার কি নিরাকার, কিংবা তাঁহার অস্তিত্বই আছে, কি নাই, এ সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞান নাই। কিন্তু কোট বজায় রাখিবার জন্য হয় ত বলিয়া থাকি, তিনি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, নিরাকার, চৈতন্যস্বরূপ,একমাত্র বর্ত্তমান এবং জগতের সৃষ্টিকর্তা।

ভাল না হয় স্বীকার করিলাম যে, তিনি একমাত্র, সৃষ্টিকর্তা ও নিরাকার; তাহা হইলেও এস্থলে দুইটি প্রশ্ন হইতে পারে– প্রথম বাস্তবিক তিনি একমাত্র কি না ? এবং দ্বিতীয়– তাঁহার আকার বা রূপ আছে কিনা ? তিনি যদি একমাত্র হইলেন, তবে আমি কে ? আমি থাকিলেই দুই হইল; দুই হইলেই বহু রাশিতে পরিণত হইল। তাহা হইলে আর একমাত্র থাকিল কৈ ? ইহাতে না হয়, বলিলাম যে, তিনি একমাত্র, আমি পৃথক্ বা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একটি পদার্থ এবং আমার কার্য্য তাঁহার উপাসনা করা। কিন্তু ইহাও ভ্রান্তবাক্য। কেননা পুত্র যেমন পিতা হইতে পৃথক নহে, তদ্রূপ তিনি সৃষ্টিকর্তা হইলেও আমি তাঁহা হইতে পৃথক নহি। পুত্র পিতার সৃষ্টি পদার্থের মধ্যে হইলেও পৃথক্ নহে; কারণ পিতাই পুত্র, পুত্রই পিতা অর্থাৎ পুত্র পিতার রূপান্তর মাত্র–

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ।"

অর্থাৎ স্বশরীরস্থ্ আত্মা বা স্থির প্রাণ, শুক্ররূপে ভার্য্যার জঠরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন।

"স এষ ভগবান্ দ্রোণঃ প্রজারূপেণ বর্ত্ততে"।।

শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ।

এই কারণে জ্ঞানের চক্ষে "রমণী জননী, জননী রমণী" এই বাক্যটিও অনেকস্থলে শুনিতে পাওয়া যায়। সেই শুক্রধাতুই আমাদের প্রাণ এবং স্থির প্রাণই আত্মা।

"শুক্রধাতুর্ভবেৎ প্রাণঃ।'

জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্র।

প্রাণই যে আত্মা,তাহা পূর্ব্বে প্রমাণের সহিত বলা হইয়াছে। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। অতএব এরূপ স্থলে আমি তাঁহা হইতে পৃথক্ বা তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে একটি পদার্থ, একথা বলা সম্পূর্ণ অজ্ঞানের কার্য্য ব্যতীত আর কি হইতে পারে ? জ্ঞানের চক্ষে দেখিতে গেলে, এখন আমাদের যে "আমি" আছে, উক্তভাবে সে "আমি " থাকে না। এখন যে "আমি " রহিয়াছে, সেই "আমির" অহংভাবের নাশ হইলে, তবে তিনি "একমাত্র" অর্থাৎ যখন "একমাত্র" বলিবারও লোক থাকে না, তখনই "একমাত্র"। নচেৎ এক বলিতে গেলেই দুই বলা হইল; কেননা যিনি এক বলেন, তিনি এক এবং যাঁহাকে বলেন, তিনি এক–এই দুই। অতএব আমার "আমি"

থাকিতে তাঁহাকে একমাত্র বলা নিতান্ত ভ্রম।

উপরে বলা হইয়াছে যে, তিনি নিরাকার; কিন্তু তিনি যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে তাঁহার উপাসনা কেমন করিয়া করা যায়? উপাসনা শব্দের অর্থ সেবা, আরাধনা বা পূজা। যাঁহার আকার বা রূপ নাই, তাঁহার ধরি কি এবং সেবাই বা করি কিরূপে? এ স্থলে না হয় বলিলাম, সেবার অর্থ শুশ্রূষা নহে, তাঁহার বিষয় চিন্তা করার নামই সেবা। কিন্তু ইহাও অসম্ভব। কেননা তিনি যদি নিরাকার হন, তাহা হইলে তাঁহার চিন্তাই বা করি কিরূপে এবং কেই বা চিন্তা করে? নিরাকার বস্তুর সত্তা উপলব্ধি করা যায় না, উপাসনা কিরূপে সম্ভবিতে পারে?

প্রথমতঃ, আমরা যে সকল বিষয় চিন্তা করি, সেই চিন্তা মনের দ্বারাই হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণ মানবের মন অবলম্বন ব্যতীত চিন্তা করিতেই পারে না। সুতরাং আমাদের চিন্তার বিষয়মাত্রেরই একটা না একটা রূপ আছেই আছে। এরূপস্থলে আমার নিরাকার বস্তু চিন্তার বিষয়ীভূত হইয়া সাকার হইয়া পড়িল। নিরাকারের জ্ঞান আমাদের আদৌ নাই। শূন্যই একমাত্র নিরাকার বস্তু এবং উহা আমাদের সম্মুখেই আছে। কিন্তু তাহাতে আমাদের লক্ষ্য নাই এবং উহা দেখিতেও পাওয়া যায় না। "আমি শূন্য দেখিতেছি" একথা বলা আমার নিতান্ত ভ্রম। কেননা, আকাশ বা শূন্য দেখিবার জন্য উদগ্রীব হইয়া আকাশের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্র মেঘই আমার নয়নগোচর হয়। মন এক সময়ে দুই বস্তু দেখিতে পারে না। সুতরাং যখন মেঘ দেখিতেছি, তখন আমার শূন্যদর্শন হইল না। যেহেতু শূন্যের কোন রূপ নাই। আমি যেদিকেই দৃষ্টি নিক্ষেপ করি না কেন, সেই দিকেই কোন না কোন পদার্থই আমার নয়নপথে আসিয়া পড়ে,—শূন্যদর্শন হয় না। তদ্রূপ নিরাকরের চিন্তা করিতে গেলে, মনে নানা বিষয়ের চিন্তাই আসিয়া উদয় হয়। সুতরাং মন সেই সকল বিষয়েরই চিন্তা করে, নিরাকারের চিন্তা হয় না।

কর্ম্মযোগ ব্যতীত বিনা অবলম্বনে মন স্থির হয় না। মনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাবই এই যে, সে কখনও এক বিষয়ে স্থির থাকে না। এরূপ স্থলে আমার নিরাকারের উপাসনা হইল কৈ? কেবল তর্কের অনুরোধে মুখে বলি মাত্র যে, তিনি নিরাকার। বস্তুতঃ জড়বুদ্ধি মানবের পক্ষে নিরাকারের উপাসনা বিড়ম্বনা মাত্র। কেননা, চিন্তা করিতে গেলেই রূপ আসিবে, রূপ আসিলেই সাকার হইল, এবং সাকার হইলেই আর নিরাকার রহিল না। ইহাতে না হয় বলিলাম যে, আমি কোন রূপের চিন্তা করি না; আমি তাঁহার গুণের ও কার্য্যের চিন্তা করি এবং সেই গুণের কীর্ত্তন করিয়া থাকি। প্রথমতঃ এই কথায় তাঁহাকে সগুণ করা হইল, এবং সগুণ হইলেই তিনি সামান্য মানবের মধ্যে পরিগণিত হইলেন। তবে আমাদের অপেক্ষা তাঁহার না হয় দশটা ক্ষমতা বেশি আছে এইমাত্র। রাজা যেমন

মনে করিলেই আমাদের দন্ড দিতে পারেন, অথবা দুই দশ টাকা পুরস্কার দিয়া আমাদের কিছু উপকার করিতে পারেন, তিনিও না হয় সেইরূপ করিতে পারেন। তবে রাজা প্রত্যক্ষ থাকিতে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের উপাসনার আবশ্যকতা কি? রাজার উপাসনা করিলেই ত আমরা সুখী হইতে পারি? ইহাতে না হয় আমি বলিব যে, যিনি স্বর্গ রাজ্যের রাজা; তিনি আমাদের ও আমাদের রাজারও রাজা এবং আমাদের মৃত্যুর পর বিচার করিয়া পাপ পুণ্যের দন্ড বা পুরস্কার দিয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার পূজা বা উপাসনা করা উচিত। বাস্তবিক কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল এই মাত্র। যেহেতু ভগবৎসম্বন্ধে যাহা কিছু করা যায়, তাহাই ভাল। কিন্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবহেতু ইহাতেও প্রায় অনেকেরই ঘোর সংশয় ও অবিশ্বাস হইতে দেখা যায়।

এস্থলে ইহাও জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, তিনি পাপ ও পুণ্যের সৃষ্টিই বা করেন কেন? পাপকার্য্যের সৃষ্টি না হইলে ত আমি পাপ করিতাম না। যখন পাপের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন উহা যে তাঁহারই অভিপ্রায়ে হইয়াছে, তাহা বলা যাইতে পারে। আমি যখন বানররূপী জীব, তখন ইন্দ্রিয়-চরিতার্থের বিষয় সম্মুখে পাইলেই গ্রহণ করিব। জীবমাত্রেরই এই ধর্ম্ম। তবে "বেঁধে মারে, না সহে ভাল" এই জন্যই দন্ডের ভয়ে অতি কষ্টে ভোগপিপাসা সহ্য করি মাত্র। কিন্তু ইহাই কি সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের কর্ত্তব্য? তিনি ত আমাকে কেবল সৎ ইচ্ছা দিলেই পারিতেন। তাহা হইলে ত আমার এরূপ কুপ্রবৃত্তি হইত না,–এত কষ্ট ভোগও করিতে হইত না। যদি বলি, জগৎ জীবের পরীক্ষাস্থল; পরীক্ষা দিবার জন্যই আমরা জগতে আসিয়াছি। তাহা হইলেও ভগবানে দোষ অর্শে। কেননা, পরীক্ষা দিব কাহার কাছে? যিনি আমার কোন বিষয়ে অবগত নহেন, তাঁহার কাছে বরং একদিন পরীক্ষা দেওয়া সম্ভবে; কিন্তু যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার নিকট আমি কি পরীক্ষা দিব? তিনি কি আমার বিষয়ে কিছু জানেন না? যদি না জানেন, তাহা হইলে তিনি কেমন করিয়া সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারেন? সুতরাং পরীক্ষার কথা বলিতে গেলে, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতায় দোষ পড়ে।

সেবাদি করিলেই তিনি পাপ তাপ শোক দূর করেন বলিলেও তাঁহাতে দোষ হয়; কেননা যে তাঁহার সেবা পূজা বা স্তুতি করে, তাহাকেই তিনি ত্রিতাপ হইতে মুক্ত করেন, আর যে তাহা না করে, তাহাকে তিনি উদ্ধার করেন না। তবেই ত তিনি তোষামোদপ্রিয় সামান্য মানবের ন্যায় হইলেন। সুতরাং ইহাতেও তাঁহাতে দোষ অর্শে।

এই প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই নিষ্কলঙ্ক বস্তুতে এইরূপে নানা কলঙ্কের আরোপ করা হয়। অতএব নিরাকারের উপাসনা করা বা চিন্তা করা আমার বাতুলতা নয় কি? এরূপ স্থলে আমার সাকার উপাসনা মন্দ হইলেও অকরণীয় নহে। কেননা, এই সাকার

উপাসনা দোষযুক্ত হইলেও স্বল্পবুদ্ধি মানবের হিতের জন্যই ব্রহ্মের রূপকল্পনা ও সাকার মূর্ত্তিতে তাঁহার উপাসনার ব্যবস্থা হইয়াছে। কল্পনাই মিথ্যা, তবে সেই সাকার মূর্ত্তির যে সমস্ত পূজাবিধি আছে, তৎসমুদায়ই কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান অর্থাৎ তাহার মধ্যে ভূতশুদ্ধি, ন্যাস, প্রাণায়াম প্রভৃতি যোগক্রিয়া সকল নিহিত আছে। সেই সকল কার্য্যের প্রকৃত অনুষ্ঠান হইলে, আর সাকার কল্পনা করিতে হয় না, কোন মূর্ত্তিরও গঠন করিতে হয় না।

জড়বুদ্ধি মানবকে কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত করাইবার জন্যই মূর্ত্তিগঠন প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মযোগদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উদয় হইলে, আর কোন বাদ থাকে না। বাস্তবিক সাকার নিরাকার এ দুইই কল্পনা। ভগবান্ সাকারও নহেন, নিরাকারও নহেন; তাঁহাকে সাকার বলাও দোষ, নিরাকার বলাও দোষ। কেননা তিনি অব্যক্ত,—কথায় তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না। সাকার বা নিরাকার অথবা ব্রহ্ম, হরি, দুর্গা, কালী ইত্যাদি উপাধির দ্বারা তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না; যেহেতু ঐ সকল উপাধি বা শব্দ তিনি নহেন; তিনি যাবতীয় উপাধিরহিত ও শব্দাতীত। জল এই শব্দটি যেমন জল নয় এবং জল জল করিয়া চীৎকার করিলে যেমন পিপাসা মিটে না, তেমনি আমরা যে কিছু উপাধি বা শব্দ দ্বারা সেই অব্যক্ত পরাশক্তিকে প্রকাশ করিয়া থাকি, সে সকল উপাধি বা শব্দ তিনি নহেন এবং মুখে ঐ সকল উচ্চারণ করিলে, তাঁহার সম্বন্ধে কোন জ্ঞানও হয় না। তবে বাল্যকাল হইতে আমরা যাহাকে যাহা বলিতে অভ্যাস করিয়াছি, তাঁহাকে সেই নাম বা উপাধি দিয়া ডাকি এই মাত্র। যাহার যে ভাষা, সে তাহার ভাষানুরূপ নাম দিয়া থাকে। ভাষা বা বুলি ভিন্ন হইলেও বস্তুগত ভগবান্ সেই একই পদার্থ। ভাষা বা নাম অনুসারে তিনি ভিন্ন নহেন। কিন্তু ভাষা এক না হইলেও যখন বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন যেমন সব বিবাদ মিটিয়া যায়, তদ্রূপ ভগবদ্‌বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইলেই সাকার, নিরাকার, ব্রহ্ম, হরি, দুর্গা, কালী ইত্যাদিরূপ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ব্যতীত কেবল কথায় ঐ দ্বন্দ্বের মীমাংসা হইতেই পারে না।

জ্ঞানের চক্ষে দেখা যায় যে, তিনি সাকারও নহেন, নিরাকারও নহেন; অথচ তিনি সাকারও বটেন, নিরাকারও বটেন। সাকার নহেন, অথচ সাকার, ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যত দিন তিনি আমাতে আছেন অর্থাৎ যতদিন "আমি" আছি, ততদিন তিনি সাকার এবং যখন আমার "আমি" নাই, তখন তিনি নিরাকার। এইরূপ তিনি পূর্ণও নহেন, অংশও নহেন। তাঁহাকে পূর্ণ বলিলেও দোষ, অংশ বলিলেও দোষ। অসীম পদার্থকে সসীম করিলেই তাঁহার অসীমত্বের নাশ হয়। সুতরাং তিনি পূর্ণও নহেন, অংশও নহেন। তেমনি তিনি রূপও নহেন, শব্দও নহেন; কারণ তিনি রূপ ও শব্দের অতীত।

এই প্রকার তিনি সকল পদার্থের বা বিষয়েরই অতীত অথচ সকল পদার্থে বা

বিষয়েই রহিয়াছেন। কিন্তু সকল পদার্থ তাঁহাতে নাই—যেমন তিনি আমাতেরহিয়াছেন, কিন্তু আমি তাঁহাতে নাই অর্থাৎ আমার মন তাঁহাতে নাই। আমার মন যদি সেই পরাশক্তিতে থাকিত, তাহা হইলে আর আমার দেহাভিমান থাকিত না। যখন দেহাভিমান রহিয়াছে, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাঁহাতে আমার লক্ষ্য নাই। কাজে কাজেই সকল বিষয়েই আমার অশান্তি।

ইচ্ছার এই অশান্তির মূল;ইচ্ছার নাশ না হইলে, কখনই অশান্তি দূর হইবে না। ইচ্ছার নাশ হইবে কিরূপে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মন হইতেই ইচ্ছার উৎপত্তি। সেই মন স্থির না হইলে, ইচ্ছার নাশ হইতে পারে না। এখন আমার মন নানা বিষয়ে রত এবং অহং জ্ঞানে মত্ত হইয়া মত্ত হস্তীর ন্যায় শুন্ড বিস্তার পূর্ব্বক ইচ্ছার বশীভূত হইয়া "আমি কর্ত্তা" "আমি জ্ঞানী" "আমি পন্ডিত" "আমি রূপবান্" "আমি গুণবান্" "আমি ধনবান্" "আমি বলবান্" ইত্যাকার নানা প্রকার মদ অহরহঃ পান করিতেছে। কাজে কাজেই মত্ততাও যাইতেছে না। কিন্তু যদি আমি আমার শরীরস্থ সেই মহাশক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতাম, তাহা হইলে আমার মন স্থির হওয়ায় আমার অহং ইত্যাকার জ্ঞান ও দেহভিমানও বিনষ্ট হইয়া যাইত। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অভাবেই তাহা হইতেছে না। ইচ্ছার বশীভূত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে।

হায়, কি পরিতাপের বিষয়! ইচ্ছার নাশ না হইলে যে আমার ভোগের নাশ হইবে না, তাহা আমার জানা নাই!! অথচ আমি সুখলাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, তাহাও জানি না। তাই আমি দুঃখকে সুখ এবং অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেছি। এইরূপ উল্টা রাস্তায় পড়ায় আমার প্রাণ সর্ব্বদাই অস্থির। আমার বুদ্ধি ও ধারণা এমনি বিপরীত হইয়া গিয়াছে যে, যদি কেহ আমায় বুঝাইয়া দেন যে, আমি উল্টা রাস্তায় চলিতেছি ও সেই জন্যই আমার এত কষ্ট হইতেছে এবং সোজা রাস্তায় চলিলে, আমার সকল কষ্ট দূর হইবে—কোন কষ্টই থাকিবে না, তাহা হইলেও আমার সে ভ্রম কিছুতেই নষ্ট হয় না। এরূপ ভ্রমান্ধ হইয়া কল্পিত সুখের প্রত্যাশায় নানা কৌশলে আমি সেই সুখলাভের জন্য সদাই ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু হায় কি দুঃখের বিষয়, আমার প্রকৃত সুখের ধারণাই নাই। আমার সুখের ধারণা—রাজ—অট্টালিকায় বাস করিব, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিব, চতুর্দ্দিকে দাসদাসী ও পরিজনবর্গ বেষ্টন করিয়া আমার সেবা করিবে, রজতমাণিক্যের অপ্রতুল থাকিবে না, স্বর্ণপাত্রে ভোজন করিব, ইত্যাদি। এবংবিধ নানা বিষয় লাভের ইচ্ছায় আমার মন সর্ব্বদাই চঞ্চল ও ব্যাকুল থাকে; সুতরাং আমিও অশান্তিসাগরে মগ্ন হইয়া থাকি।

এখানে এরূপ মনে হইতে পারে যে, ঐ সকল বিষয় যদি আমার না থাকে এবং আমাকে ঐ সকল পাইবার চেষ্টা করিতে হয়, তবে আমার অশান্তি হইতে পারে; কিন্তু আমার যদি ঐ সকল সম্পত্তি থাকে বা অনায়াসলভ্য হয়,তাহা হইলে আর আমার অশান্তি কি ? তখন ত আমার অবিরাম সুখের অবস্থা। বাস্তবিক যদি আমার ধন বা ঐশ্বর্য্য না থাকে, তাহা হইলে, আমার ঐরূপ মনে হওয়া বিচিত্র নহে। কিন্তু উহা যে আমার ভ্রম, তাহার আর সন্দেহ নাই। কেননা, মনের নির্ম্মল আনন্দই যদি সুখ হয়, তাহা হইলে, আমি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী হইলেও আমার সুখ কোথায় ? বোধ হয় তখনও জগতে আমার ন্যায় দুঃখী আর দ্বিতীয় নাই; যেহেতু; এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমি মনে সুখ বা শান্তি পাই না। তবে দেঁতোর হাসি হাসিয়া দিন কাটাই মাত্র। মনকে ভুলাইয়া রাখিবার জন্য আমি কখনও গানে, কখনও নাচে, কখনও বা রসালাপে সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকি; কিন্তু যখন যাহাতে মিশি, কিছুতেই নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে পারি না। বরং মনে সর্ব্বদা বিষয়চিন্তা জাগরূক থাকায় সব সুখেরই অবসান হইয়া যায় মনে হয়,– "এই অতুল ঐশ্বর্য্য আমি কাহাকে দিয়া যাইব, আমার অবর্ত্তমানে ইহা কে ভোগ করিবে, পুত্র হয় ত সব নষ্ট করিয়া আমার নাম পর্য্যন্ত ডুবাইয়া দিবে" ইত্যাদি। রোগ শোক ও চিন্তায় শরীর এবং মন জর্জ্জরিত হওয়ায়, হয় ত আমি জীবদ্দশায় নিজেই ভোগ করিতে অক্ষম হইয়া কেবল যকের মত টাকাগুলি আগলাইয়া থাকি মাত্র। কাহাকেও বিশ্বাস নাই, পাছে কেহ ঠকায় বা ফাঁকি দেয়।

হায়, আসক্তির কি মোহিনী শক্তি!! তাহার কুহকে পড়িয়া শরীর ও মন নানা চিন্তায় জীর্ণ, শীর্ণ ও জর্জ্জরিত হইলেও আমার চৈতন্য হয় না। কেহ ভাল কথা বলিলেও বিরক্ত হই এবং কোন ভাল লোকও নিকটে আসিলে পাছে সে কিছু অর্থ প্রার্থনা করে, সেই ভয়ে ভাল করিয়া সকলের সহিত আলাপ করি না; যাহা কিছু করি, তাহা কেবল যশঃপ্রত্যাশায় বা সম্ভ্রম রক্ষার জন্য।

ধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধেও ঐরূপ। কামনা ব্যতীত ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোন কর্ম্মই করি না। এক খানা চিট্‌কে থালা, সামান্য আতপ তন্ডুল ও একটা কাঁচা কলা উৎসর্গ করিয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ প্রার্থনা করিয়া থাকি। মনে করি, এখানে ত বিষয় হইতে কোন সুখই হইল না, তবে দুই চারি পয়সায় যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে মন্দ কি? বেশী পয়সা খরচ করিতে প্রাণে কষ্ট হইলেও স্বর্গসুখের প্রলোভনে পড়িয়া সময়ে সময়ে ঐরূপে ২/৪ পয়সা ব্যয় করি। মনে করি,স্বর্গসুখ না জানি কেমন। কিন্তু কামনা পরতন্ত্র ব্যক্তির স্বর্গেও যে সুখ নাই, তাহা আমার জানা থাকিলে, বোধ হয় আমি স্বর্গ সুখের কামনাও করিতাম না।

স্বর্গেঽপি দুঃখসম্ভোগঃ পরস্ত্রীদর্শনাদিষু।
তত দুঃখমিদং সর্ব্বং ভবেন্নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।।

শিবসংহিতা, ১ম পটল।

অর্থাৎ স্বর্গেও পরস্ত্রীদর্শনাদিজনিত দুঃখসম্ভোগ হইয়া থাকে। অতএব ভূলোকের ন্যায় স্বর্গেও দুঃখপরম্পরা ভোগ করিতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।

একটু স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সংসার অনন্ত দুঃখময়; সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকে না; ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইতে পারে যে স্বর্গেও সুখ ও শান্তি নাই। মনে করুন একটি পাখী সোনার দাঁড়ে হীরার শিকলে বাঁধা আছে ও আহারাদিও রাজভোগ পাইতেছে এবং আর একটি পাখী লোহার দাঁড়ে লোহার শিকলে বাঁধা আছে ও অতি কষ্টে দিনান্তে দুইটি শুক্না ধান ও একটু জল খাইয়া কোনরূপ জীবনধারণ করিতেছে। এই পাখী দুইটির মধ্যে সুখী কোন্‌টি? অবশ্যই বলিব যে, যে পাখীটি সোনার দাঁড়ে হীরার শিকল পরিয়া রাজভোগ আহার করে, সেইই সুখী এবং অপরটির যখন দিনান্তে অতি কষ্টে আহারীয় জুটিতেছে, তখন তাহার আবার সুখ কোথায়? কিন্তু ইহা কি আমার ঠিক উত্তর হইল? আমি যে ভ্রমে অন্ধ হইয়া প্রকৃত সুখ বুঝি না, ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যায় মাত্র। বাস্তবিক উভয় পাখীর মধ্যে কোনটিই সুখী নহে; কেননা, উভয়েই বাঁধা আছে,—কোনটিই মুক্ত নহে। তবে উভয় বন্ধনের তারতম্য এই—যেমন দেওয়ানী কারাগার (Civil jail) আর ফৌজদারী কারাগার (Criminal jail)। জেলখানার ভোগরূপ দন্ড শেষ হইলে, যেমন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া গৃহস্থলীর কর্ম্ম করিতে হয়, তেমনি স্বর্গ ও নরক এ দুইই ভোগের স্থান এবং ভোগের অবসানে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার কর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হয়। এরূপ কর্ম্মে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আসক্ত হয় না। তবে আমি প্রকৃত সুখ অবগত নহি বলিয়া, আসক্তির সহিত কাম্যকর্ম্ম দ্বারা শিকল পায়ে দিয়া আপনাকে সুখী মনে করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার না এখানে, না স্বর্গে কোথাও নিস্তার আছে।

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্টা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।

এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে।।

গীতা ৯ম অধ্যায়।।

এই জন্য যাঁহারা যোগী, তাঁহারা স্বর্গ ও নরকে (সোনার খাঁচায় উৎকৃষ্ট খাদ্য এবং লোহার খাঁচায় শুষ্ক ধান ভোজন) তুল্য জ্ঞান করিয়া, ঐ উভয়ই ত্যাগ করিয়া থাকেন। কারণ, ভোগসত্ত্বে কখনও শান্তি হইতে পারে না। সুখদুঃখের অতীত অবস্থাতেই শান্তি হয়। সেই শান্তি ইন্দ্রাদি দেবগণেরও বাঞ্ছিত। কেবল যোগীরাই তাহা লাভ করিয়া থাকেন।

হায় আমরা এমন শান্তিসুখে বঞ্চিত হইয়া, ইন্দ্রিয়তৃপ্তির জন্য অমৃতবোধে কি অসার বিষয়বিষ ভক্ষণ করিতেছি!! সেই বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিয়া সর্ব্বদাই অশান্তি ভোগ করিতেছি। এরূপ স্থলে সুখ হইবে কোথা হইতে? অতএব আপাততঃ রমণীয় ও মনোমুগ্ধকর কিন্তু পরিণামে বিষবৎ ও দুঃখকর তাদৃশ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রকৃত শান্তি পথের পথিক হওয়া উচিত নয় কি? তাহা হইলে কর্ম্ম যোগের অনুষ্ঠান আবশ্যক। কর্ম্মযোগ ব্যতীত শান্তিলাভ হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, শাস্ত্রের অনেক স্থলে যখন কর্ম্মযোগ বা জ্ঞানযোগ শ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তখন কর্ম্মযোগের আবশ্যকতা কি? অপরঞ্চ কর্ম্মযোগ বা হঠযোগের অভ্যাসীরা যে সকল উৎকট আসন ও নেতী ধৌতী প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন, তাহা করা দূরে থাকুক, তাহার কথা শুনিলেও ভয় হইয়া থাকে। বাস্তবিকই ঐ সকল কার্য্য অকরণীয় না হইলেও আজকাল অকরণীয় অবস্থায় পরিণত হইয়াছে। সচরাচর উক্ত কার্য্য সকল যে ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, শিক্ষার দোষে তাহা বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে। এই জন্যই সাধারণের ধারণা হইয়াছে যে, হঠযোগের দ্বারা অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট লাভের আশা দুরাশা মাত্র। প্রকৃত গুরুর অভাবে অধুনা হঠযোগের রহস্য অবগত হইতে পারা যায় না। শাস্ত্র দেখিয়া করিতে গেলেই পদে পদে বিপদের আশঙ্কা আছে। শাস্ত্র পাঠে যদি আমার এই ধারণা হয় যে, হঠযোগের দ্বারা দেহের মল পরিষ্কার করিতে না পারিলে, চিত্ত নির্ম্মল হইবে না, এবং আধ্যাত্মিক উন্নতিও হইবে না, তাহা আমার সম্পূর্ণ ভ্রম, কেবল দেহের মল-পরিষ্কারে মনের ময়লা কখনই দূর হয় না। তাহাও না হয় স্বীকার করা যাইত, যদি দেহকে একেবারে মলশূন্য করিতে পারা যাইত।

দেহে রক্ত না থাকিলে যেমন দেহের অস্তিত্ব থাকে না, দেহ মলশূন্য হইলেও তদ্রূপ তাহার অস্তিত্ব থাকে না। এই জন্য বৈদ্যশাস্ত্রেও উল্লেখ আছে— "মলভাণ্ডং ন চালয়েৎ" অর্থাৎ মলভাণ্ড চালনা করিবে না। অতএব প্রকৃত ধৌতী কাহাকে বলে, তাহা

না জানিয়া ধৌতিক্রিয়া দ্বারা দেহের মল ধৌত করিতে গেলে, যথেষ্ট বিপদের আশঙ্কা আছে।

মনে করুন, আমি যদি নিত্য জোলাপ গ্রহণ করি, তাহা হইলেও ত আমার দেহের মল পরিষ্কার হইতে পারে। তবে আমার ধৌতীর আবশ্যকতা কি? নিত্য নিত্য জোলাপ লওয়াও যেমন অস্বাস্থ্যকর, নিত্য ধৌতিক্রিয়াও তদ্রূপ। জোলাপ বা ধৌতিক্রিয়া দ্বারা মলনির্গমন করাও এক রকম ব্যাধিবিশেষ। এই জন্য যাঁহারা নিত্য ধৌতিক্রিয়ার অভ্যাস করেন, তাঁহাদের পরিপাক শক্তির ক্রমশঃ হ্রাস হওয়ায় অবশেষে উহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি, অৰ্দ্ধ ছটাক চালের পায়েস পরিপাক করিবারও শক্তি থাকে না। সুতরাং মৃত্যু ক্রমশঃ নিকট হইয়া আইসে। ইহাতে "লাভঃ পরং গোবধঃ" হয় মাত্র, কেননা, না ঐহিক না পারলৌকিক কোন দিকেরই সুখ হয় না। দুই দিকই অন্ধকার। মল পরিষ্কারের সঙ্গে উভয় দিকের সুখস্বচ্ছন্দতা শেষ হওয়ায় মন ঘোর অশান্তিসাগরে নিমগ্ন হয়।

শাস্ত্রে যে ধৌতীর উল্লেখ আছে, তাহা এরূপ বাহ্য ধৌতী নহে। বাহ্য ধৌতীক্রিয়ার দ্বারা মন কখনই নির্ম্মল হয় না। মন নির্ম্মল করিতে হইলে, অন্তর্ধৌতক্রিয়ার আবশ্যক। উহা প্রাণায়াম সাপেক্ষ এবং প্রাণায়াম সদ্‌গুরুপদেশগম্য। উপস্থিত কালে আমাদের দেশে যেরূপ প্রাণায়াম চলিত আছে, তাহা প্রকৃত প্রাণায়াম নহে। কেননা, তাহাতে কুম্ভক অর্থাৎ জোর করিয়া বায়ুরোধ করিতে হয়। স্বভাবের গতিরোধ করায় এ প্রকার প্রাণায়ামে দেহ ব্যাধিমন্দির হইবার আশঙ্কা আছে।

বালবুদ্ধিভিরঙ্গুলাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নাসিকাচ্ছিদ্রমবরুধ্য যঃ প্রাণায়ামঃ ক্রিয়তে স খলু শিষ্টৈস্ত্যাজ্যঃ। —ইতি ঋগ্‌বেদভাষ্য।

অর্থাৎ অল্পবুদ্ধি লোকে যে অঙ্গুষ্ঠ এবং অঙ্গুলি দ্বারা নাসাচ্ছিদ্র রোধ করিয়া প্রাণায়াম করিয়া থাকে, তাহা সাধুগণের পরিত্যাজ্য।

ভাগ্য বলে সদ্‌গুরু লাভ হইলে জানা যায় যে, প্রকৃত প্রাণায়ামে বায়ুরোধ করিতে হয় না। হঠযোগ শব্দের অর্থেও ঐরূপ প্রাণায়ামই বুঝায়। হঠযোগের অর্থ বাহ্য নেতী ধৌতী প্রভৃতি ক্রিয়া নহে।

হকারঃ কীর্ত্তিতঃ সূর্য্যষ্ঠকারশ্চন্দ্র উচ্যতে।
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্যোগাদ্ধঠযোগা নিগদ্যতে।।

গোরক্ষনাথকৃত সিদ্ধ সিদ্ধান্তপদ্ধতি।

হশ্চ, ঠশ্চ তৌ হঠৌ সূর্য্যচন্দ্রৌ তয়োর্যোগো হঠযোগঃ, এতেন হঠশব্দবাচ্যয়োঃ সূর্য্যচন্দ্রাখ্যয়োঃ প্রাণাপানয়োরৈক্যলক্ষণঃ প্রাণায়ামো হঠযোগ

ইতি হঠযোগলক্ষণং সিদ্ধম্।

ব্রহ্মানন্দকৃত হঠযোগপ্রদীপিকা ভাষ্য।

হ শব্দের অর্থ সূর্য্য, ঠ শব্দের অর্থ চন্দ্র এবং যোগ শব্দের অর্থ মিলন। এই চন্দ্র ও সূর্য্যের মিলম করার নামই হঠযোগ অর্থাৎ প্রাণায়াম। দক্ষিণ নাসিকায় (পিঙ্গলায়) যে বায়ু বহে, তাহাই সূর্য্য এবং বাম নাসিকায় (ইড়ায়) যে বায়ু বহে, তাহাই চন্দ্র। এই উভয়ের যখন মিলন হয় অর্থাৎ যখন বাম ও দক্ষিণ নাসিকা দিয়া বায়ুর গতি থাকে না, তখন বায়ু বিনা অবরোধে স্বতঃ স্থির থাকে এবং তখনই চন্দ্রসূর্য্যের যোগ অর্থাৎ মিলন হয়। যদ্দ্বারা এইরূপ মিলন হয়, তাহাই হঠযোগ বা কর্ম্মযোগ। ঐ স্থিরের উপর মন রাখার নামই রাজযোগ বা সাংখ্যযোগ। সুতরাং কর্ম্মযোগেও যে গতি, সাংখ্যযোগেও সেই গতি অর্থাৎ উভয়েরই স্থিতি এক। ইহা শাস্ত্রপাঠজনিত জ্ঞানদ্বারা কখনই লাভ হইবে না। কর্ম্মযোগের অভ্যাস ব্যতীত ইহা লাভ হইতেই পারে না। সকলেই এই কর্ম্মযোগের অভ্যাস করিতে সমর্থ এবং সকলেই ইহার দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

যুবা বৃদ্ধোঽতিবৃদ্ধো বা ব্যাধিতো দুর্ব্বলোঽপিবা।
অভ্যাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি সর্ব্বযোগেষ্বতন্দ্রিতঃ।।
ক্রিয়াযুক্তস্য সিদ্ধিঃ স্যাদক্রিয়স্য কথং ভবেৎ।
ন শাস্ত্রপাঠমাত্রেণ যোগসিদ্ধিঃ প্রজায়তে।।
ন বেশধারণং সিদ্ধেঃ কারণং ন চ তৎকথা।
ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতন্ন সংশয়ঃ।।

হঠ যোগপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ যুবা, বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ, ব্যাধিগ্রস্ত, অথবা দুর্ব্বল—ইহারাও অনলস হইয়া যোগাভ্যাস করিলে, যোগসিদ্ধি লাভ করে।

যোগসাধন করিলেই সিদ্ধিলাভ হয়, যোগানুষ্ঠানবিরত ব্যক্তির সিদ্ধি কিরূপে হইতে পারে? কেবল শাস্ত্রপাঠেসিদ্ধি হয় না; বেশধারণ বা শাস্ত্রীয় কথা সিদ্ধির কারণ নহে। ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, ইহা সত্য এবং ইহাতে সংশয় নাই। অতএব "কর্ম্মযোগ নিকৃষ্ট, রাজযোগ বা সাংখ্যযোগ উৎকৃষ্ট" একথা কোন কাজেরই নহে; ইহা কেবল কথার কথা মাত্র। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা এই উভয়কেই তুল্য অর্থাৎ উভয়েরই গতি সমান বলিয়া থাকেন ঃ—

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্‌বালাঃ প্রবদন্তি ন পন্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্।।
যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।

একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি।।

গীতা।

বাস্তবিক কর্ম্মযোগের অভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই জ্ঞান হয় না। জ্ঞান ব্যতীত কিছুরই মীমাংসা হয় না। এই জন্যই সেই প্রকৃত জ্ঞানের অভাবে আজ দেশের এই দুরবস্থা দেখা যায়। চতুর্দ্দিকেই অমঙ্গল, চতুর্দ্দিকেই ধর্ম্মবিভ্রাট্, যাঁহার যাহা মনে আসিতেছে, তিনি তাহাই বলিতেছেন; এক পক্ষ অপর পক্ষের মত খন্ডন করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। সাকারবাদী নিরাকারবাদীর ও নিরাকারবাদী সাকারবাদীর মত খন্ডন করিতেছেন। দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীকে পরাস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন,আবার অদ্বৈতবাদী দ্বৈতবাদীর মত খন্ডন করিবার চেষ্টা করিতেছেন। সকলেই নিজ নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য শাস্ত্র হইতে বচন উদ্ধৃত করিতেছেন। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, ইহার দ্বারা যে নিজের ও অপরের অনিষ্ট হইতেছে, তাহা বুঝিতেছেন না। কেননা, সকলেই যখন শাস্ত্র হইতে প্রমাণ দিতেছেন, তখন শাস্ত্রের কোন্ কথাটি ঠিক বলিয়া মানিব? শাস্ত্রীয় একটি মত ও এখন করিলেই শাস্ত্র ভ্রান্ত হইল। কারণ, যে মতটি খন্ডন করা হইল, তাহা কি আপ্তবাক্য নয়? তাহা যদি আপ্তবাক্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে সাকার নিরাকার, বা দ্বৈত অদ্বৈতবাদ সকলে ত আপ্তের দ্বারাই উক্ত হইয়াছে। এরূপ স্থলে যদি কোন একটি বাদ ভ্রান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আপ্তবাক্যে আর কাহারও বিশ্বাস থাকিবে না। কিন্তু আমি পান্ডিত্যাভিমানের দোষে আপ্তবাক্য খন্ডন করিয়া, নিজের পান্ডিত্য প্রকাশ করিয়া থাকি। আমি নিজেই যে ভ্রান্ত, তাহা আমি জানি না। তাহা জানিলে, আর কোন মতে আপ্তবাক্যের খন্ডন করিতে যাইতাম না। অতএব কেবল শাস্ত্রপাঠ করিয়া সেই পরাশক্তির সম্বন্ধে বাদানুবাদ করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

সাকারবাদী ও নিরাকারবাদী উভয়েই যেমন ভ্রান্ত, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদীও তদ্রূপ। কিন্তু আপ্তবাক্য অভ্রান্ত। তবে যে আপ্তবাক্য ভ্রান্ত বলিয়া বোধ হয়, তাহার কারণ এই যে, আমি নিজেই ভ্রান্ত। তাহা না হইলে পরস্পরে বাদানুবাদ করিয়া আত্মবিচ্ছেদ করিতাম না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমি এমনই ভ্রমান্ধ হইয়াছি যে যাঁহাকে বাদের মধ্যে আনিতেছি,তিনি স্বয়ং যে বাদাতীত অর্থাৎ কোন বাদের মধ্যেই নহেন, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি না। আমি যখন বাদাতীত বস্তুকে বাদের মধ্যে আনিতেছি, তখন আমার শাস্ত্রজ্ঞান বা সাধুতা কোথায়? আমার যদি সেই পরাশক্তির প্রকৃত জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে আর তাঁহাকে বাদের মধ্যে আনিতাম না। বাদের মধ্যে পড়িয়া নিজেই ত কষ্ট পাইতেছি, আবার তাঁহাকে লইয়া টানাটানি করি কেন? ইহা কি আমার ভ্রম নহে?

অতএব যাঁহারা দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদ লইয়া ঝগড়া বা দলাদলি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দলাদলি ছাড়িয়া যাহাতে যথার্থ কাজ হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। দলাদলিতে দেশ উচ্ছন্নে যাইতে বসিয়াছে। এখন আমাদের ঝগড়া করিবার সময় নহে। আরও কথা এই যে, দ্বৈত ও অদ্বৈত সম্বন্ধে আমার যে জ্ঞান আছে, তাহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। উহা আনুমানিক জ্ঞান মাত্র। আনুমানিক জ্ঞান সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। এরূপ স্থলে আনুমানিক জ্ঞান লইয়া পরস্পরে বিরোধ ও বাগ্‌বিতন্ডা করা আমার উচিত নহে; বরং যাহাতে সকল বাদের মীমাংসা হয়, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই মীমাংসার চেষ্টা করে কে? চেষ্টা করিতে গেলেই আমাকে ছোট হইতে হইবে; কিন্তু ছোট হওয়া আমার পক্ষে বড় কঠিন; কেননা, আমি লোকের কাছে জ্ঞানী ও পন্ডিত বলিয়া বিখ্যাত। সুতরাং আমার দ্বারা মীমাংসার আশা দুরাশা মাত্র; যেহেতু একপক্ষ নিরস্ত না হইলে মীমাংসা হইতে পারে না; অথচ নিরস্ত হইলে লোকের কাছে আমার মান যাইবে বলিয়া নিরস্তও হইতে পারি না। সুতরাং একটা না একটা বাদ অবলম্বন করিয়া, তাহা সমর্থন করিবার জন্য নানারূপ শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি—যখন যাহা পাই তাহাই প্রয়োগ করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, দ্বৈত বা অদ্বৈত সম্বন্ধে আমি নিজে কিছুই বুঝি না। আচ্ছা দেখা যাউক দ্বৈত ও অদ্বৈত বাদ কাহাকে বলে।

প্রথমে দ্বৈতবাদেরই আলোচনা করা যাউক। দ্বৈতবাদের মধ্যে অনেক সম্প্রদায় আছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বলেন, পরমাত্মা জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। পরমাত্মা জীবাত্মার পাপপুণ্যের বিচার করিয়া, যাহার যাহা প্রাপ্য, তাহাকে তাহা দিয়া থাকেন। ইঁহারা মুখে জাতিভেদ বা পরমাত্মার সাকার রূপ স্বীকার করেন না; কিন্তু কার্য্যে সবই করিয়া থাকেন। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতেই ইহা বিস্তৃতরূপে বুঝান হইয়াছে। এখানে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। নিরাকারের উপাসনা নাই, উপাসনা করিতে গেলেই সাকার আসিয়া পড়ে। সুতরাং আমার নিরাকার বলা কেবল মুখের কথা,— কাজের কথা নহে। জাতিভেদ স্বীকার করি না, একথা বলাও আমার ভ্রম, কেননা আহারাদি ভিন্ন আমার অন্যান্য প্রায় সকল কার্য্যেই জাতিভেদ প্রকাশ হইয়া পড়ে। জাতি সম্বন্ধে যদি আমার অভেদ জ্ঞানই থাকিত, তাহা হইলে দলাদলি থাকিত না। আরও কথা এই যে, যখন আমার গোজাতি, পশুজাতি, স্ত্রীজাতি, পুংজাতি ইত্যাদি জ্ঞান রহিয়াছে, তখন জাতি সম্বন্ধে আমার অভেদ জ্ঞান কোথায়? সর্ব্বত্রই জাতিগত প্রভেদ দেখিতেছি। তবে যে জাতিভেদ স্বীকার করি না, তাহা কেবল নিজের সুবিধার জন্য। আমার নিজের সুখের কোন ব্যাঘাত হইলেই জাতিভেদ বাহির হইয়া পড়ে। যখন আমার "আমি" "আমার" বোধ রহিয়াছে তখন অভেদ ভাব হইতেই

পারে না। তবে যে অভেদ বলিয়া থাকি, তাহা কেবল লোক ভুলাইবার বা দলপুষ্টির জন্য; নতুবা মনে আমার অভেদ ভাব নাই। জাতিভেদ এইরূপে অস্বীকার করায় দেশের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট কিছুতেই হইতেছে না। ইহাতে দেশের নরনারীগণ ব্যভিচারগ্রস্ত হওয়া, কালে দেশ অশান্তির আবাসস্থল হইয়া উঠিবে। অতএব এইরূপ জাতিভেদ অস্বীকার করা অপেক্ষা জাতিভেদ স্বীকার করা বরং শ্রেয়ঃ। জাতিভেদ প্রথা যাহা, চলিয়া আসিতেছে, তাহা উঠিয়া গেলে, দেশের অমঙ্গল ব্যতীত মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। তবে ধর্ম্মগত প্রভেদ হওয়া উচিত নহে। ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ হইলে দেশের উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এক্ষণে জাতিভেদ প্রথা রহিত করা উচিত, কিংবা উহা রাখা উচিত, তাহাই দেখা যাউক। জাতি কি এবং জাতি কাহার আর ভেদই বা কাহার ? প্রথমতঃ দেখা চাই যে, অভেদ জ্ঞান করা উচিত, কি ভেদ জ্ঞান করা উচিত। বাস্তবিক আমাদের যখন সর্ব্বত্র অভেদজ্ঞান হইতেছে না, তখন জাতিভেদ অস্বীকার করা উচিত নহে। পশু নানাজাতীয় হইলেও যেমন তাহাদের দুগ্ধ এক রঙেরই দেখা যায়, তদ্রূপ ত আমি দুগ্ধের ন্যায় একবর্ণ দেখিতেছি না অর্থাৎ যখন আমার সর্ব্বত্রই ও সকল পদার্থেই ভেদজ্ঞান হইতেছে, তখন আমার অভেদ জ্ঞান কোথায় ? ভেদজ্ঞান থাকিতে জাতিভেদ অস্বীকার করা মিথ্যাচার মাত্র। মুখে জাতিগত অভেদজ্ঞানের কথা বলিতেছি, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার বিপরীত আচরণ করিতেছি। আরও কথা এই, মিথ্যাচাররূপ অভেদজ্ঞান দেশে প্রচলিত হইলে, দেশের শিল্পাদি সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণপুত্র হইতে সকল জাতিরই গুণ ও কর্ম্মগত প্রভেদ থাকা উচিত । কেবল মাত্র ব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনিই অভেদজ্ঞানে চাতুর্ব্বর্ণে বিবাহ ভোজন ইত্যাদি করিতে পারেন; কারণ, তাঁহার সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছে। ঋষিরাও তাহা করিতেন। তদ্ব্যতীত ব্যক্তিমাত্রেরই বাহ্যজগতের গুণগত জাতিভেদ মানিয়া চলা উচিত; কারণ, বাহ্য জগতের গুণগত কর্ম্ম করিতে করিতে, ক্রমশঃ অর্ন্তজগতের কর্ম্মে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। এইরূপে ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ইহারা বাহ্যজগতের নিজ নিজ গুণগত কর্ম্ম করিয়া, অর্ন্তজগতে প্রবেশ করিবেন। ক্ষত্রিয়ের বাহ্যজগতের কার্য্য যুদ্ধাদি দ্বারা রাজ্যরক্ষা। বৈশ্যের কৃষি গোরক্ষা ও বাণিজ্য। শূদ্রের কর্ম্ম উপর্য্যুক্ত তিন বর্ণের সেবা ও জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী শিল্পাদি অন্যান্য কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্ম বংশগত না হইলে, এই সকল কর্ম্মের উন্নতির আশা করা যাইতে পারে না। যিনি ক্ষত্রিয়,তিনি বাহ্য কর্ম্ম করিতে করিতে গুরুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, যখন অর্ন্তজগতে প্রবেশ করিবেন, তখন তিনি স্বশরীরস্থ ইন্দ্রিয়গণকে দমন করিয়া, মনোরাজ্যের উচ্ছেদ পূর্ব্বক আত্মরাজ্য স্থাপন

করিবেন। তদ্রূপ যিনি বৈশ্য, তিনিও বাহ্য জগতের কৃষিবিদ্যাদি করিতে করিতে গুরুপদেশ যখন অর্ন্তজগতে প্রবেশ করিবেন, তখন তিনি শরীররূপ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া,আত্মজ্ঞানরূপ ফললাভের জন্য গোরক্ষা (অর্থাৎ গুরুপদেশে জিহ্বাকে যথাস্থানে রাখা) ও বাণিজ্য অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত (মোক্ষের ইচ্ছার সহিত) কর্ম্ম করিবেন। যিনি শূদ্র তিনি গুরুপদেশপ্রাপ্তি ও তদ্দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভের জন্য এই তিনের সেবা করিবেন এবং জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার বংশগত শিল্পাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। অর্থাৎ যাঁহার বংশগত যে কর্ম্ম, তিনি তাহা করিবেন *।

এই রূপ ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে সকলেই কর্ম্মের দ্বারা ক্রমশঃ ব্রহ্মমার্গে গমন করিয়া, ব্রহ্মে লীন হইবেন অর্থাৎ যিনি শূদ্র, তিনি গুরুপদিষ্ট কর্ম্মের দ্বারা শূদ্র হইতে বৈশ্যভাবাপন্ন এবং বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইয়া, অবশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিবেন, এবং যিনি ক্ষত্রিয়, তিনিও গুরুপদেশ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণপুত্র হইতে সকলেই জন্মমাত্রে শূদ্র এবং সকলেই সদ্‌গুরুলাভ করিয়া সাধন দ্বারা ঐরূপে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া ব্রাহ্মণ হইবে। তবে পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতি অনুসারে কাহারও শীঘ্র এবং কাহারও বিলম্বে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় এই মাত্র প্রভেদ। #

এ স্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যিনি শূদ্র, তিনি গুরুপদেশে অর্ন্তজগৎ সম্বন্ধে উন্নতি লাভ করিয়া বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হইলেও অথবা ব্রাহ্মণত্ব পর্য্যন্ত লাভ করিলেও তিনি যে প্রকৃতিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তিনি সেই প্রকৃতির অনুযায়ী কর্ম্ম করিয়া চলিবেন। তদ্রূপ বৈশ্য ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণপুত্রও অর্ন্তজগতের উন্নতি সাধন করিলেও বাহ্য জগৎ সম্বন্ধে তাঁহারা স্ব প্রকৃতির অনুরূপ কর্ম্ম করিবেন। মহাত্মা কবির সাহেব ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াও তন্তুবায়ের গৃহে জন্মগ্রহণহেতু অথবা প্রতিপালিত হওয়ায় স্বীয় বংশোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করেন নাই। অন্যান্য মহাত্মাও তদ্রূপ।

উপরে বলা হইয়াছে যে, কেহ কেহ বলেন, পরমাত্মা জীবাত্মার পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন–ইহা বলাও দোষ। কেননা তাহা হইলে তাঁহাতে পক্ষপাতিতা দোষের আরোপ করা হয় মাত্র; আর কিছুই নহে। পূর্ব্বেও এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুক্তি অনাবশ্যক। অতএব দ্বৈতবাদের বিষয় যাহা কিছু বলি, তাহা আমার ভ্রম। এক মূলভিত্তির অভাবে আমার কোন কথারই দৃঢ়তা নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায়েরাও দ্বৈতবাদী। ইঁহারা পরমাত্মার স্বরূপত্ব লাভ স্বীকার করেন

---

* শ্রীমদ্ ভগবদগীতার ১৮শ অঃ ৪৫শ শ্লোক দেখ।

শ্রীমদ্ ভগবদগীতার ১৮শ অঃ ৩১শ শ্লোক দেখ।

না; ইহারা বলিয়া থাকেন, ''তিনি প্রভু, আমি দাস; চিনি হওয়া অপেক্ষা যেমন চিনি খাওয়া ভাল, তেমনি দাসভাবে তাঁহার উপাসনা অপেক্ষা আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে''। ইহারা জ্ঞানকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া, ভক্তিমার্গকে যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন, তাহা নিতান্তই ভ্রম! ''চিনি হওয়া অপেক্ষা খাওয়া ভাল'' এই যে যুক্তি , ইহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কেননা. ''চিনি খাওয়া ভাল'' এই কথা চিনি খাইয়া বলিলেও না হয় স্বীকার করিতে পারা যাইত। কেবল 'চিনি' 'চিনি' শব্দ করিলে কি আমার মুখ মিষ্ট হইবে বা আমি মিষ্টরস অনুভব করিব? তাহা নিতান্ত অসম্ভব। কেননা, তাহা হইলে, 'ভোজন' 'ভোজন' এই শব্দ দ্বারাও ত ভোজনের কার্য্য সমাধা হইতে পারে। আমি মায়ার বশীভূত হইয়া ভোগলালসা চরিতার্থ করিবার জন্যই বলিয়া থাকি ''চিনি খাওয়া ভাল''। চিনি খাওয়াটা কি সুখভোগের অবস্থা নহে? সুখের অস্তিত্ব থাকিলেই দুঃখ অবশ্যম্ভাবী; কারণ সুখের অবসানে দুঃখ এবং দুঃখের অবসানে সুখ আছেই আছে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম এবং স্থির সিদ্ধান্ত। এই জন্যই যোগীরা সুখ দুঃখ এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। এই উভয়ের স্বতঃ পরিত্যাগের অবস্থাই চিনি খাওয়া। ইহা মুখে বলিলে হইবে না; কর্ম্মের দ্বারা কার্য্যে পরিণত করা চাই; নচেৎ ''চিনি হওয়া অপেক্ষা চিনি খাওয়া ভাল''—এই কথা কেবল মুখ বলা আমার ন্যায় বাতুলের উক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সুতরাং উহা বস্তুতঃ কোন কাজের কথাই নহে।

ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানকে নিকৃষ্ট মনে করাও আমার বাতুলতা। আমার জ্ঞান নাই বলিয়াই আমি বলিয়া থাকি যে, জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভক্তি কাহাকে বলে, আদৌ তাহারই আমার জ্ঞান নাই। ভক্তির চিহ্ন ধারণ করার নামই কি ভক্তি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে ত আজকাল ভক্ত বা ভক্তির ছড়াছড়ি!! হায় কি ভ্রমেই আমি পড়িয়াছি!!! ভক্তির চিহ্ন (ভেক) ধারণ করিলে, অথবা 'ভাব' লাগিয়াছে বলিয়া টিপ্ টিপ্ আছাড় খাইয়া পড়িলে ভক্ত হয় না। ভাবের উদয়ে কখনও পতন হয় না। অভাবের উদয়েই পতন। ভাবে যদি পতন হয়, তবে অভাবে কি উত্থান হইবে? মায়িক জীবের সবই উল্টা, —ধর্ম্মকে অধর্ম্ম বোধ, সত্যকে অসত্য জ্ঞান এবং জ্ঞানকে অজ্ঞান বলিয়া তাচ্ছিল্য!! ইহা কেবল জ্ঞানহীন মায়িক জীবেই সম্ভবে। নতুবা জ্ঞানকে নিকৃষ্ট বলিব কেন?

এক্ষণে দেখা যাউক, জ্ঞান ব্যতীতভক্তি হইতে পারে কিনা। প্রথমতঃ আমি কাহাকে ভক্তি করিব? এই কথার উত্তরে যদি বলা যায় যে, আমি নামে ভক্তি করিব এবং নাম ও নামী অভেদ জ্ঞান করিয়া দাস ভাবে ভক্তি বা সেবা করিব; তাহা হইলে ইহাতে তিনটি প্রশ্ন আসিতে পারে, প্রথম,—নাম কাহার? দ্বিতীয়—নাম করে কে? তৃতীয়—নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান কিরূপ?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে না হয় বলিলাম, আমি হরিনাম, শ্রীরাধাকৃষ্ণ নাম সর্ব্বদা জপ ও সেই নাম সংকীর্ত্তন করিব; ইহাতেই আমার বৈকুণ্ঠধাম বা গোলকধাম প্রাপ্তি হইবে এবং তথায় বৈকুণ্ঠনাথের সেবা করিয়া, আপনাকে চরিতার্থ মনে করিব। বাস্তবিক ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিলে, নিতান্ত মন্দ নহে, তবে কার্য্যে পরিণত করা যায় কি না এবং আমরা যে ভাবে নাম জপ করি, তাহা সাত্ত্বিক কর্ম্ম কি না, ইহাই বিচার্য্য।

নাম জপ করিতে গেলে, প্রথমতঃ আমার জানা উচিত যে, আমি কাহার নাম জপ করিতেছি। যদি তাহা আমার জানা না থাকে, তাহা হইলে আমার সবই বৃথা; কারণ তদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাবে আমার অনন্যভক্তি হইতে পারে না। "হরি" এই শব্দ যাহা মুখে বলা যায়, তাহাই কি হরি? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে আমার হরি ভক্তি সম্বন্ধে ভক্তি হওয়া অসম্ভব। কেননা, জল এই শব্দটি কি জল? যদি তাহাই হয়, তবে উহা মুখে উচ্চারণ করিলে পিপাসা দূর বা মুখ জলপূর্ণ হউক। তাহা যখন হয় না, তখন জল এইশব্দটিকে জল বলা আমার নিতান্ত ভ্রম। জল বলিতে গেলে যেমন জল এই শব্দটিকে না বুঝাইয়া জলবাচক বিষয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা পিপাসা-নিবৃত্তি হয়, সেই বস্তুকে বুঝায় এবং উহা যখনই পান করিব, তখনই আমার পিপাসার শান্তি হইবে, নচেৎ নহে। হরি বা শ্রীকৃষ্ণ এই নাম বলিলেই এক অনির্ব্বচনীয় অব্যক্ত মহাশক্তিকেবুঝায়। জল জল শব্দ করিলে যেমন পিপাসা দূর না হইয়া মুখ আরও শুষ্ক হইয়া যায়, তদ্রূপ হরিনাম বা কৃষ্ণনাম মুখে চীৎকার করিয়া বলিলেও মুখে ফেকো পড়িয়া মুখ রসশূন্য হয়। কিন্তু যদি কর্ম্মের দ্বারা আমার হরি বা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞান হইত, তাহা হইলে আর আমার মুখে ফেকো পড়িত না; বরং মুখ আনন্দ রসে পরিপূর্ণ হওয়ায় ক্ষুৎ পিপাসা তিরোহিত হইত। আমি মুখে হরি হরি করিতেছি, কিন্তু হরি কি তাহা বুঝি না। তবে যে ডাকি তাহার কারণ এই যে, লোকের কাছে শুনিয়াছি যে, তাঁহাকে ডাকিলে আমার ভাল হইবে অথবা স্বর্গসুখ লাভ হইবে; তাই সেই ভাল'র আশায়—স্বর্গসুখের আশায় তাঁহাকে ডাকি মাত্র, অথচ এত ডাকিতেছি কাহারও সাড়া পাই না। কিন্তু যদি শুনিতাম যে তিনি কাহারও ভাল করেন না, তাহা হইলে বোধ হয়, কখনই তাঁহাকে ডাকিতাম না। আর যাহাও ডাকিতেছি, তাহাও ডাকা হইতেছে না। কেননা ডাকিবে কে? মুখে আমি হরি হরি শব্দ করিতেছি, কিন্তু আমার মন বিষয়ে রমণ করিতেছে। আমি স্থলে সাঁতার শিখিয়া জলে নামিয়াছি, সুতরাং সাঁতাররূপ জ্ঞানের অভাবে ডুবিয়া যাওয়া ব্যতীতআর কি আশা করা যাইতে পারে? মনের স্থিরতা বা ইন্দ্রিয়সংযমের অভাবে আমার সকল কার্য্যই পণ্ড হইতেছে। নাম যে করিবে, সে আমার নহে; —আমি তাহার দাস বলিলেও চলে। আমার হাতে মালা ফিরিতেছে ও মুখে নাম হইতেছে বটে, কিন্তু যে আমার উপস্থিত প্রভু

অর্থাৎ মন, সে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে গমন করিতেছে। সুতরাং আমি হরিতেও আসক্ত নহি, মালাতেও আসক্ত নহি,—আসক্ত কেবল ইন্দ্রিয়জনিত বিষয়সুখ।

আমি লোকের কাছে সাধু বৈরাগী বা ভক্ত সাজিয়াছি বটে, কিন্তু আমার নিজের কাছে আমি ইন্দ্রিয়ের দাস বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে যে আমি জ্ঞান অপেক্ষা ভক্তিকে শ্রেষ্ঠ বলি, তাহা কেবল লোক ভুলাইবার জন্য বা দলপুষ্টির অভিপ্রায়ে। হরিনাম বা কৃষ্ণনাম পক্ষীর ন্যায় কেবল মুখে আওড়াইলে হইবে না। পক্ষী যেমন সারাদিন হরিনাম বা রাধাকৃষ্ণ নাম করিয়া থাকে, অথচ বিড়ালে ধরিলে তাহার আর সেই হরিনাম বা রাধাকৃষ্ণ নাম বাহির না হইয়া, তাহার জাতীয় বুলি ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ বাহির হয় এবং ট্যাঁ ট্যাঁ করিতে করিতে সে দেহত্যাগ করে, তদ্রূপ এই প্রকারে নাম করায় আমাদেরও পক্ষীর ন্যায় গতি হইবে, অর্থাৎ যখন বিড়ালরূপী কাল আসিয়া আমাদের গলা টিপিয়া ধরিবে, তখন আর আমাদের মুখ হইতে হরি নাম বাহির হইবে না।

এস্থলে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, এ আবার কি কথা ? মৃত্যুকালে অনেককেই ত ইষ্টমন্ত্র-জপ করিতে দেখা যায় ? তাহা যায় বটে, কিন্তু যতক্ষণ কণ্ঠশ্বাস না হয় ততক্ষণই সব হয়। করের অভ্যাস বশতঃ উহা যতক্ষণ অসাড় না হয়, ততক্ষণই ফিরিতে থাকে। জিহ্বা ওষ্ঠও তদ্রূপ। এইরূপ যখন সকল অঙ্গ অবশ হইয়া যায় এবং একমাত্র মন ও প্রাণ অবস্থিতি করে, তখন আমার এই নাম হয় না। কেননা আমি পূর্ব্বে প্রাণের দ্বারা মনের প্রতি লক্ষ্য রাখি নাই। যদি রাখিতাম তাহা হইলে, এই আসন্নকালে তাহারা আমায় সাহায্য করিত অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ে আমার মন থাকিত। মন চিরকাল বিষয়ে রমণ করিয়াছে, আমি মুখে নাম করিয়াছি মাত্র—মুখ নিস্পন্দ হওয়ায় মন পূর্ব্বে যাহা করিত, এখনও সেই বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিল। সুতরাং গতিও তদ্রূপ হইল। এই জন্যই রাজা ভরত হরিণশিশু চিন্তা করিয়া হরিণ যোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কেবল মুখে শব্দমাত্র জপ করিলে কিছুই হয় না। তুলসী দাসের রামায়ণেও উক্ত আছে ঃ—

নাম জিহ জপি জাগহিঁ যোগী।

অর্থাৎ ভগবানের নামটি যোগীরাই জিহ্বার দ্বারা করিয়া থাকেন। ইহার তাৎপর্য্য তুলসীদাসের দোঁহাতে প্রকাশ যথা—

রাম নাম মণিদীপ ধরু, জিহ ডেহরি দ্বার।
তুলসী বাহুর ভিতরো, যো চাহসি উজিয়ার।

অর্থাৎ যদি বাহিরে ও ভিতরে রামের প্রকাশ চাও। তবে জিহ্বারূপ দেরকোর (পিলসুজের) উপরে রামনামরূপ মণি (শ্রেষ্ঠ) দীপকে রাখ অর্থাৎ জিহ্বাকে ত্রিকূটে রাখ;

তাহা হইলেই ভিতরে ও বাহিরে রামের প্রকাশ হইবে।

ইহাতে যদি বলা হয়, যে আমরা ত আর কেবল শব্দমাত্র জপ করি না; শব্দের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি ও রূপ দর্শন করি এবং সেই মূর্ত্তি ও রূপের উপর ভক্তি করিয়া থাকি; সুতরাং শেষ সময়ে সেই মূর্ত্তি বা রূপ দর্শন করিতে করিতে দেহত্যাগ করিব। ইহাও নিতান্ত অসম্ভব; কেননা, রূপ দর্শন করে কে? চক্ষু কি দর্শন করে? পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, চক্ষু দর্শনের দ্বারস্বরূপ; চক্ষুর সহিত মনের সংযোগ না হইলে দর্শনকার্য্য হয় না। দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বার সেই চক্ষু যখন অবশ হইয়া যাইবে, তখন আর আমার দর্শন হইবে না। কিন্তু যদি আমি প্রাণের দ্বারা মনের কার্য্য করিতাম ও মনকে নিজবশে রাখিতাম, তাহা হইলে, এই অন্তিম অবস্থায় সকল ইন্দ্রিয় অবশ হইলেও এক মনের দ্বারা দর্শন শ্রবণাদি সমস্ত কার্য্য সমাধা হওয়ায় পরা গতি প্রাপ্ত হইতে পারিতাম। অন্তিম কালে মন যখন অসহ্য মৃত্যুযন্ত্রণায় অভিভূত হয়, তখন কানের কাছে আসিয়া "অন্তে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল" এই কথাগুলি শুনাইলেও মন তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। আমরা সামান্য পীড়াদির যন্ত্রণায় এতই অধীর হইয়া পড়ি যে, তখন আমাদের আর কিছুই ভাল লাগে না। অতএব মৃত্যু যন্ত্রণা উপস্থিত হইলে, আমাদের মনের যে কি ভাব হয়, তাহা চিন্তাশীল পাঠক মাত্রেই বুঝিলেও কতকটা বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু যিনি প্রাণের সাধনা দ্বারা স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার মন সকল অবস্থাতেই ভগবানে যুক্ত থাকে, কিছুতেই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। কিন্তু হায়! হায়! আমি প্রাণের দ্বারা মনের সাধন করি নাই- -কেবল ভূও নাম করিয়াছি মাত্র এবং রূপ বা মূর্ত্তি যাহা দেখিয়াছি, তাহাও কল্পনা! সুতরাং আমার আর কি গতি হইতে পারে?

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্ জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে।।

গীতা।

অর্থাৎ আমি তোমায় বিজ্ঞানের সহিত এই (মদ্‌বিষয়ক) জ্ঞান বিশেষরূপে বলিব, যাহা জানিলে, জগতে আর কিছু জানিবার বিষয় অবশিষ্ট থাকিবে না।

ইহার দ্বারা দেখা যায় যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাতে দেখিয়া ও তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াও তৎসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। এরূপ স্থলে কেবল কল্পনার দ্বারা আমার তদ্বিষয়ক জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? সুতরাং আমার নাম জপ করা আর না করা দুইই সমান। নামের দ্বারা যখন আমার সেই হরি বা শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই হইল না, তখন ভক্তি কাহাকে করিব? যাহাকে ভক্তি করিব, সেই পাত্রই যদি আমার ঠিক না হইল, তাহা হইলে আমার ভক্তি কতক্ষণ ঠিক থাকিতে

পারে? ভক্তি মুখের কথা নহে। তবে কপট ভক্তি লাভ করা কষ্টকর নহে। দুই চারি বার লোকের কাছে রাধার প্রেম বা শ্রীকৃষ্ণের লীলার বিষয় শুনিয়া কাঁদিতে পারিলেই আমি অনায়াসে ভক্ত বা প্রেমিক উপাধি লাভ করিতে পারি। কিন্তু প্রকৃত অব্যভিচারিণী ভক্তি সাধন ব্যতীত লব্ধ হইতে পারে না *। কর্ম্মযোগের দ্বারা যখন আমার জ্ঞান লাভ হইবে, তখনই আমার ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। নচেৎ ভক্তি কোথায়? 'শ্রীকৃষ্ণ' এই শব্দটি যদি শ্রীকৃষ্ণ না হইলেন, তাহা হইলে, নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান কোথায়? শব্দ যখন নশ্বর পদার্থ, তখন নিত্য পদার্থ সেই অব্যক্ত পরাশক্তির সহিত উহা কিরূপে তুলনা হইতে পারে?

শাস্ত্রে শব্দকে ব্রহ্ম বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা বাহিরের শব্দ নহে। আমরা যে সকল শব্দ করিয়া বা বলিয়া থাকি, সে সকল আকাশতত্ত্বের গুণমাত্র। সুতরাং উহা কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না। শাস্ত্রে যাহাকে "শব্দব্রহ্ম" বলিয়াছেন, তাহা অশব্দের শব্দ অর্থাৎ যে শব্দ বিনা আঘাতে আপনা আপনি হইয়া থাকে। প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীই কেবল এই প্রণবধ্বনিরূপ শব্দ শ্রবণ করেন; ঐ ধ্বনি যখন সাধকের শ্রুতিগোচর হইয়া বিশেষরূপে নিশ্চিত বুদ্ধি হয়, তখনই সাধকের সমাধিতে অচলাবুদ্ধি হইয়া থাকে।গীতাতেও ভগবান্ এই কথা বলিয়াছেন ঃ—

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা
সমাধাবচলা বুদ্ধি স্তদা যোগমবাপ্স্যসি।।

যদা শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (শ্রুতিভিঃ ওঁকারধ্বনিশ্রবণৈঃ বিশেষণ প্রতিপন্না নিশ্চিতা) তে (তব) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্ ইতি সমাধিঃ পরমেশ্বরঃ তস্মিন্) নিশ্চলা (বিষয়ান্তরৈঃ অনাকৃষ্টা) (অতএব) অচলা (অভ্যাসপটুত্বেন তত্রৈব স্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগম্ (তত্ত্বজ্ঞানম্) অবাপ্স্যসি (লপ্স্যসে)।।

অর্থাৎ যখন ওঁকারধ্বনি শ্রবণে তোমার বুদ্ধি অবিচলিত হইয়া, পরমেশ্বরে নিশ্চল ও স্থির থাকিবে,তখন তুমি যোগ (তত্ত্বজ্ঞান) প্রাপ্ত হইবে। বিনা আঘাতে আপনা আপনি যে শব্দ হয়, তাহাই ওঁকার ধ্বনি। সেই শব্দের যে ধ্বনি, তাহার অন্তর্গত এক পীতবর্ণ জ্যোতি আছে এবং সেই জ্যোতির অন্তর্গত মন। এই মন যাহাতে লীন হয়, তাহাই অব্যক্ত বিষ্ণুর পরম পদ; সেই পরম পদের ধ্যানই পরম ধ্যান এবং সেই ধ্যানের বিষয়ই ব্রহ্ম। ওঁকার গীতাতেও এই কথা উক্ত হইয়াছে; যথা—

অনাহতশ্চ যঃ শব্দস্তস্য শব্দস্য যো ধ্বনিঃ।
তস্য চান্তর্গতং জ্যোতি স্তস্য চান্তর্গতং মনঃ।।

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯ম অঃ ২৬শ শ্লোকের টীকা, ১১শঃ ৫৪শ শ্লোকের টীকা এবং ১২শ অঃ ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোক ও টীকা দেখ।

যস্মিন মনো লয়ং যাতি তদ্‌বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।
তৎপদং পরমং ধ্যানং তদ্ধ্যানঞ্চ হি ব্রহ্মতঃ।।

এই ওঁকাররূপ শব্দই ব্রহ্ম এবং এই শব্দের অতীত অবস্থা 'নিরঞ্জন' নামে অভিহিত—

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সঞ্চিন্তয়েদ্ যতিঃ।
শব্দব্রহ্মাদিরূপেণ শব্দাতীতং নিরঞ্জনম্।।

ওঁকার গীতা।

অতএব আমরা মুখে নামাদি উচ্চারণ করিয়া যে শব্দ করিয়া থাকি, তাহা ব্রহ্ম নহে। সুতরাং নাম ও নামীর বিষয় এক হইতে পারে না। আমার নাম কখনও আমি নহে! নাম উপাধিমাত্র,—আমি' স্বতন্ত্র বিষয়। এরূপ অবস্থায় অভেদ কোথায়? প্রকৃতপক্ষে আমার "আমি" থাকিতে অভেদ জ্ঞান হইতেই পারে না। নাম ও নামীর অভেদ জ্ঞান করিব, এ কথা কেবল মুখে বলিলে ত হয় না—কার্য্যে পরিণত করা চাই।

উপস্থিত কালে যে সকল হরিনাম সংকীর্ত্তনাদি হইয়া থাকে, সে গুলি তামসিক বা রাজসিক কর্ম্ম। গীতাতে ভগবান্ সাত্ত্বিক কর্ম্মের যে লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা নিম্নে লিখিত হইল; যথা ঃ—

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে।।

অর্থাৎ নিষ্কাম ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিত্যরূপে বিহিত, আসক্তিশূন্য, প্রীতিপ্রযুক্ত বা দ্বেষবশতঃ কৃত নয় এমন যে কর্ম্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয়।

সুতরাং উপস্থিত কালের নাম-সংকীর্ত্তনাদি কখনই সাত্ত্বিক কর্ম্ম নামে অভিহিত হইতে পারে না। তবে যদি বলা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই ভুল বলিয়াছেন, তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা; সে রূপস্থলে ঐ সকল গুলিই সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে পারে। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য যদি ভুল হয়, তবে তাঁহার নামের আর মাহাত্ম্য কি রহিল? তাঁহার বাক্য কখনও ভুল হইতে পারে না।

আমাদের কার্য্যের দোষে, শিক্ষার দোষে এবং প্রবৃত্তির দোষে, আমরাই ভুল বুঝিয়া ভুল করিয়া থাকি। আমি তামসিক ভাবাপন্ন, তামসিক কার্য্যেই আমার প্রবৃত্তি। সুতরাং সাত্ত্বিক কর্ম্মে আমার লক্ষ্য হয় না। লক্ষ্য হইলেও আমার প্রবৃত্তি লোভের বশীভূত হইয়া, আমাতে সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইতে ফিরাইয়া আনে; তাহাতে রত হইতে দেয় না। সুতরাং আমি নামের অছিলায় সুরে তালে রাগ রাগিণীতে আসক্ত হই। নতুবা সুর তাল রাগ রাগিণী যদি না থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয়, আমি নাম সংকীর্ত্তন করিতাম না। সাত্ত্বিক ইচ্ছার অভাবেই কেবল আমি এইরূপ করিয়া থাকি।

উপরি উক্ত সাত্ত্বিক কর্ম্মের লক্ষণানুসারে আমার নামসংকীর্ত্তনাদি কর্ম্ম কখনই সাত্ত্বিক কর্ম্ম নহে। সভা সমিতি করিয়া আজ কাল যে সকল হরিনামাদি সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, সে সকল সঙ্গ-বর্জ্জিত নহে,–ফলাকাঙ্ক্ষারহিতও নহে; বরং প্রীতি বা দ্বেষবশতই হইয়া থাকে। কারণ, অনেক স্থলেই প্রায় এইরূপ দেখা যায় যে, অমুক সভার যখন পাঁচ দিন অধিবেশন ও বক্তৃতা এবং দলে দলে নাম সংকীর্ত্তন বাহির হইয়াছিল, তখন আমাদের এবার দশ দিন হওয়া চাই; তাহাদের অপেক্ষা নিশানও বেশী রাখা আবশ্যক, এবং বিধিমতে চেষ্টা করা চাই, যাহাতে তাহাদের অপেক্ষা আমাদের দল ভাল হয়; আর নাম সংকীর্ত্তন পাড়ায় পাড়ায় করা চাই; নিশানের উপর লিখিয়া দিতে হইবে, "অমুক পাড়ার সঙ্কীর্ত্তনের দল"। আর যিনি যিনি গগনভেদী বক্তৃতা করিতে পারেন, এমন বাছা বাছা লোক আনিতে হইবে; তাহাতে যত টাকাই খরচ হউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, এবং সঙ্কীর্ত্তনেরও এমন বন্দোবস্ত করা উচিত, যেন মৃদঙ্গের, করতালের ও রামশিঙার ধ্বনিতে নগর কম্পিত হইয়া উঠে–মোট কথা,তাহাদের অপেক্ষা আমাদের সংকীর্ত্তন যেন আড়ম্বরে কোন অংশেই কম না হয়। হায়, ইহারই নাম কি আমার সাত্ত্বিক কর্ম্ম?

গীতার যে শ্লোকটি উপরে উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা দেখিলে, ইহাকে ত কোন ক্রমেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। এরূপ ভাবে যে সকল হরিনামাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা তামসিক বা রাজসিক কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। গীতাতেও ভগবান এইরূপে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলকে রাজসিক বা তামসিক কর্ম্ম বলিয়াছেন,–

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্।।

গীতা ১৮শ অঃ ২৪শ শ্লোক।

অর্থাৎ ফলাকাঙ্ক্ষী বা অহঙ্কারযুক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অতিশয় আয়াসযুক্ত যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস বলিয়া কথিত।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম।
মোহাদরভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে।।

গীতা ১৮শ অঃ ২৫শে শ্লোক।

অর্থাৎ পরিণামে কর্ম্মবন্ধন, নাশ, পরহিংসা, ও স্বকীয় সামর্থ্য,–এই সকল পর্য্যালোচনা না করিয়া মোহবশতঃ যে কর্ম্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস বলিয়া কথিত হয়।

বাস্তবিক আমাদের দেশে যেরূপ ভাবে নামাদি সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিতহইয়া থাকে, তাহা রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মব্যতীত আর কিছুই নহে। আজ কাল সবই বিপরীত।

মৃদঙ্গ (খোল) বাজাইয়া নিশান উড়াইয়া দলে দলে সংকীর্ত্তনের বা হরিনামের ছড়াছড়ি। হায়, হায়, ইহাই কি সঙ্কীর্ত্তন!!! ইহাই যদি সঙ্কীর্ত্তন হয়, তবে সঙ্কীর্ত্তনের পরে গলা বসিয়া যায় কেন? গা গতরের বেদনাই বা থাকে কেন? এইরূপে হরিনাম করাটা সাত্ত্বিক কর্ম্ম হইলে, সেই সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিণামে ক্লেশ বা অশান্তি হওয়া ত উচিত নহে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের পরিণামে শান্তিসুখই হওয়া উচিত; বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ বশতঃ যে কর্ম্মের প্রথমে সুখ ও পরিণামে ক্লেশ অনুভূত হয়, তাহাই রাজসিক বলিয়া গণ্য; এইরূপ সঙ্কীর্ত্তনে তাহাই হইয়া থাকে অর্থাৎ এইরূপ হরিসংকীর্ত্তনে যদি কোন সুখ হয়, তাহাকে সাত্ত্বিক সুখ বলা যায় না, উহা রাজসিক ও তামসিক সুখের মধ্যেই পরিগণিত। গীতাতে ভগবান্ এইরূপ সুখকেই রাজসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যথা—

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্।।
যদগ্রে চানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্।।

গীতা ১৮শ অঃ ৩৮শ ৩৯শ শ্লোক।

এই জন্যই শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা আর নাই। সাধন ব্যতীত নিরপরাধ হইতে পারা যায় না। আমি নিরপরাধ হইয়াছি,—ইহা মুখে বলিলেই কি হইল? বাস্তবিক আমি যতদিন ইন্দ্রিয়ের দাস, ততদিন আমার নিরপরাধ হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যদি বলি, আমি নামের দ্বারাই নিরপরাধ হইব অর্থাৎ নাম করিতে করিতেই আমার নিরপরাধের অবস্থা হইবে, তাহা হইলেও আমার নিতান্ত ভুল। কেননা, নাম করিবে কে? মনে প্রাণে ঐক্য করিয়া নাম করিতে না পারিলে, নাম করা না করা —এ দুইই তুল্য। পরন্তু ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃস্থৈর্য্যের অভাবে আমার নাম করা তামসিক কর্ম্মে পরিণত হইবে। যাহাতে উহা তামসিক কর্ম্মে পরিণত না হয়, সেই আশঙ্কায় নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার ব্যবস্থা আছে। যদি কেবল নামের দ্বারাই নিরপরাধ হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে, চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে নিরপরাধ হইয়া নাম করিবার বিধি থাকিত না। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে।—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।

অর্থাৎ —

তৃণ হইতেও নীচ হইয়া সদা লইবে নাম।
আপনি নিরভিমানী অন্যে দিবে মান।।

তরু সম সহিষ্ণুতা বৈষ্ণব করিবে।
ভর্ৎসন তাড়নে কাকে কিছু না বলিবে।।
কাটিলেও তরু যেন কিছু না বলয়।
শুকাইয়া মরে তবু জল না মাগয়।।
এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে।
অযাচিত বৃত্তি কিম্বা শাক ফল খাবে।।
সদা নাম লবে যথা লাভেতে সন্তোষ।
এই মত আচার করি ভক্তি ধর্ম্ম-পেশ।।
ঊর্দ্ধবাহু করি কহোঁ শুন সর্ব্বলোক।
নামসূত্রে গাঁথি পর কণ্ঠে এই শ্লোক।।
প্রভু আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ।
অবশ্য পাইবে তবে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।

কিন্তু আজ কাল সবই ইহার বিপরীত। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বৈষ্ণব এখন কোথায়? এখন প্রায় সকলেই আমার ন্যায় ব্যভিচারগ্রস্ত। যাহাতে ব্যভিচারের নাশ হয়, তাহার প্রতিও কাহার লক্ষ্য নাই। এখন কেবল যশঃপ্রত্যাশায়, ফলপ্রত্যাশায়, ভোজন প্রত্যাশায়, ভক্ত উপাধি-লাভ প্রত্যাশায় বা অর্থপ্রত্যাশায় দম্ভের সহিত রাস্তায় রাস্তায় সভাতে সভাতে নাম সংকীর্তনের ছড়াছড়ি। এই সকল কারণে শ্রীজীব গোস্বামী সাধনাঙ্গ সকল লিপিবদ্ধ করিয়া বৃন্দাবন হইতে নবদ্বীপ ধামে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে প্রাণায়ামের ক্রিয়া সকল নিহিত আছে। এই গ্রন্থে ইতঃপূর্ব্বেও ইহার উল্লেখ করা হইয়াছে; সুতরাং এখানে পুনরুক্তি অনাবশ্যক।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, উপস্থিত কালের বৈষ্ণব মহাশয়েরা বলিয়া থাকেন যে, ঐ গ্রন্থ তাঁহাদের জন্য নহে; উহা প্রভুদিগের জন্যই হইয়াছে এবং একমাত্র নামেতেই তাঁহাদের মোক্ষ হইবে; কেননা—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।

অর্থাৎ কলিতে কেবল হরির নামই (সার); তদ্ব্যতীত কলিতে জীবের আর অন্য গতি নাই। বাস্তবিক ইহা শাস্ত্রীয় কথা বটে, তবে শাস্ত্র কি ভুল? জড় চক্ষে দেখিতে গেলে, শাস্ত্র ভুল বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা কখনই হইতে পারে না। আমাদেরই বুঝিবার ভুল।

একটু ধীরভাবে দেখিলেই ইহার মীমাংসা হইতে পারে। কিন্তু মীমাংসা হইবে

কোথা হইতে? এক সাধনের অভাবে আমার মন সত্ত্বভাবাপন্ন নহে। সুতরাং আমি প্রবৃত্তি অনুসারে কেবল গোলে হরিবোল করিয়া বেড়াইতেছি। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইলে, কোন বিষয়েই গোল থাকে না। শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিই বা কিরূপে? আমার সাধন ভজন কিছুই নাই। এক সাধনের অভাবে শান্তিরূপ ফল হইতেছে না এবং শান্তিরূপ ফলের অভাবে মনও নত হইতেছে না। বৃক্ষে ফল ধরিলে, ডাল যেমন স্বভাবতঃ নত হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাধন দ্বারা শান্তিরূপ ফল ফলিলে, মন আপনা আপনি নত হইয়া যায় ও তখনই সাধনের নিরপরাধ রূপ অবস্থা স্বতই প্রকাশ পায় এবং তখনই স্বতই নামরূপ অবস্থা সর্ব্বদা আপনা আপনি হইতে থাকে। সেই অবস্থায় লাগিয়া থাকার নামই 'হরিনাম জপ'। শাস্ত্র হইতে ভগবত্তত্ত্বের মীমাংসা করিতে হইলে, যৌগিক অর্থ জানা আবশ্যক। তদ্ব্যতীত শাস্ত্রের মীমাংসা হয় না।

"হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম" ইত্যাদি রূপ যে শ্লোকটি উপরে বলা হইয়াছে, যৌগিক অর্থে তাহার অন্বয় অন্যরূপ, যথা "হরেনাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ হরের্নাম" অর্থাৎ "কেবলই" হইতেছে হরির নাম। এখানে "কেবল" শব্দের অর্থ একমাত্র নহে। "কেবল" একটি কর্ম্মবিশেষ। এই কেবলরূপ কর্ম্মের দ্বারা কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই কর্ম্মই একমাত্র ব্রহ্মপ্রকাশের হেতুভূত।

কেবলেনাদ্যযোগেন সাধকো ভৈরবো ভবেৎ।।

কৈবল্যতন্ত্র।

অর্থাৎ কেবলরূপ আদ্যযোগের দ্বারা সাধক ভৈরব হন। এই কেবল কর্ম্মের যে অবস্থা, তাহার নামই 'হরি'; কারণ, এই যে কেবল কর্ম্মই জীবের জীবভাব হরণ করিয়া কৈবল্যাবস্থা প্রাপ্তি করাইয়া দেয়। ইহা একমাত্র প্রাণায়ামপরায়ণ যোগীরাই লাভ করিতে পারেন। পূরক রেচক স্বতঃ বর্জ্জিত অবস্থাই কেবলরূপ কর্ম্মের অবস্থা।

সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ।
রেচশ্চাপূর্য্য যঃ কার্য্যঃ স বৈ সহিতকুম্ভকঃ।।
রেচকং পুরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্।
প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ সঃ কেবল ইতি স্মৃতঃ।।

গ্রহযামল।

অর্থাৎ কুম্ভক দুই প্রকার,— সহিত ও কেবল; রেচক ও পূরকের সহিত যে কুম্ভক, তাহার নাম 'সহিত' এবং রেচক পূরক পরিত্যাগে সুখে যে বায়ু ধারণ হয় অর্থাৎ বায়ু যে স্বতঃ স্থির হয়, সেই প্রাণায়ামের নামই 'কেবল'।

এই কেবলরূপ কর্ম্মের আর একটি নাম 'সহজ কর্ম্ম'। বৈষ্ণবদিগের বিবর্ত্তবিলাস

নামক গ্রন্থে সহজ কর্ম্ম ব্যতীত জীবের যে উপায়ন্তর নাই, তাহা স্পষ্ট ব্যক্ত আছে। কেবল কর্ম্ম হইতে যেমন কৈবল্যাবস্থা, এই সহজ কর্ম্ম হইতে তেমনিই সহজাবস্থা। এ উভয় অবস্থাই তুল্য; কিন্তু অতি দুর্ল্লভ। সদ্‌গুরুর কৃপা ব্যতীত উহা লাভ হয় না। সাধকের যখন উক্ত অবস্থা লাভ হয়, তখনই প্রকৃত হরিনাম স্মরণ বা কীর্ত্তন হয়। তখন আর মুখে চীৎকার করিয়া নাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে হয় না।

মহাত্মা কবির সাহেবও এইরূপ ভাবে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সুতরাং এখানে আবার তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক।

বাস্তবিক একটু ধীরভাবে ও গোঁড়ামি ছাড়িয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা কার্য্যতঃ ঠিক হইতেছে না। পূর্ব্বে যে দাসভাবে সেবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা আত্মজ্ঞানীর পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তবে সাধকের প্রথম সাধনাবস্থায় এরূপ অণুজ্ঞান থাকা একান্তই আবশ্যক।

জীব যতকাল অজ্ঞানরূপ অহংমদে মত্ত থাকে ততকালে আত্মজ্ঞানের অভাবে নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্য বলিয়া থাকে। তন্মধ্যে "তিনি প্রভু, আমি দাস" ইহাও আত্মজ্ঞানীর চক্ষে এক প্রকার প্রলাপ বাক্য মাত্র। অজ্ঞানীর পক্ষে ভগবৎ সম্বন্ধে কিছু না করা অপেক্ষা কিছু করা ভাল এই মাত্র। যখন কর্ম্মের দ্বারা আমার 'আমি'র" জ্ঞান হইবে, তখনই এই প্রলাপ যাইবে; নচেৎ নহে; তবে যে দ্বৈত অদ্বৈত লইয়া বাদানুবাদ করি, তাহা কেবল আমার বিতন্ডা মাত্র। বাস্তবিক এ উভয় বাদের মধ্যে আমার কোন বাদেরই জ্ঞান নাই, কেবল মুখে বলি মাত্র যে, জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু ইহা একবারও ভাবি না যে, জীবাত্মা আসিল কোথা হইতে?

মনে করুন, এক স্বর্ণ হইতে যেমন নানাপ্রকার অলঙ্কার হইয়া নানা উপাধি ধারণ করে, কিন্তু অলঙ্কারগুলি স্বর্ণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, তদ্রূপ আত্মা এক বই দুই নহে। কিন্তু ইহা কেবল মুখে বলিলে হয় না। দ্বৈত বা অদ্বৈতবাদ মুখের কথা নহে; ইহা সাধনের এক এক অবস্থা মাত্র। "এক ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই" অদ্বৈতবাদীদিগের এই কথাটি সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কারণ, এক ব্রহ্ম বলে কে? যিনি 'এক' বলেন, তিনি এক, আর ব্রহ্ম এক; সুতরাং দুই হইল। দুই থাকিলে আর অদ্বৈত কোথায়? যাহা সাধনের দ্বারা লাভ করিতে হয়, আমি দুই চারি পাতা পুঁথি পড়িয়া সেই জ্ঞান লাভ করিব,—ইহাই কি কখন সম্ভব? কখনই নহে; কেননা তাহা হইলে জগতে আর কেহই অজ্ঞানী অথবা বদ্ধ থাকিত না। এরূপ অবস্থায় সকলেই পুস্তক পাঠ করিয়াই মুক্ত হইয়া যাইত।

অতএব সাধনার দ্বারা নিজবোধ না হইলে, দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের মীমাংসা হয়

না। গুরুপদেশে সাধন কার্য্য আরম্ভ করিয়া, সাধক যখন আপন হৃদয়াকাশে জ্যোতির্ম্ময় কূটস্থ চৈতন্যের রূপ দর্শন করেন, তখন তাঁহার মনের মধ্যে যে ভাবের উদয় হয়, তাহাই "দ্বৈত ভাব"। সে অবস্থায় তাঁহার দৃশ্য ও দ্রষ্টাভাব বর্ত্তমান থাকে বলিয়া, উহাকে "দ্বৈতভাব" কহে। আর সেই অবস্থায় থাকিতে থাকিতে যখন সাধকের দ্রষ্টা ভাব যায় অর্থাৎ আত্মজ্যোতি দর্শন করিতে করিতে সাধক যখন "আমি হারা" হইয়া যান এবং দ্রষ্টার অভাব হয়, তখনই তাঁহার অদ্বৈতভাব। ইহা কল্পনায় বা শাস্ত্রপাঠে কখনই হয় না। শাস্ত্রপাঠে দ্বৈত বা অদ্বৈত বাদের জ্ঞান লাভ করা বিড়ম্বনা মাত্র। শাস্ত্রপাঠে এ পর্য্যন্ত কেহ আত্মজ্ঞান বা দ্বৈত-অদ্বৈতবাদের জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই। সুতরাং শাস্ত্রপাঠের দ্বারা উহা লাভ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র।

এক কালে নারদ ঋষিও শাস্ত্রপাঠে জ্ঞানলাভ করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু শাস্ত্রাদির দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ না হওয়ায় শোকাকুল হইয়াছিলেন ঃ—

সপুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানিচ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্বেন নারদোঽতি শুশোচ হি।।
বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা।
পশ্চাত্ত্বভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্ব্বৈশ্চ শোকিতা।।

পঞ্চদশী।

নারদেরই যখন এই অবস্থা ঘটিয়াছিল, তখন 'অন্যে পরে কা কথা'। বাস্তবিক শাস্ত্রাদিপাঠে জ্ঞান লাভ হওয়া দূরে থাকুক, বরং নাস্তিকতার ভাবই দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু তাহা ধরা কঠিন; কেননা, আমার অন্তর নাস্তিকতায় পরিপূর্ণ হইলেও ব্যবসার খাতিরে আমি মুখে আস্তিকতার ভাণ দেখাইয়া থাকি, কিন্তু গোপনে সবই করিতে প্রস্তুত, কিছুতেই কুণ্ঠিত নহি।

এই নাস্তিকতাবাদ ঘুচাইবার অভিপ্রায়ে ও পশুভাবাপন্ন তান্ত্রিকদিগের ঘোর প্রাণিবধের উৎপাত নিবারণ মানসে গৌরাঙ্গদেব টোল ছাড়িয়া হরিনাম প্রচার করেন। যাহারা কিছু করিতে চাহে না, তাহাদিগকে সাধনমার্গ লওয়াইবার জন্য ঔষধের অনুপানের স্বরূপ হরিনাম দিয়াছিলেন। যাঁহারা সাধনমার্গ অবলম্বনে কুণ্ঠিত ছিলেন না, তাঁহারা যোগপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ দেখিলেই স্পষ্ট অনুভূত হয় যে, চৈতন্যদেব এই অভিপ্রায়েই ধর্ম্মোপদেশ দিয়াছিলেন। কারণ, উক্ত গ্রন্থে যোগক্রিয়া ও যোগোপদেশ সকল নিহিত আছে। শ্রীরূপ অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, সনাতন, কৃষ্ণদাসকবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণবচূড়ামণিগণ বৃন্দাবনধামে সহজরূপ যোগাভ্যাসে রত হইয়াছিলেন, আর গৌরাঙ্গদেবের ভ্রমান্ধ শিষ্যগণ কামনার দাস হইয়া আলস্যনিবন্ধন

সাধন মার্গকে অবহেলা করিয়া, হরিনামাদি কার্য্যে রত থাকিলেন। তাঁহারা ইহা বুঝিলেন না যে,সাধনের অভাবে হরিনাম করিবে কে? যতদিন আমার মন অন্য বিষয়ে রমণ করে, ততদিন আমি ইন্দ্রিয়ের দাস। সুতরাং এমন অবস্থায় আমার মুখে হরিনাম এবং করে মালা জপ করা না করা ,—এ দুইই সমান।

প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই ইন্দ্রিয়সংযম হয় না। যিনি বলেন যে, এই সহজ প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত ইন্দ্রিয় সংযম হইতে পারে, তিনি আমার ন্যায় নিতান্ত ভ্রান্ত। কেবল ভোগলালসা পূর্ণ করিবার মানসেই ধর্ম্মের অছিলায় ঐরূপ বলিয়া থাকেন মাত্র। সুতরাং তাহা কোন কাজের কথাই নহে। এইরূপে সাধনের অভাবে আমাদের সবই নষ্ট প্রায় হইয়া গিয়াছে। আমরা যদি পুনর্ব্বার সাধনমার্গ অবলম্বন করিয়া, দৃঢ়তার সহিত কার্য্য আরম্ভ করি, তাহা হইলে, পূর্ব্বের সে অবস্থা আবার পাইতে পারি; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত সৎপথে কাহারও দৃষ্টি নাই; যাহা কিছু আছে বলিয়া দেখা যায়, তাহা কেবল ঐহিক সুখভোগের জন্য; ইন্দ্রিয়সুখে মজিয়া থাকায় ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম যে পরধর্ম্ম, তাহা জানি না; সুতরাং লোকসমাজে ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত হইবার মানসে, সেই পরধর্ম্মরূপ অধর্ম্মকেই ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

এইরূপ তান্ত্রিকদিগের মধ্যেও সাধনবিভ্রাট ঘটিয়াছে। তাঁহারাও অধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞান করিয়া, নানারূপ রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন এবং ধর্ম্মের অছিলায়, শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, মদ্যমাংসাদি ব্যবহাররূপ পাশবিক আচারে রত হইয়া থাকেন; অথচ মুখে বলিয়া থাকেন, আমরা বীরাচারী ভৈরব ইত্যাদি। মনে করুন, মদ্যপান, বহুস্ত্রীসেবা অথবা প্রাণিবধ করিয়া তাহার মাংস ভোজন করাটাই যদি ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম কি? পক্ষান্তরে সেই মেষ মহিষ ছাগাদি পশু বধ করিয়া তাহার রক্তাদি মাখিয়া রাক্ষসের ন্যায় আনন্দ প্রকাশ করাই কি ধার্ম্মিকের লক্ষণ? সাধক রামপ্রসাদ সেনও তান্ত্রিক ছিলেন; কিন্তু তিনি এরূপ নৃশংসভাবে বলি দিতেন না। তাঁহার ন্যায় সাধু তান্ত্রিকের এক ভাব এবং ইদানীন্তন তান্ত্রিকগণের আর এক ভাব। ষড়দর্শন এবং বেদও তাঁহার শ্যামার দর্শন পায় নাই। তাই তিনি নিজ রচিত সঙ্গীতে বলিয়াছেন ঃ—

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন।।
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ।।
আত্মারামের আত্মা কালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে ঘটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।।

তারার উদয় ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর মর্ম্মকাল জেনেছেন অন্য কেটা জান্‌বে তেমন।।
প্রসাদ ভাবে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধু যেমন।
আমার মন বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধর্‌বে শশী হ'য়ে বামন।।

মন কর কি তত্ত্ব তাঁরে।
ওরে উন্মত্ত আঁধার ঘরে।।
সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধর্‌তে পারে।।
মন অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোটার ভিতর চোর কুটুরি ভোর হলে সে লুকাবে রে।।
ষড়দর্শনে দর্শন মিলে না আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক সদানন্দে বিরাজ করে।।
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হ'লে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে।।
প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গ্‌ব হাঁড়ী বুঝরে মন ঠারে ঠোরে।।

অপিচ—

ভাব না কালী ভাবনা কিবা।
ওরে মোহময়ী রাত্রি গতা সম্প্রতি প্রকাশে দিবা।।
অরুণ উদয় কাল ঘুচিল তিমির জাল।
ওরে কমলে কমল ভাল প্রকাশ করিলা শিবা।।
বেদে দিলে চক্ষে ধূলা ষড়দর্শনের সেই অন্ধগুলা।
ওরে না চিনিল জ্যেষ্ঠা মূলা খেলা ধূলা কে ভাঙ্গিবা।।
যেখানে আনন্দ হাটা গুরুশিষ্য নাস্তি পাঠ।
ওরে যার নেটো তার নাটা তত্ত্বে তত্ত্বে কে পাইবা।।
যে রসিক ভক্ত শূর সে প্রবেশে সেই পুর।
রামপ্রসাদ বলে ভাঙ্গলে ভোর আগুন বেঁধে কে রাখিবা।

বলিদান সম্বন্ধেও রামপ্রসাদ বলিয়াছেন ঃ—

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখ না।।
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি, জেনেও কি মন তা জান না।
মাটীর মূর্ত্তি গড়িয়ে মন তাঁর, কর্‌তে চাওরে উপাসনা।।
জগৎকে সাজাচ্ছেন যে মা, দিয়ে কত রত্ন সোনা।
ওরে কোন সাজে সাজাতে চাস্ তাঁয়, দিয়ে ছার ডাকের গহনা।।
জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ্য নানা।
ওরে কোন লাজে খাওয়াতে চাস তাঁয়, আলোচাল আর বুটভিজানা।।
ত্রিজগৎ যে মায়ের ছেলে তাঁর কাছে কি পর ভাবনা।
ওরে কেমনে দিতে চাস বলি, মেষ মহিষ আর ছাগল ছানা।।
প্রসাদ বলে ভক্তি মন্ত্র, কেবল রে তাঁর উপাসনা।
তুমি লোক দেখানো কর্‌বে পূজা, মা ত আমার ঘুষ খাবে না।।

কিন্তু উপস্থিত কালের তান্ত্রিকগণের শ্যামা বা তারা অন্যরূপ! অর্থাৎ বিড়ালবৎ। বিড়াল যেমন আপন শাবককে ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করে, তান্ত্রিকগণের শ্যামাও তদ্রূপ। প্রাণিবধে যদি পাপ না হয়, তাহা হইলে শ্যামার মহিমা বড় কম নয়!! কিন্তু উহাতে যদি পাপ না হয়, তবে পাপ যে কিসে, তাহা বুঝি না।

যূপং কৃত্বা পশুং কৃত্বা কৃত্বা রুধিরকর্দ্দমম্।
যদ্যেবং গম্যতে স্বর্গো নরকং কেন গম্যতে।

যোগোপনিষদে শুকবাক্য।

অর্থাৎ যুপকাষ্ঠে পশুবধ করিয়া এবং রুধির দ্বারা কর্দ্দম করিয়া যদি স্বর্গলাভ হয়, তাহা হইলে নরকে কে যাইবে? বৈদিক কার্য্যে পশুহিংসাদিরূপে যে সকল দোষ আছে, তৎসম্বন্ধে কপিল বলেন ঃ—

দুঃখাদ্দুঃখং জলাভিষেকবন্ন জাড্যবিমোকঃ।।

কাপিলসূত্র ৮২, প্রথম অধ্যায়।

অর্থাৎ জলের দ্বারা যেমন শীতনিবারণ না হইয়া বরং শীতের বৃদ্ধিই হইয়া থাকে, তদ্রূপ মেষ মহিষাদি বধ করিয়া, যজ্ঞকর্ত্তার দুঃখের বৃদ্ধি ভিন্ন তাহার হ্রাস হয় না। সুতরাং এইরূপ বলিদানে "লাভঃ পরং গোবধঃ"। বলি শব্দের অর্থ পূজোপহার। সাধনকালে সাধকের নিজ পশুভাব বলি (উপহার) দিয়া দেবভাবে পূজা করাই বলির উদ্দেশ্য। সাধকবর রামপ্রসাদ সেন তান্ত্রিক ছিলেন বটে, কিন্তু সদ্‌গুরুপদেশে সাধন দ্বারা বলির প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইয়া তৎসম্বন্ধে বলিয়াছেন ঃ—

মন তোর এত ভাবনা কেনে।

একবার কালী ব'লে বস্‌রে ধ্যানে।।
জাঁক জমকে করলে পূজা, অহঙ্কার হয় মনে মনে।
তুমি লুকিয়ে তাঁরে কর্‌বে পূজা, জান্‌বে না রে জগজ্জনে।।
ধাতু পাষাণ মাটির মূর্ত্তি, কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদি পদ্মাসনে।।
আলোচাল আর পাকা কলা, কাজ কি রে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তাঁরে, তৃপ্তি কর আপন মনে।।
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো, কাজ কিরে তোর সে রোশ্‌নাইয়ে।
তুমি মনোময় মাণিক্য জ্বেলে, দাওনা জ্বলুক নিশি দিনে।।
মেষ ছাগল মহিষাদি, কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয় কালী জয় কালী ব'লে, বলি দাও ষড়্‌রিপুগণে।।
প্রসাদ বলে ঢাকঢোল, কাজ কি রে তোর সে বাজনে।
তুমি জয় কালী বলি দাও করতালি, মন রাখ সেই শ্রীচরণে।।

প্রাণিবধ করিয়া বলি দেওয়া শাস্ত্রকর্ত্তার অভিপ্রেত নহে। তবে আমার বুঝিবার দোষে সবই হইতে পারে। তন্ত্রে পঞ্চ মকার সম্বন্ধে যাহা লেখা আছে, তাহার গূঢ় তাৎপর্য্য আছে। আরও কথা,—এই পঞ্চ মকারও তিন প্রকার— সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। যাহারা রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন, তাহারাই এই ঘৃণিত পঞ্চ মকারের সাধন করিয়া থাকে। এই ঘৃণিত পঞ্চ মকারে সাধারণ মদ্য, পশুমাংস, মৎস্যাদি জলচর, মুদ্রা অর্থাৎ ভাজা ইত্যাদি এবং নিজ স্ত্রী বা অন্যা স্ত্রীতে রমণ, এই গুলি সাধনের উপকরণ। এই গুলি অপেক্ষা নিকৃষ্ট ও অধর্ম্মকর বিষয় আর কি আছে?—

মদ্যপানেন মনুজো যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ।
মদ্যপানরতা সর্ব্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্তু পামরাঃ।।
মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণ্যা গতির্ভবেৎ।
লোকে মাংসাশিনঃ সর্ব্বে পুণ্যভাজো ভবন্তু হ।।
স্ত্রীসম্ভোগেন দেবেশি যদি মোক্ষং লভেত বৈ।
সর্ব্বেঽপি জন্তবো লোকে মুক্তাঃ স্যুঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ।।

কুলার্ণব, ২য় উল্লাস।

অর্থাৎ মদ্যপানের দ্বারা যদি মানুষ সিদ্ধিলাভ করে, তাহা হইলে, মদ্যপায়ী পামরেরাও সিদ্ধিলাভ করুক; মাংস ভক্ষণ মাত্রেই যদি পুণ্যা গতি হয়, তাহা হইলে জগতে মাংসাশী সকলেই পুণ্যভাক্ হউক; হে দেবেশি, স্ত্রীসম্ভোগের দ্বারা যদি মোক্ষ

হয়, তাহা হইলে স্ত্রীসেবা হেতু জগতে সকল জীবই মুক্ত হউক।

যদি বলা যায় যে, রাজসিক ও তামসিক লোকের জন্য এরূপ পঞ্চ মকারের ব্যবস্থা হইবার কারণ কি? তদুত্তরে ইহাই জানা উচিৎ যে, আমার প্রবৃত্তি যখন স্বতঃই ঐ সকল বিষয়ে রহিয়াছে, তখন অবশ্যই আমি ঐ সকল কার্য্য অহরহঃ করিব বা করিয়া থাকি। সুতরাং লোকসমাজে আমাকে সকলেই ঘৃণা করে ও বলে "বেটা মাতাল, বেটা বেশ্যাখোর, বদ্‌মাইষ; বেটা একবারও ভগবানের নাম করে না," ইত্যাদি। কিন্তু আমি যখন গৈরিক পরিধান পূর্ব্বক কাপালিকের বেশে সিন্দুরের ফোঁটা লাগাইয়া ভগবদারাধনার ছলে ঐ সকল করি, তখন আমার কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় না, অথচ লোকে সাধুজ্ঞানে আমাকে প্রণাম করে ও ভক্তি করে। ভগবদ্‌বিষয়ে আমার অনুরাগ থাকুক আর নাই থাকুক, আমি মজার লোভে তাহাতে রত হই। পূর্ব্বে ভগবদ্‌বিষয়ের নামও করিতাম না; এখন অন্তরে না থাকিলেও, মুখে লোক দেখান "তারা" "তারা" শব্দ করিয়া থাকি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, "তারা" কি , তাহা জানি না, কেবল মুখে বলি মাত্র। ইহাতেও কিছু উপকার আছে– সাধুর ভাণে, নানা প্রকার সাজ গোজ করিয়া ধার্ম্মিক সাজিয়া এই রঙ্গালয়ে অভিনয় করিতে হয়। ধর্ম্মের এরূপ ভাণও কতক ভাল; নচেৎ ওসব কিছুই ভাল নহে।

উপরে যে সাত্ত্বিক পঞ্চ মকারের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কি – এক্ষণে তাহারই আলোচনা করা যাউক। তন্ত্রের মধ্যে যে সকল সাধন প্রণালী আছে, তন্মধ্যে পঞ্চ মকার সর্ব্বপ্রধান। এই পঞ্চ মকারের গূঢ় তাৎপর্য্য প্রায় কোন তান্ত্রিকের কাছেই পাওয়া যায় না। তবে শাস্ত্রে যে সকল বচন আছে, তাহা অপ্রাপ্য নহে। কিন্তু যদ্দ্বারা কাজ হইবে, এমন লোক দেখা যায় না। বচনে সবই আছে বটে, কিন্তু কাজে তাহা করায় কে ?প্রকৃত কার্য্য করাইবার লোক অতি বিরল। এক্ষণে যতটুকু প্রকাশযোগ্য, এখানে তাহাই বলা যাইতেছে। প্রথমতঃ– মদ্য কাহাকে বলে এবং শাস্ত্রেই বা কাহাকে মদ্য বলিয়াছেন ?

সোমধারা ক্ষরেদ যা তু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পীত্বানন্দময়স্তাং যঃ স এব মদ্যসাধকঃ।।

আগমসায়।।

অর্থাৎ হে বরাননে! ব্রহ্মরন্ধ্র অর্থাৎ সহস্রার হইতে যে অমৃতধারার ক্ষরণ হয়, তাহা পান করিয়া যে ব্যক্তি আনন্দিত হয়েন, তাঁহাকেই "মদ্যসাধক" বলা যায়।

যদুক্তং পরমং ব্রহ্ম নির্ব্বিকারং নিরঞ্জনম্।
তস্মিন্ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীর্ত্তিতম্।।

কৈবল্যতন্ত্র।

অর্থাৎ নির্ব্বিকার নিরঞ্জন পরব্রহ্মেতে যোগবল দ্বারা যে প্রমদন (জ্ঞান) তাহার নাম "মদ্য"। অর্থাৎ সুরাপায়ী ব্যক্তিরা যাদৃশ শরীর রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ক জ্ঞানশূন্য হইয়া আনন্দ লাভ করে, তাদৃশ বিষয়-জ্ঞান শূন্য হইয়া নির্ম্মল ব্রহ্মে যে আনন্দ জ্ঞান, তাহার নাম "মদ্য"। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, নাভিতে সূর্য্য এবং তালুমূলে চন্দ্র আছেন। সূর্য্যকে তালুমূলে আকর্ষণ করিয়া মিলন করায় চন্দ্র সূর্য্যের সমাগম হয়। সেই সমাগমে অনিল ও অমৃত স্বরূপ সুধা বায়ু অর্থাৎ মিষ্টবায়ু গলায় অনুভূত হয়। ইহাই মদ্য, ইহাই এক প্রকার নেশার মতন হয়। সাধক এইরূপ মদ্যপান করিয়া সর্ব্বদা ভগবৎ নেশায় মাতিয়া থাকেন। সাধকবর রামপ্রসাদ সেনও যে, এই প্রকার মদ্যপান করিতেন, তাহা তাঁহার স্বরচিত সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়াছেন,–

রসনায় কালী কালী ব'লে।
আমি ডঙ্কা মেরে যাব চ'লে।।
সুরা পান করিনে রে, সুধা খাইরে কুতুহলে।
আমার মন মাতালে মেতেছে আজ, মদ মাতালে মাতাল বলে।।
খালি মদ খেলেই কি হয়, লোকে কেবল মাতাল বলে।
যা আছে কর্ম্ম কে জানে মর্ম্ম, জানে কেবল সেই পাগলে।।
দেখা দেখি সাধয়ে যোগ, সিজে কায়া বাড়য়ে রোগ।
ওরে মিছে মিছি কর্ম্মভোগ, গুরু বিনে প্রসাদ বলে।।
ওরে সুরাপান করিনে আমি,
সুধা খাই জয় কালী ব'লে।
মন-মাতালে মাতাল করে,
মদ মাতালে মাতাল বলে।।
গুরুদত্ত গুড় লয়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা।
আমার জ্ঞান সুঁড়িতে চূয়ায় ভাঁটি,
পান করে মোর মন মাতালে।
মূল মন্ত্র যন্ত্র ভরা, শোধন করি ব'লে তারা মা।
রামপ্রসাদ বলে, এমন সুরা, খেলে চতুর্ব্বর্গ মেলে।।

কবির দাসও বলিতেন, "বিন্ মদ্ পিয়ে মাতোয়ারা" অর্থাৎ সাধকে মদ্যপান না করিয়াও মাতাল হইয়া থাকে। শাস্ত্রে সাত্ত্বিক ভাবও রহিয়াছে, রাজসিক ও তামসিক ভাবও রহিয়াছে। আমার প্রবৃত্তি অনুসারে আমি রাজসিক ও তামসিক ভাব গ্রহণ করিয়া সাত্ত্বিক ভাবে লক্ষ্যও করি না; বরং সাত্ত্বিক ভাবকে ঘৃণা করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকি।

কিন্তু রাজসিক ও তামসিক পঞ্চ মকারে আমি যে সুখ অনুভব করিতেছি, তাহাতে শরীর ও মন দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে; তথাপি প্রবৃত্তির এমন অপার মহিমা যে, উহা আমাকে বোকা করিয়া রাখিয়াছে; শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম কেহ বুঝাইয়া দিলেও স্বীকার করি না।

এক্ষণে দ্বিতীয় মকার মাংস কাহাকে বলে, তাহা দেখা যাউক। তন্ত্রে এই কয়েকটি মাংসকে "মহামাংস" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

গোনরেভাশ্বমহিষ-বরাহো ষ্ট্রোরগোদ্ভবম্।
মহামাংসাষ্টকং দেবি দেবতাপ্রীতিকারকম্।।

অর্থাৎ গোমাংস, নরমাংস, হস্তিমাংস, অশ্বমাংস, মহিষমাংস, বরাহমাংস, উষ্ট্রমাংস ও সর্পমাংস এই অষ্টবিধ মহামাংস দেবতার প্রীতিকর। আরও কয়েকপ্রকার মাংস উক্ত আছে; যথা—

মাংসন্তু ত্রিবিধং প্রোক্তং জলভূচরখেচরম্।
যস্মাৎ তস্মাৎ সমানীতং যেন তেন বিঘাতিতম্।
তৎ সর্ব্বং দেবতাপ্রীত্যৈ ভবেদেব ন সংশয়ঃ।।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।

অর্থাৎ মাংস ত্রিবিধ —জলচর, স্থলচর ও আকাশচর জীবের মাংস, এই মাংস যে কোন স্থান হইতে যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আনীত বা যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কোনরূপে ঘাতিত হউক না কেন, তৎসমুদায়ই দেবতার প্রীতিকর হইবে, সন্দেহ নাই। প্রথমোক্ত মাংস ও শেষোক্ত মাংস সকলের দ্বারা যদি প্রীতি হয়, তাহা হইলে অপ্রীতিকর মাংস কি আছে? আর এই গুলিই যদি দেবতার ও সাধকের প্রীতিকর হয়, তাহা হইলে রাক্ষসের প্রীতিকর যে কি হইবে, তাহা ত ভাবিয়াও পাওয়া যায় না। বাস্তবিক এইরূপ মাংস ভোজন যদি মাংসসাধকের উপযোগী হয়, তাহা হইলে, ম্লেচ্ছের উপযোগী অপর আর কি হইবে? ইহাতে কেবল জলচরের মধ্যে নৌকা, খেচরের মধ্যে ঘুড়ি ও চতুষ্পদের মধ্যে খট্টাঙ্গ বাদ পড়ে। ইহা কি ধর্ম্ম? এই যদি ধর্ম্ম হয়, তবে অধর্ম্ম কি? আর ইহাই যদি দ্বিতীয় মকার মাংস হয়, তাহা হইলে সাহেবদিগকে ঘৃণা করিবার আবশ্যক কি? তাহারাও ত মাংসসাধক!; বাস্তবিক পশুমাংস বা পক্ষিমাংস ভোজন মাংসসাধকের লক্ষণ নহে। আগমসারে যাহা লিখিত আছে, প্রকৃত পক্ষে মাংসসাধকের লক্ষণ তাহাই।

মা শব্দাদ্রসনা জ্ঞেয়া তদংশান রসনাপ্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ।।

আগমসার।

অর্থাৎ মা, শব্দে রসনাকে বুঝায়, তদংশ বাক্য; ইহা রসনায় প্রিয়। যে ব্যক্তি,

তাহা ভক্ষণ করে, অর্থাৎ বাক্য সংযম করে, সেই যোগী পুরুষকেই "মাংসসাধক" বলা যায়। পঞ্চমাতার মধ্যে গো এক মাতা। সেই গো শব্দের অর্থ জিহ্বা।

গোমাংসং ভোজয়েন্নিত্যং পিবেদমরবারুণীম্।
তমহং কুলীনং মন্যে ইতরে কুলঘাতকাঃ।
গোশব্দেনোদিত্য জিহ্বা তৎপ্রবেশো হি তালুনি।
গোমাংসভক্ষণং তত্ত্ব মহাপাতকনাশনম্।।

হঠযোগপ্রদীপিকা।

অর্থাৎ যিনি নিত্য গোমাংস ভক্ষণ ও চন্দ্র হইতে যে সুধা ক্ষরণ হয় সেই সুধাপান করেন, তিনিই কুলীন; অন্যে কুলঘাতক। গো শব্দে জিহ্বাকে বুঝায় এবং তালুমূলে তাহা প্রবেশ করানই "গোমাংস ভক্ষণ"; এই গো মাংস ভক্ষণ মহাপাতক নাশক। এইরূপ গোমাংস ভক্ষণে জিহ্বার সংযম জিহ্বার সংযমে বাক্যের সংযম সাধিত হয়। এই অর্থেই শ্রী গৌরাঙ্গ বলিতেন ঃ—

গো ভজনে বড় পুণ্য
স্ত্রী থাকিতে গৃহশূন্য,
গুরু মেরে স্বর্গবাস,
হরি ভজ্‌লে সর্ব্বনাশ।

গুরুপদেশে কর্ম্মের সহিত যে সাধক ত্রিকূট দেশে জিহ্বার এইরূপ স্থিতি করাইতে পারেন, তিনি অপার আনন্দ লাভ করেন এবং তাঁহার বাক্যের সংযম হয়। জিহ্বা না থাকিলে কথা কহা যায় না; সুতরাং জিহ্বার সংযমে বাক্যেরও সংযম হইয়া থাকে। এই জিহ্বার কর্ম্মী সাধককে "মাংস-সাধক" কহে। কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা জিহ্বার গোড়া ছেদন করিয়া জিহ্বারূপ মাংস ভক্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের বুদ্ধি ভগবানের অপেক্ষাও বেশী; তাই তিনি যাহা করিয়া দেন নাই, স্বভাবের বিরুদ্ধে আমরা তাহাই করিতে যাই। কি মূর্খতার কার্য্য! কেবল বুঝিবার দোষেই আমরা ঐরূপ করিয়া থাকি। ফুকো দেওয়া দুগ্ধ যেমন খাইতে সুমিষ্ট হয় না এবং উহা যেমন দেবদ্বিজে দেওয়া উচিত নহে, তদ্রূপ ছিন্ন জিহ্বার দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। কেননা, যে স্থানটি কাটা হয়, সেই স্থানের ক্ষত শুকাইলে সেই স্থানটি আর বর্দ্ধিত হয় না। সুতরাং কেবল কাটাকুটিই সার হয় মাত্র। তবে লোককে দেখাইয়া পয়সা উপায়ের সুবিধা হইতে পারে। মাদৃশ অজ্ঞলোকের দ্বারা ধর্ম্ম চালিত হওয়ায় সময়ে সময়ে নানাপ্রকার বাধা বিঘ্ন ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা সদ্গুরুর নিকট হইতে কর্ম্মযোগের শিক্ষা পান, তাঁহারা কাটাকুটির হাত এড়াইয়া থাকেন। জিহ্বা ছেদন করিবার আদৌ আবশ্যক নাই। সদ্গুরুর উপদেশে

জিহ্বার ত্রিকূট দেশে স্থিতি আপনা আপনিই হইয়া থাকে।

ইহাতে যদি বলা যায় যে, শাস্ত্রেও যখন ছেদন করিবার বিধি আছে, তখন ছেদন না করি কেন? কিন্তু যদি সহজ উপায়ে আমার তাহা লাভ হয় এবং ছেদন অপেক্ষাও কার্য্য ভাল হয়, তাহা মন্দ কি? যখন হাজার হাজার লোকের সেই কার্য্য বিনা ছেদনে সমাধা হইতেচে, তখন কাটিবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক শাস্ত্রে সুন্দর সুন্দর সাধন প্রণালী থাকিলেও ব্যবসায়ীদিগের হাতে পড়িয়া অনেক সময় কষ্টকর ঘৃণিত উপায় অবলম্বন করিতে হয়। এই দ্বিতীয় মকার সাধনের এমন উৎকৃষ্ট বিষয় থাকিতেও আমার ন্যায় তামসিক ভাবাপন্ন গুরুর হাতে পড়িয়া মাংসাশী হিংস্র জন্তুর ন্যায় হাড় মাংস চিবাইতে হইতেছে। হায়! হায়! সাত্ত্বিক পঞ্চ মকার থাকিতে আমায় রাক্ষসের ন্যায় ধৰ্ম্মপালন করিতে হইতেছে!!! ধন্য আমার ধৰ্ম্মশিক্ষায় এবং ধন্য আমার গুরুগিরিতে। এইরূপে সাত্ত্বিক ভাব ক্রমশঃ লোপ পাইতে বসিয়াছে। এখন আর প্রায় কেহ তাহার নামও করে না। এই ত সাত্ত্বিক দ্বিতীয় মকার মাংসের কথা বলা হইল।

এক্ষণে পঞ্চ মকারের তৃতীয় মকার মৎসের বিষয় আলোচনা করা যাউক। এই তৃতীয় মকার মৎস্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারায়, জড়ভাবে তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া থাকি। বর্হিলক্ষ্যে (জড় অর্থে) – শাল মাছ, বোয়াল মাছ, ও রুই মাছ এই তিন প্রকার মৎস্যকে উত্তম বলিয়া কথিত হয়। ধাঁইমাছ, চিংড়িমাছ, মাগুর মাছ প্রভৃতি কন্টকহীন মৎস্যকে মধ্যম বলে। মদ্যপানে উন্মত্ত হইলে যদি মাছের কাঁটা গলায় বিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই বিষম বিভ্রাট –এই আশঙ্কায় বহুকন্টাকীর্ণ মৎস্যকে অধম বলা হইয়াছে।

শাস্ত্রে যখন উত্তম পঞ্চ মকার রহিয়াছে, তখন আবার এই ঘৃণিত পঞ্চ মকার থাকার কারণ কি? ইহার কারণ এই যে, যাহারা কিছুই করিতে চাহে না, ধৰ্ম্মপ্রবৃত্তির নাম মাত্র নাই, অথচ মদ্য মাংস সেবন প্রভৃতি অসৎ কার্য্যে রত,–ভুলিয়াও ভগবানের নাম করে না,–তাহাদিগকে সাধন মার্গে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য এই প্রলোভনই একমাত্র সদুপায়। ইহাতে মাংসাদি ভোজন ক্রমশঃ কমিয়া যাওয়া সম্ভব, কেননা, নিত্য মাংসাদি সেবন করা অপেক্ষা পূজাপাৰ্ব্বনাদি উপলক্ষে করায় হিংসাদি অনেক কমিয়া আইসে। কিন্তু যদি গুরু সাত্ত্বিক না হন, তাহা হইলে উন্নতির আশা কিছুমাত্র নাই, কারণ, এই সকল অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে উৎকট রোগগ্রস্থ হইয়া অনুতাপের সহিত মানবলীলা সংবরণ করিতে হয়। কিন্তু গুরু যদি সাত্ত্বিক হন, তাহা হইলে এরূপ অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই। পরন্তু তিনি শীঘ্রই শিষ্যকে তামসিক ও রাজসিক মৎস্যাদির পরিবর্ত্তে সাত্ত্বিক মকার সাধনে প্রবৃত্ত করেন। মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন এই গুলিতে যদি

ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে অধর্ম্ম যে কি এবং কিসে হয়, তাহা ত বুঝিতে পারা যায় না।

এখন দেখা যাউক, বাস্তবিক মৎস্যের তাৎপর্য্য কি। প্রথমতঃ দেখা যাউক, শাস্ত্রেই বা কি বলিয়াছেন ঃ–

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ্ যস্তু স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ।।

অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই দুই নদীর মধ্যে যে দুইটি মৎস্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে, যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করেন, তিনিই "মৎস্যসাধক"। গঙ্গা অর্থে ইড়া এবং যমুনা পিঙ্গলা; এই নাড়ীদ্বয় মধ্যে সর্ব্বদা যে শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, তাহাই "মৎস্য"। যে ব্যক্তি তাহা ভক্ষণ করেন অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণকে স্বতঃ স্থির করেন, তিনিই "মৎস্যসাধক"।

এখন দেখা যাউক, চতুর্থ মকার মুদ্রা কি বা কাহাকে বলে? প্রকৃত সদ্গুরুর অভাবে সকল স্থলেই সাত্ত্বিক ভাব পরিত্যক্ত হইয়া ঘৃণিত তামসিক কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। মুদ্রাসাধনও তদ্রূপ। আজকাল যে মুদ্রাসাধন হয়, সাধারণ কথায় লোকে তাহাকেই "মদের চাট্" বলে। চালকড়াই ভাজা, চীনের বাদাম ভাজা, তিল ভাজা, ছোলা ভাজা ইত্যাদি মুদ্রা। কেবল খৈ ও মুড়িই অধম বলিয়া উক্ত আছে। ঐ সকল ভাজাই যদি মুদ্রা সাধন হয়, তাহা হইলে প্রায় সকলেরই ত মুদ্রাসাধন হইয়া থাকে। হায়! হায়! প্রবৃত্তির কি অপাপ মহিমা!!! প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমি কি সাধনই করিতেছি!!! আমার ঘৃণাও নাই, লজ্জাও নাই! তাই এখনও সমাজে পোড়ার মুখ দেখাইয়া বেড়াই!!! ছি ছি কি লজ্জার বিষয়!!! এ কথা লোককে বলিতেও লজ্জা করে না। আর ইহাই যদি সাধনাঙ্গ হয়, তাহা হইলে পাপ কার্য্য কি? আগমসারে মুদ্রার বিষয় যাহা লিখিত আছে,তাহাই একমাত্র মুদ্রাসাধন; নচেৎ ইন্দ্রিয়চরিতার্থ মাত্র। আগমসারে উক্ত আছে –

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা দ্রি তা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম্।।
সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটিসুশীতলম্।
অতীব কমনীরঞ্চ মহাকুন্ডলিনীযুতম্।
যস্য জ্ঞানোদয়স্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে।।

অর্থাৎ স্বশরীরস্থ সহস্রদলকমলান্তর্গত কর্ণিকা-মধ্যস্থিত কূটস্থ মধ্যে পারদের ন্যায় নির্ম্মল শুভ্রবর্ণ কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্যের আভা অপেক্ষাও অধিক প্রকাশ অথচ শীতল আভাযুক্ত অতিশয় কমনীয় এবং মহাকুন্ডলিনী সংযুক্ত যে আত্মা আছেন, তাঁহাকে যিনি জানিয়াছেন, তিনিই "মুদ্রাসাধক"।এই কুন্ডলিনী প্রাণরূপে দেহের মধ্যেই রহিয়াছেন–

"সা দেবী বায়বী শক্তিঃ" ইত্যাদি।

রুদ্রযামল।

গুরুপদেশে যিনি উক্তরূপে পরমাত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াছেন, তিনিই "মুদ্রাসাধক",–অপরে নহে। হায়! হায়! এরূপ উৎকৃষ্ট কার্য্য থাকিতে , আমরা কি ঘৃণিত কার্য্যেই রত হইতেছি!!! কিন্তু উহা বলিবারও জো নাই; কেননা, তাহা হইলেই আমি শাস্ত্রদ্বেষী ও অহিন্দু বলিয়া ঘোষিত হইব। ধিক্ আমার উপাসনায়,–ধিক্ আমার গুরুগিরিতে এবং ধিক্ আমার ধর্ম্ম আলোচনায়!!! নতুবা সাধনের এমন উৎকৃষ্ট অঙ্গ সকল থাকিতে এরূপ ঘৃণিত তামসিক আচার অনুষ্ঠিত হইবে কেন? চিরকালই কি এইরূপ রাজসিক ও তামসিক ভাবে পড়িয়া থাকিতে হইবে? তাহা হইতে কি আর উঠিতে হইবে না? চিরকালই কি এইরূপ ঘৃণিত ভাবে পড়িয়া থাকিতে হইবে? সাত্ত্বিক ভাবে কি কিছুতেই দৃষ্টি পড়িবে না? আমার ন্যায় এরূপ তমঃপ্রধান লোকের দ্বারাই ত তন্ত্র সকল কিম্ভুত কিমাকার ভাবে দাঁড়াইয়াছে এবং ধর্ম্মও লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। কাহারও মুখে সাত্ত্বিক ভাবের কথা পাওয়া যায় না। আমরা মোহান্ধ হইয়া রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া থাকি। কি ভ্রমেই আমরা পড়িয়াছি। কেহ দেখাইয়া দিলেও এই ভ্রম স্বীকার করি না; বরং যিনি ভ্রম দেখাইয়া দেন, তাঁহাকেই ভ্রান্ত বলিয়া উড়াইয়া দিই। প্রবৃত্তিশক্তির এমনি অপার মহিমা যে সামান্য সুখের লালসায় এইরূপ ঘৃণিত বিষয়কেও ঘৃণা না করিয়া বরং তাহারই সেবা করিতেছি; অথচ ইহাতে যে কাহার ক্ষতি হইতেছে, তাহা একবারও ভাবি না!!!

পঞ্চম মকার মৈথুন তত্ত্ব সম্বন্ধে শাস্ত্রে কোন উৎকৃষ্ট বিধি আছে কিনা, অধুনা তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। আগমসারে মৈথুনসাধকের যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহা দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে,আমরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া স্ব স্ব প্রবৃত্তির অনুযায়ী কার্য্য করিয়া শাস্ত্রকে কলঙ্কিত করিতেছি। সমাজের নেতার অভাবে যাঁহার যাহা ইচ্ছা, তিনি তাহাই করিতেছেন ও বলিতেছেন। যাঁহারা সমাজের নেতা, তাঁহারাও অর্থলোভের বশীভূত হইয়া, অর্থ এবং যশঃ প্রত্যাশায় ধর্ম্মকে অধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে ধর্ম্ম জ্ঞানে ব্যবস্থাদি দিয়া দেশকে ধর্ম্মশূন্য করিতে বসিয়াছেন। এখন প্রকৃত ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া অধর্ম্মকেই ধর্ম্ম জ্ঞানে তাহারই যাজন হইতেছে। হায়। কি পরিতাপের বিষয় যে; ইহা বলিবারও জো নাই!!! কিন্তু আমরা একবারও ভাবি না যে, যদি যোনিতে মৈথুন করাটাই ধর্ম্ম হয়, তাহা হইলে পশুত্বই ধর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে; অতএব অধর্ম্ম আর কাহাকে বলিব? আগমসারে উক্ত আছে-

মৈথুন পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্।

মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুন্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকারশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোনৌ স্থিতঃ প্রিয়ে।।
আকারহংসমারুহ্য একতাচ যদা ভবেৎ।
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম্।।
আত্মনি রমতে যস্মাদাত্মারামস্তদোচ্যতে।
অতএব রামনাম তারকং ব্রহ্ম নিশ্চিতম্।।
মৃত্যুকালে মহেশানি স্মরেদ্রামাক্ষরদ্বয়ম্।
সর্ব্বকর্ম্মাণি সংত্যজ্য স্বয়ং ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।।
ইদন্তু মৈথুনং তত্ত্বং তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।।
মৈথুনং পরমং তত্ত্বং তত্ত্বজ্ঞানস্য কারণম্।।
সর্ব্বপূজাময়ং তত্ত্বং জপাদীনাং ফলপ্রদম্।
ষড়ঙ্গঃ পূজয়েদ্দেবি সর্ব্বমন্ত্রঃ প্রসীদতি।।
আলিঙ্গনং ভবেন্ন্যাসং চুম্বনং ধ্যানমীরিতম।।
আবাহনং সীতকারং নৈবেদ্যমুপলেপনম্।।
জপনং রমণং প্রোক্তং রেতঃপাতশ্চ দক্ষিণা।
সর্ব্বথৈব ত্বয়া গোপ্যং মন প্রাণাধিকপ্রিয়ে।।

এই মৈথুনতত্ত্বই সৃষ্টিস্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। এই মৈথুন হইতে সিদ্ধি অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা হয় এবং সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই শরীরাভ্যান্তরে নাভিচক্রস্থিত কুন্ডমধ্যে কুঙ্কুমাভাস আরক্তবর্ণ রকারের (তেজস্তত্ত্বের) সহিত আকাররূপ হংস অর্থাৎ অজপারূপ শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা যখন আজ্ঞাচক্রস্থিত মহাযোনির (ব্রহ্মযোনির) মধ্যস্থিত বিন্দুস্বরূপ মকারের মিলন হয় অর্থাৎ উর্দ্ধে স্থিতিলাভ হয়, তখনই আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। উর্দ্ধে এইরূপ স্থিতিলাভ হইলে, যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাই রমণ করার নাম "রাম"। এই রাম নাম মুখে বলা যায় না। ইহাই "উল্টা রাম নাম"। এই উল্টা রাম নাম জপ করিয়া বাল্মীকি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তুলসী দাসের রামায়নেও ইহার উল্লেখ আছে, যথা—

উল্টা নাম জপৎ জগ্ জানা।
বাল্মীকি হুয়া ব্রহ্ম সমানা।।

কিন্তু আমরা রাম রাম হাজার হাজার বার করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান দূরে থাকুক, মনে একটুও শান্তি পাই না। ইহার কারণ এই যে, আমরা সদ্‌গুরু অভাবে সবই বিপরীত

ভাবে অনুষ্ঠান করিয়া থাকি।

মৈথুন-সাধক সহস্রারে আত্মাতে রমণ করিয়া থাকেন। একারণ রাম নামের অর্থ "তারক ব্রহ্ম"। ইহাতে আর সন্দেহ নাই। মৃত্যুকালে যাহাতে রাম নাম স্মরণ থাকে, এই উদ্দেশ্যে সর্ব্বদা গুরুপদেশে আত্মক্রিয়ায় রত থাকা উচিৎ। কেননা, সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি মৃত্যুকালে এইরূপ রাম নাম স্মরণ করেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মময় হইয়া থাকেন। এই আত্মতত্ত্বই সর্ব্ববিধ পূজা ও জপাদির ফলপ্রদান করিয়া থাকে।

গুরুপদেশে ষড়ঙ্গ যোগক্রিয়া দ্বারা মন্ত্র সকল প্রসন্ন অর্থাৎ চেতনাপ্রাপ্ত হয়। ষড়ঙ্গ যোগক্রিয়া গুরুপদেশগম্য। ন্যাস অর্থাৎ প্রাণায়াম দ্বারা হৃদয়ে বায়ুকে ধারণ করার নাম "আলিঙ্গন" এবং স্থিতিপদে মগ্ন হওয়ারূপ অবস্থার নাম "চুম্বন"। ইহাই ধ্যানাবস্থা এবং এই ধ্যান ১৭২৮ প্রাণায়মে হইয়া থাকে। কেবল রূপ কুম্ভকের অবস্থায় "আবাহন" হয়। এই আবাহনকেই "সীৎকার" বলে। এই প্রকার করিতে করিতে যে অমৃত ক্ষরণ হয়, তাহা সর্ব্বাঙ্গে মাখাই "নৈবেদ্য"। অজপারূপ জপক্রিয়াই "রমণ" এবং এই রূপ রমণ করিতে করিতে শ্বেতবর্ণ পারার ন্যায় "রেতঃ" অর্থাৎ "শিববীর্য্য" দৃষ্ট হয় এবং উহা দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তৃপ্তিরূপ আনন্দের উদয় হয়। ইহাই "রেতঃপাত" অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের অবস্থা। ইহাই "মৈথুন তত্ত্ব" এবং ইহা পার্ব্বতীকে মহাদেব সর্ব্বতোভাবে গোপন করিতে বলিয়াছেন। হায়! হায়! এমন সকল উৎকৃষ্ট সাত্ত্বিক কর্ম্ম থাকিতে আমরা প্রবৃত্তির দোষে রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মকে মোক্ষপ্রদ জ্ঞান করিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করিতেছি!!!

এইরূপে প্রায় সকল সম্প্রদায়েই সাত্ত্বিক কর্ম্মের অভাব দৃষ্ট হয়। সাত্ত্বিক কর্ম্মের অভাবে এমন সোনার ভারত আজ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইয়াছে!! যোগমার্গ পরিত্যাগ করাই ইহার একমাত্র কারণ। প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার অনুষ্ঠান ব্যতীত কেহ সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইতে পারে না। এক প্রাণায়ামাদি যোগক্রিয়ার অভাবে সাত্ত্বিকভাব লুপ্ত হওয়ায় দেশ রজস্তমঃপ্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রজস্তমো গুণের প্রাধান্যেই দেশে এত অশান্তি। আশু সুখের লালসাতেই আমরা এত কষ্ট ভোগ করিতেছি। প্রায় কাহারও অন্তরে সুখ নাই। কেবল চক্ষুকে হাসি হাসিয়া লোকের কাছে আপনাকে সুখী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি মাত্র। অন্তরে সুখের লেশমাত্রও নাই; সর্ব্বদাই ঘোর অশান্তি-বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্‌করিয়া বেড়াইতেছি। এ জ্বালা কিছুতেই যাইতেছে না এবং জ্বালা নিবারণের উপায়ও দেখিতেছি না। উপায় যে নাই, এমত নহে। কিন্তু হায়! উপায় দেখিবে কে?

আমি রজস্তমো মদে মত্ত হইয়া উন্মত্তবৎ আসুরিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মকেই সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া থাকি। যাঁহারা আমার উপদেষ্টা, তাঁহারাও

আমার মনোরঞ্জনার্থ আমাকে সাত্ত্বিক কর্ত্তা বলিয়া সম্বোধন করেন। মধ্যে মধ্যে দুই এক টাকা দিতে পারিলেই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, "আপনার ন্যায় ব্রহ্মনিষ্ঠ সাত্ত্বিক প্রকৃতির লোক আজকাল আর দেখা যায় না; যাহা কিছু সদ্গুণ, সে সকল আপনাতেই আছে; আপনার ন্যায় শিবতুল্য ব্যক্তি আর কোথায় পাইব"—ইত্যাকার নানাবিধ চাটুবাক্যে আমার ন্যায় বোকা চৈতন্যকে মজাইয়া অসার বাহ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতেছেন এবং আমিও দুই একটা বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বুদ্ধিমান জ্ঞানী ও ভক্ত ইত্যাদি নানারূপ উপাধিতে ভূষিত হইয়া, সকলকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, প্রকারান্তরে নিজের মহত্ত্বের পরিচয় দিয়া থাকি।

এ সকল যে কেবল আমারই দোষ, এমত নহে, কারণ, আমি প্রকৃত কর্ম্ম না জানায় এইরূপ উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারে বাহ্য রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে রত হই বলিয়াই আজ আমার এই অবস্থা। অন্তরে সুখ না থাকায় আমি নানারূপ দৈহিক ও মানসিক কষ্টে কোনরূপে দিন কাটাই মাত্র। আমার সুখের আশা করাও বাতুলতা মাত্র। কেননা আমি যে সকল বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছি, সে সকল রাজসিক বা তামসিক। রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মের ফল পরিণামে বিষতুল্য। সুতরাং আমাকে বিষময় ফলভোগ করিতেই হইবে। এই বিষময় ফলে দেশের কোথাও বা দুর্ভিক্ষ, কোথাও বা মহামারী অকালমৃত্যু ইত্যাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয়। চতুর্দ্দিকে হাহাকার ব্যতীত আর কিছুই শুনা যায় না।

এই সকল উৎপাত নিবারণের উপায় থাকিতেও কাহারও তাহার প্রতি লক্ষ্য নাই। শাস্ত্রেই সেই সকল উপায় রহিয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাহা দ্বারা পরমানন্দ ও পরমা গতি লাভ হইবে, আমরা তাহাকেই পরিত্যাগ করিয়া বিষয়ে আসক্ত হই। অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে অষ্টাদশ গীতা রহিয়াছে এবং এই সকল গীতার মধ্যে যোগ-বিষয়ক সাত্ত্বিক কর্ম্মের এমন সকল উপদেশ আছে যে, তদ্দ্বারা জীবের ব্রহ্মানন্দ ও পরমা গতি লাভ হয়। সেই সকল গীতাতে কর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান সমস্তই বিশদরূপে বর্ণিত আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পুরাণোক্ত যোগোপদেশ ও কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া, আমি ঐ সকল পুরাণোক্ত দেবগণের আচার ব্যবহার গল্পের ন্যায় শ্রবণ করিয়া থাকি মাত্র; সুতরাং বিপরীত ফলও পাইয়া থাকি। বিপরীত ফল ফলিবার কারণ, এই যে, দেবগণের কার্য্য ও আচার-ব্যবহার বাহ্য চক্ষে দেখিতে গেলে, নানা প্রকার সংশয় উপস্থিত হয় এবং দেবগণকে সামান্য মানবের ন্যায় বোধ হইয়া থাকে। এরূপ দৃষ্টান্ত আজ কাল বিরল নহে। ইহাতে দেবচরিত্রে কলঙ্কের আরোপ করা হয় মাত্র, আর কিছুই নহে।

যোগমার্গ অবলম্বন ব্যতীত কিছুতেই পুরাণের গূঢ় তাৎপর্য্য বা রহস্য অবগত হইতে পারা যায় না। যাঁহারা পুরাণাদি পাঠ করিয়া সাধারণকে শ্রবণ করান, তাঁহারা

এরূপ ঘৃণিতভাবে কথকতা করেন যে, তাহা শুনিবারও অযোগ্য। কিন্তু এক কালে রাজা পরীক্ষিৎ, শুকদেবের নিকট এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া শান্তিলাভ করিতেছি না। হায়! কি পরিতাপের বিষয়, সেই পুরাণ লক্ষ লক্ষ স্থানে পাঠ হইতেছে, অথচ কাহারও ত শান্তিলাভ হইতেছে না!!! শান্তির পরিবর্ত্তে বরং অশান্তির বৃদ্ধিই দেখা যায়। যে পুরাণ শ্রবণ করিয়া পরীক্ষিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন, আমি সেই পুরাণ শ্রবণ করিয়াও, শান্তিলাভ করা দূরে থাকুক্, অশান্তির জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছি। পরীক্ষিৎ যে পুরাণ শ্রবণ করিয়াছিলেন, আমি কি তবে তাহা শ্রবণ করিতেছি না? যদি সেই পুরাণই হয়, তাহা হইলে শান্তির স্থলে আমার অশান্তি লাভ হয় কেন? ইহাই একমাত্র কারণ এই যে, উপস্থিত কালে যাঁহারা পুরাণাদি পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কেহই যোগী নহেন। যোগী ব্যতীত কেহই পুরাণাদি শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য সম্যক্ অবগত হইতে পারে না। ইহাতে নিম্নবর্ণিত গল্পটি মনে পড়িয়া গেল।

বন্ধন ও মুক্তি



কোন দেশে প্রবল পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। তাঁহার কোন প্রকার ঐশ্বর্য্যের অভাব না থাকিলেও তাহা হইতে তিনি কিছুমাত্র তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া দিন দিন বরং বিষয়রূপ বিষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছিলেন। একদা সেই রাজা তাঁহার সভাস্থ পন্ডিত মন্ডলীকে নিজ মনের ভাব জ্ঞাপন করিয়া, কি উপায় অবলম্বন করিলে শান্তিলাভ হইবে, তাঁহাদিগকে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। সভাস্থ পন্ডিতগণ সকলেই একবাক্যে রাজাকে ব্রত, পূজা, জপ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, পুরশ্চরণ ইত্যাদি নানা প্রকার পুরাণ নির্দ্দিষ্ট মাঙ্গলিক কাম্য কর্ম্ম করিতে উপদেশ প্রদান করিলেন এবং কহিলেন,—"মহারাজ! শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে এই সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে অবশ্যই আপনার শান্তিলাভ হইবে।" রাজা কালবিলম্ব না করিয়া সভাস্থ ব্রাহ্মণপন্ডিতগণের উপদেশ অনুসারে ঐ সমস্ত কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এইরূপে বহু দিবস ধরিয়া ঐ সকল কার্য্য করিয়াও রাজা কোনরূপ শান্তি না পাইয়া, বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন; কিন্তু স্বয়ং কোন উপায় উদ্ভাবন করিতে না পারিয়া, স্বীয় কুলগুরুকে স্বগৃহে আনয়ন করাইয়া এই দুর্ব্বিষহ অশান্তির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন এবং একান্ত কাতর ভাবে কহিলেন,—'দেব! আমি ব্রাহ্মণপন্ডিতগণের কথামত যাগ, যজ্ঞ, শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, বার, ব্রত নিয়মাদি করিয়াও কিছুমাত্র শান্তি পাইলাম না, বরং

শান্তির স্থলে অশান্তির আধিক্যই দেখিতেছি। আমার শরীর ও মন অশান্তির জ্বালায় দগ্ধ হইতেছে। পরন্তু, পন্ডিতগণ সভাস্থলে আমাকে ধন্য করিয়া যখন বলেন,—"মহারাজ বড় সাত্ত্বিক-প্রকৃতি এবং অদ্বিতীয় ধার্ম্মিক ও সদাশয়, —শান্তি যেন মহারাজের দাসী হইয়া মহারাজের অঙ্গশোভা পরিবর্দ্ধিত করিতেছে; মহারাজের ন্যায় দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি আর কুত্রাপি কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় না" ঐ সকল বাক্যে আমার আরও অর্ন্তদাহ হইয়া অন্তরে অসহ্য কষ্ট উপস্থিত হয়। মানাপমান বোধ থাকায়, পাছে লোকে আমায় ঘৃণা করে, এই আশঙ্কায় মনের কথা ব্যক্ত করিতেও পারি না। সুতরাং ঘাড় হেঁট করিয়া নীরবে ঐসকল বাক্য শুনিয়া যাই মাত্র। আমি ঐ সকল চাটুকার অহম্মুখগণকে যথোচিত দন্ড দিতে পারি। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়েই কেবল তাহা পারি নাই। গুরো! এক্ষণে আমার উপায় কি? আমি আপনার শরণাগত; যাহাতে আমার অশান্তি দূর হইয়া কিঞ্চিন্মাত্র শান্তিলাভ হয়, আপনি তাহার উপায় বিধান করুন। আমি আপনার শিষ্য,— পুত্রতুল্য; আমার এই জ্বালা নিবারণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

মহারাজের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, গুরু তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্ব্বক বলিলেন, —'মহারাজ! আপনি পুরাণ শ্রবণ করুন; পুরাণোক্ত ভগবৎ কথা শ্রবণ করিলে, নিশ্চয়ই আপনার শান্তি লাভ হইবে। এক কালে রাজা পরীক্ষিৎ এই পুরাণ শ্রবণ করিয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আপনারও তাহাই হইবে। আমি স্বয়ং সেই পুরাণ পাঠ করিব এবং যাহাতে আপনার শান্তিলাভ হয়, প্রাণপণে তাহার চেষ্টা করিয়া আপনাকে শান্তি প্রদান করিব।"

গুরুদেবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহারাজ পুলকিত হৃদয়ে গুরুদেবকে দন্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং কিরূপ আয়োজন করিতে হইবে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, রাজগুরু যথাশাস্ত্র ব্যবস্থাপত্র প্রস্তুত করিলেন এবং শুভদিন স্থির করিয়া মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজও সেই ব্যবস্থাপত্র তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে প্রদানপূর্ব্বক কহিলেন,— "অমুক দিন হইতে পুরাণপাঠ কার্য্য আরম্ভ হইবে এবং গুরুদেব স্বয়ং পুরাণ পাঠ করিয়া আমাকে শুনাইবেন;—অতএব ব্যবস্থাপত্র অনুসারে নির্দ্দিষ্ট দিনে যেন সমস্ত দ্রব্যাদি প্রস্তুত থাকে।" মন্ত্রীও এই কথা শুনিয়া 'যে আজ্ঞা' বলিয়া মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া যথাসময়ে সমস্ত ঠিক করিয়া রাখিলেন।

নির্দ্দিষ্ট শুভদিন আগত হইলে— যথাসময়ে শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুরাণ পাঠ কার্য্য আরম্ভ হইল। গুরুদেব নিত্য কথকতা দ্বারা মহারাজকে পুরাণ শুনাইতে লাগিলেন, এইরূপে প্রায় ছয় মাসে পুরাণ পাঠ সমাপ্ত হইলে, মহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন,— "গুরুদেব, আমি পুরাণ শ্রবণ করিয়াও কিছুমাত্র শান্তিলাভ করিতে পারি নাই। পূর্ব্বে

আমার সে অশান্তি ছিল, এক্ষণে তাহার অনুমাত্র হ্রাস হয় নাই; বরং আপনার মুখে ভগবল্লীলা শ্রবণ করিয়া আরও সংশয় বৃদ্ধি হইয়াছে। যাহা হউক আপনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে, পুরাণ শ্রবণ করিলে নিশ্চয়ই আমার শান্তি লাভ হইবে; কিন্তু কৈ তাহা ত আমার হইল না; এক্ষণে অশান্তিতে আমার অর্ন্তদাহ হইতেছে,–আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। এত অর্থ ব্যয় করিলাম, শারীরিক কষ্ট সহ্য করিলাম, আপনারা যাহা যাহা বলিলেন তৎসমুদায়ই প্রাণপণে পালন করিলাম; অথচ শান্তিলাভ হইল না। অতএব এখন আর ব্রাহ্মণ বা গুরু বলিয়া মানিব না; যদি আপনি এক সপ্তাহের মধ্যে আমার শান্তি লাভের উপায় করিতে না পারেন; তাহা হইলে অদ্য হইতে যেদিন সপ্তাহ পূর্ণ হইবে, তৎপরদিবস প্রভাতে আপনাকে সবংশে বিনাশ করিব; অদ্য আপনি বাটী যাউন।"

মহারাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুর মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল। তাঁহার পা আর চলে না,– চক্ষুতে যেন আর দৃষ্টিশক্তি নাই; তবে কোন গতিকে লোক সাহায্যে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন। বাটীতে আসিয়াই একটা ঘরের মধ্যে শবের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। কাহারও সহিত কথা কহিতেছেন না,– কথা কহিবার শক্তিও যেন হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। তাঁহার গাত্রে ও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম হইতেছে। ব্রাহ্মণ রাজগুরু;সুতরাং তাঁহার দাস-দাসীর অপ্রতুল নাই। ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্র সন্তান; কিন্তু তিনিও পাগল। পুত্র বাটীতে প্রায় থাকেন না; কেবল আহারের সময় এক এক বার বাটীতে আসিয়া জননীর নিকট হইতে কিছু খাইয়া, বাটী হইতে পলাইয়া যান। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কেবল আবল তাবল বকিয়া উড়াইয়া দেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্রবধূ বাটীতেই আছেন। তাঁহার কোলে একটি মাত্র শিশু পুত্র। শিশুটির বয়স ৪।৫ বৎসর হইবে। পুত্রবধূটি দেখিতে শুনিতে মন্দ নহেন। ভাল না বলিয়া 'মন্দ নহেন' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, বধূঠাকুরাণী আজ কালের বধূঠাকুরাণীদিগের মতন ভাল নহেন, এবং হাটে-বাজারের বা বঙ্গসাহিত্যের পুস্তকে বর্ণিত কেবলমাত্র মাকাল ফলের ন্যায় বাহ্য সৌন্দর্য্যে সুন্দরীও নহেন। ইনি গৃহস্থের গৃহলক্ষ্মীরূপা, অতিথির পক্ষে মা অন্নপূর্ণাস্বরূপা, দাস-দাসীদিগের পক্ষে জননীরূপা, পতিপ্রাণাদিগের মধ্যে কাত্যায়নীরূপা, সুন্দরীদিগের মধ্যে শ্রীরূপা এবং জননীদিগের মধ্যে গণেশজননীতুল্যা। তাই বলা হইয়াছে যে, ইনি আজকালের 'ভাল' নহেন। আজকাল সবই ইহার বিপরীত। যাহা হউক, পুত্রবধূ শিশুপুত্রটিকে ক্রোড়ে করিয়া শাশুড়ী ঠাকুরাণীর পার্শ্বে বসিয়া শ্বশুরকেব্যজন করিতেছেন।

শ্বশুরের তথাবিধ অবস্থা দর্শনে তিনি ভয় পাইয়াছেন; কিন্তু মুখে একটি কথা

নাই; কারণ, ইনি আজকালের বউ-ঝির মতন চপলা নহেন। শাশুড়ী ঠাকুরাণী উপস্থিত থাকিতে কোন কথা বলা উচিত নয় বোধে কেবল শাশুড়ী ঠাকুরাণীর আজ্ঞা পালন করিবার মানসে বসিয়া বাতাস করিতেছেন। আর শ্বশ্রূঠাকুরাণী যখন যাহা করিতে বলিতেছেন, তন্মুহূর্ত্তে তাহা করিতেছেন। পুত্র বাটীতে নাই, কোথায় গিয়াছেন, তাহাও কেহ জানে না। জানিলে ডাকাইয়া আনা হইত। সুতরাং ডাকা হয় নাই। আর তিনি পাগল,—তাঁহাকে ডাকিলেই বা কি হইবে? পাগলের দ্বারা আর কি উপকার হইতে পারে? সকলে কপালে হাত দিয়া বসিয়া নীরবে রোদন করিতেছেন; আর ব্রাহ্মণকে বাতাস করিতেছেন। ব্রাহ্মণ চৈতন্যরহিত শবের ন্যায় পড়িয়া আছেন, আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমন সময়ে পুত্র বাটী আসিলেন। বাটীতে আসিয়া 'মা' 'মা' শব্দ করিয়া মাকে ডাকিতে লাগিলেন; আর বলিতে লাগিলেন,—"মা, আমার বড়ই ক্ষুধাবোধ হইয়াছে; আমাকে কিছু খাইতে দাও।"

মাতা পুত্রের সাড়া পাইয়া বাহিরে আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"বাবা! আজ বাড়ীতে বড় বিপদ; কর্ত্তা রাজবাড়ী থেকে এসে অচৈতন্যবৎ প'ড়ে আছেন; আর মধ্যে মধ্যে দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ছেন। শুনলাম, রাজা রাজসভায় কি না কি বলেছেন,—তাই শুনে অবধি কর্ত্তা এইরূপ হয়েছেন। আমরা কিছুতেই তাঁর চৈতন্য কর্‌তে পারিনি। বাবা! আজ আমাদের যে কি বিপদ হয়েছে, যদি তোমার জ্ঞান থাক্‌তো, তাহ'লে তুমিও এতক্ষণ কত কাতর হ'য়ে তোমার জনকের সেবায় নিযুক্ত হ'তে।"

মাতার কথা শুনিয়া পুত্র কহিলেন,—"মা! বিপদ কি মা? বিপদ কাকে বলে মা? কার বিপদ হয়েছে মা? মা! আমার ক্ষিধে পেয়েছে মা; কি খেতে দিবি মা,—খেতে দে। বিপদ আবার কি মা? বিপদে কি করে মা? বিপদ বড় ভাল,—মা বিপদ যেন সর্ব্বদা হয়।"

মাতা। "আঃ! হা বিধাতঃ! হা আমার পোড়া কপাল! বাবা, তুমি পাগল না হলে আর এমন কথা বল—"বিপদ বড় ভাল! বিপদ আমার সর্ব্বদা থাকুক!" বাবা, অমন কথা বল্‌তে নাই, —বিপদের মত আপদ আর সংসারে নাই; বিপদ যেন পরম শত্রুরও না হয়! বাবা! তোমায় আজ কি খেতে দিব? আজ ত রান্না বান্না কিছুই হয় নাই। বউমাও আজ রান্না ঘরে যান্‌নি। বাড়ীশুদ্ধ সকলেই কর্ত্তার জন্য কাতর হয়েছে,—কর্ত্তা ভাল না হলে আমরা রান্না বান্না আর কিছুই ক'রব না।"

মাতার নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুত্র দ্রুতপদে পিতার নিকট গিয়া পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া, পিতাকে ডাকিতে লাগিলেন এবং বলিলেন,—"বাবা! আপনি উঠুন। রাজবাটীতে কি হইয়াছে এবং তাহার জন্য এত ভাবনা কেন? আমি সব মীমাংসা করিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ জড়বৎ পড়িয়া থাকিলেও পুত্রের কথা শুনিয়া প্রীত হইয়া বলিলেন,– "বাবা গোপাল! কি বলিতেছ? তুমি আমার পাগল গোপাল। আমার যে বিপদ হইয়াছে, তাহা আমার এক্‌লার নহে,–তাহা তোমার আর এই পরিবারবর্গের সকলেরই। অদ্য মহারাজের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহা হৃদয়বিদারক শূলবৎ কঠোর। ওঃ! আর সহ্য হয় না,– আর বলিতে পারি না,– হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে!! আমার নিজ পাপের দোষে বাবা, তোমরা সকলেই রাজার কোপানলে পড়িয়াছ। রাজা অদ্য হইতে সপ্তাহের পরদিবস প্রভাতে আমার পরিবারবর্গের মস্তক ছেদন করাইয়া তৎপরে আমার মস্তক ছেদন করাইবেন। হা বিধাতা! এই বাক্য শ্রবণমাত্রেই কেন আমার প্রাণ বিয়োগ হইল না! এখনও কেন দেহ রহিয়াছে!!"

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া, পুত্র পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,–"রাজা কি বিনা অপরাধে এই দন্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন? না ইহার কোন কারণ আছে?"

পিতা পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,–"বাবা ইহার কারণ অবশ্য আছে; কিন্তু তাহা আর তোমায় বলিয়া কি করিব। তুমি যদি আমার পাগল না হইতে, তাহা হইলে বলিতাম। আর পাগল না হইলেই বা তুমি কি করিতে? আমিই যখন কিছু করিতে পারিলাম না তখন পাগল না হইলেই বা তুমি আর কি করিতে? ভাল, তোমাদের যখন শুনিবার ইচ্ছা হইয়াছে,তখন শ্রবণ কর;–

"পূর্ব্বে শান্তি লাভের ইচ্ছায় রাজা অপরাপর ব্রাহ্মণপন্ডিতের উপদেশে নানাপ্রকার যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া, বিফল মনোরথ হইয়া, চিন্তাকুলচিত্তে সমস্ত ঘটনা আমায় আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাপন করেন। তাহা শ্রবণ করিয়া, রাজার দুঃখে দুঃখিত হইয়া, রাজার মনে শান্তি উৎপাদন করাইবার মানসে, আমি রাজাকে পুরাণ শ্রবণের উপদেশ করি। মনে করিয়াছিলাম, পুরাণ শ্রবণে রাজার মনে শান্তি হইবে এবং আমারও দশ টাকা লাভ হইবে। কোন গতিক করিয়া রাজাকে বুঝাইযা দিয়া বেশ দশ টাকা লাভ করিব। কিন্তু দেখিতেছি তাহার ফল বিপরীত হইল–"লাভঃ পরং গোবধঃ।"

"পুরাণ শ্রবণে রাজার শান্তি হইল না। কিসে যে রাজার শান্তি হইবে, তাহাও বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না। রাজাকে শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকান্ড সবই করান হইয়াছে,–কিছুতেই তাঁহার শান্তিলাভ হয় নাই; আর কিসে যে হইবে, তাহাও জানি না। রাজ-পরিবারদিগের নিকট প্রায় মধ্যে মধ্যে পুরাণ পাঠ করিয়া শ্রবণ করাইয়া থাকি। তাঁহারা সকলেই বেশ আনন্দ প্রকাশ করেন এবং আমার পুরাণ পাঠের বেশ যশঃ আছে। কিন্তু এমন ঘোর মহাবিপদে ত কখনও পড়ি নাই। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের উপায়ও আর দেখিতেছি না। রাজা যেরূপ বুদ্ধিমান্ তাহাতে তাঁহার নিকট কোন ফাঁকিও চলিবে না, তিনি আর কোন

ব্যবস্থাও মানিবেন না। তাঁহাকে ইহাও বলিয়াছি যে, এই সকল কর্ম্মের দ্বারা আপনার পরকালে শান্তি হইবে। ইহাতে তিনি বলেন যে, ইহকালেই যদি আমার মনের শান্তি না হইল, তাহা হইলে, পরকালে যে হইবে, তাহাতে বিশ্বাস কি? যাহার ইহকালে শান্তি নাই, তাহার পরকালেও শান্তি নাই, শাস্ত্রে যাহা যাহা লিখিত আছে, আমায় বোধ হয়, সে সকলের কিছুই ভুল নহে, তবে আপনারা তৎসমুদায়ের মর্ম্ম অবগত নহেন। আপনারা কেবল লোক ভুলাইয়া ও স্ত্রীজাতি ভুলাইয়া নিজের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শাস্ত্রীয় বচন আওড়াইয়া থাকেন এবং স্ত্রীলোকের ন্যায় পুরুষদিগকেও পরকালে (ইহকালে নহে) স্বর্গসুখের প্রলোভন দেখাইয়া, নানারূপ কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইয়া অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন মাত্র;—আর কিছুই নহে।

"বাবা গোপাল! রাজা এইরূপ সব কথা বলিয়া থাকেন। বাবা, এই সকল কর্ম্ম করাইয়া মাথার চুল পাকিয়া গেল; কিন্তু এরূপ ভাবের কথা কেহ কখনও বলা দূরে থাকুক আমি কর্ণেও শুনি নাই। বরং সাধারণের নিকট হইতে মান সম্ভ্রমই পাইয়া আসিতেছি। এ রূপ বিপদে ত কখনও পড়ি নাই। জীবনের আশা আর কাহারও নাই। রাজার যেরূপ কোপ, তাহাতে বোধ হয় তিনি তাঁহার রাজত্বের মধ্যে আমার ন্যায় ব্রাহ্মণপন্ডিতের বংশ সমূলে নির্ব্বংশ করিবেন। ওঃ! আর আমি বলিতে পারি না। আমার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে এবং আমি চক্ষে চতুর্দ্দিকেই যেন সরিষা ফুল দেখিতেছি। বাবা গোপাল! একবার আমার কোলে আয়। বাবা, তুমি আমার একমাত্র পাগল পুত্র। এবার বুঝি আমার বুদ্ধির দোষে আমার জীবনের সহিত তোমাদের সকলকেই হারাইলাম। হা বিধাতঃ! হা ভগবান! আমি জন্মান্তরে কতই পাপ করিয়াছিলাম যে, আমায় রাজদন্ডে—অপঘাতে প্রাণ হারাইতে হইল!! হা জগদীশ! রক্ষা কর। তুমি ব্যতীত আর উপায় নাই।"

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ শোকে একান্ত আকুল হইয়া একেবারে মৃতের ন্যায় নীরব হইয়া রহিলেন।

ব্রাহ্মণের এই অবস্থা দেখিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ ব্যতীত আর আর সকলেই উচ্চরবে কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রবধূ নীরবে বসিয়া এক হস্তে শ্বশুর ঠাকুরকে বাতাস করিতেছেন ও এক হস্তে মস্তকের কাপড় টানিয়া লজ্জা নিবারণ করিতেছেন এবং মধ্যে মধ্যে একবার নিজপতির মুখাবলোকন করিতেছেন। আবার ক্ষণকাল পরে অবনত মস্তকে শ্বশুরঠাকুরের চরণ দর্শণ করিতেছেন। পতিব্রতা পতিপ্রাণা সতীর অন্তরে কোনরূপ শোক বা ভয়ের উদয় হয় নাই; কারণ পতিব্রতা জানেন যে, পতিব্রতার কোনওরূপ বিপদ হইতে পারে না। সুতরাং পতিব্রতার বদনেও কোনরূপ শোক বা ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ পায় নাই। বরং প্রশান্ত ও প্রফুল্ল বদনই বোধ হইতেছে। পতিব্রতার মুখমন্ডল পূর্ণিমার শশীর ন্যায় প্রফুল্ল

ও প্রশান্ত নহে। কেননা, চন্দ্রে কলঙ্কের চিহ্ন আছে,—পতিব্রতার তাহা নাই। সুতরাং পূর্ণিমার শশীর সহিত পতিব্রতার বদনের তুলনা হইতে পারে না। বিশেষতঃ চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি আছে,—হ্রাসবৃদ্ধি থাকিতে প্রকৃষ্টরূপ শান্তি হয় না। স্থিতিব্যতীত শান্তি সম্ভবে না। সুতরাং পূর্ণিমার শশীকেও প্রফুল্ল বা প্রশান্ত বলা যাইতে পারে না। পদ্মিনী যেমন নিজ পতির প্রকাশে প্রফুল্লহৃদয়ে প্রস্ফুটিত হয়, নিজ স্বামীকে সম্মুখে দেখিয়া পতিব্রতার বদনকমল ও তদ্রূপ প্রস্ফুটিত ও প্রফুল্ল হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হইবার অব্যবহতি পূর্ব্বেই যে অবস্থা হয়, তাহাই প্রফুল্ল। চন্দ্রের যেমন হ্রাসবৃদ্ধি আছে, দেহেরও তদ্রূপ হ্রাসবৃদ্ধি আছে। দেহাভিমান অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞান যতকাল থাকে, দেহের হ্রাসবৃদ্ধিও ততকাল থাকে। দেহাভিমান থাকিতে প্রকৃত প্রস্তাবে শান্তি হওয়া অসম্ভব। কেননা, দেহাভিমান থাকিতে রিপুকুল দমিত হয় না এবং রিপুদমন ব্যতীত প্রকৃত শান্তিও হয় না। কিন্তু পরিব্রতা নিজ পতিতে তন্ময় হওয়ায় তিনি দেহে আসক্ত নহেন। তাঁহার মনোদর্পণে পতির রূপ ব্যতীত আর কোন বিষয় প্রতিফলিত হয় না। সুতরাং অন্তর সর্ব্বদা শান্তিপূর্ণ এবং সেই শান্তি তদীয় বদনে প্রকাশিত হওয়ায় তাঁহার বদনও সর্ব্বদা প্রশান্ত ও প্রসন্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পুত্র ও পুত্রবধূ ব্যতীত আর আর সকলেই শোকাচ্ছন্ন। পুত্র সকলকেই কাতর দেখিয়া মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা! বিপদে ধৈর্য্য অবলম্বন করা উচিত। তুমি একটু স্থির হও, কোন ভয় নাই,—আমি উপায় করিতেছি।"

মা পুত্রের বাক্য শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা গোপাল! তুমি কি উপায় ক'রবে? বাবা, তুমি যে আমার পাগল,—তোমার কথায় যে বাবা ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারি না। বাবা! আমার যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত!! আমি পতির সহিত তোমাকেও হারাব!! রাজা যদি আমার জীবন নিয়ে তোমাদের জীবন দান করেন, তা হ'লে, আমি আমাকে ধন্য ও পরম সুখী মনে করব। বাবা! তুমি গিয়া রাজাকে আমার এই কথা বল, কিংবা চল, আমিও তোমার সঙ্গে গিয়া রাজার কাছে আমার জীবন দিয়া তোমাদের জীবন ভিক্ষা করি।"

পুত্র বলিলেন,—"মা! তুমি কেন এত ব্যস্ত হইতেছ? আমাদের কিছুই ত হয় নাই। মা! সর্ব্বনাশ ত আমাদের এখনও হয় নাই, সর্ব্বনাশ না হইলে কাহারও ভাল হয় না; সর্ব্বনাশ জীবমাত্রেরই প্রার্থনীয়। মা! তুমি আশীর্ব্বাদ কর, সর্ব্বনাশ যেন সকলেরই শীঘ্র হয়। মা! গুরুকৃপা ব্যতীত সর্ব্বনাশ হয় না এবং সর্ব্বনাশ না হইলেও ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না।"

মা। বাবা, সাধে কি আমি তোমায় পাগল বলি? পাগল না হ'লে কি আর তুমি

বল যে সর্ব্বনাশ প্রার্থনীয়। বাবা! বাবা! সর্ব্বনাশ যদি হ'ল, বা হ'লে আর কি নিয়ে সংসারে থাকব?

গোপাল। মা! সংসারে কাহার কি আছে মা!!

মা। কেন, সকলকারই সব আছে,—ঘর বাড়ী, টাকা কড়ি; কন্যা পুত্র সবই আছে। এইত আমারই সব রয়েছে।

গোপাল। আচ্ছা মা! তোমারই যদি এই সব হয়, তাহা হইলে, তুমি কোথাও যাইলে, এই সব লইয়া যাইতেও পার?

মা। তা আর পারি না? আমি যখন যেখানে যা'ব, সেইখানেই নিয়ে যেতে পারি।

গোপাল। আচ্ছা মা! তুমি যখন মরিয়া যাইবে, তখন এই সব জিনিষপত্রের সহিত আমাদেরও লইয়া যাইবে? তবে আর এত ভাবনা বা চিন্তা কেন?

মা। আমার পোড়া কপাল! তা কি কেউ ম'রে গেলে, জিনিষপত্র সঙ্গে নিয়ে যেতে পারে? তা কেউই পারে না। বাবা! তা হ'লে আর ভাবনা কিসের!!

গোপাল। তবে মা, কেমন করিয়া বলিলে যে, এসব "আমার"? তা হ'লে বল যে এসব "আমার" নহে।

মা। বাবা, তা কি বল্‌তে পারি? যতক্ষণ না মরব, ততক্ষণ বল্‌ব "আমার"; জীবদ্দশায় বল্‌তে পারব না যে, "আমার" নয়।

গোপাল। মা! এই "আমার" বোধ থাকিতে কাহারও সর্ব্বনাশ হয় না। এই "আমার" যে অবস্থায় যায়, তাহাই সর্ব্বনাশের অবস্থা। সেই অবস্থায় স্থিতিলাভ করিতে পারিলেই ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ইহা জীবদ্দশাতেই গুরুকৃপায় সাধন দ্বারা লাভ করা যায়,—তদ্ব্যতীত কিছুতেই লাভ করা যায় না।

মা। বাবা গোপাল! তুই ত বালককাল থেকে লেখা পড়া কিছুই করিস্ নাই,- বাবা, তুই এত কথা কোথা থেকে পেয়েছিস্। তোর কথা শুনে আমার বোধ হচ্ছে। তুই ত পাগল নয়। তোর মুখের কথা শুনে আমার বোধ হচ্ছে, তুই পাগল-বেশে আমাদের ছলনা করিস্ মাত্র। বাবা। তুই সত্য করে বল্ —তুই কে?

গোপাল। মা, আমি তোর পাগল গোপাল, —আমার ক্ষিধে পেয়েছে—মা, কিছু খেতে দে মা।

মা। কি খেতে দিব বাবা? খাবার ত কিছু ত'য়েরি নাই। কর্ত্তা একটু চৈতন্য লাভ করলেই তোমাকে খাবার তৈয়ারী ক'রে দিব।

গোপাল দেখিলেন যে, মা একটু স্থির হইয়াছেন। মার কাতরতা একটু কম দেখিয়া, তিনি পিতার নিকট গিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বাপেক্ষা পিতা যেন কিয়ৎপরিমাণে

প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন এবং তিনি মধ্যে মধ্যে এক আধ্‌বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। গোপাল এই সময়ে পিতাকে বলিলেন,—"বাবা, আপনি উঠুন্ এবং মুখ হাত পা ধুইয়া একটু জল খান; আপনি জল না খাইলে, কেহ কিছু খাইতে পাইতেছে না। চিন্তার বিষয় কিছুই নাই --আপনি রাজাকে বলিবেন যে, আমি তাঁহার শান্তির উপায় বলিয়া দিব।"

ব্রাহ্মণ স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া বলিলেন,—"কে আমায় বলিল,– রাজাকে শান্তির উপায় বলিয়া দিব?"

পুত্র সম্মুখেই ছিলেন; তিনি বলিলেন,– "বাবা, আমি বলিতেছিলাম যে, আমি রাজাকে শান্তির উপায় বলিয়া দিব। আপনি উঠিয়া হাতে পায়ে জল দিয়া কিঞ্চিৎ ভোজন করুন; আপনি কিছু না খাইলে, কেহই কিছু খাইতে পাইতেছে না।"

ব্রাহ্মণ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় ছিলেন; সুতরাং এই কথাগুলি শুনিয়া মনে করিলেন, যেন স্বপ্নাবস্থায় দৈববাণী শুনিতেছেন। কিন্তু যখন জানিলেন যে, তাহা স্বপ্নাদেশ বা দৈববাণী নহে, —উহা তাঁহার পাগল পুত্রের কথা, —তখন হতাশ হইয়া পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,– "বাবা গোপাল! তুমি এ অসম্ভব কথা কেন বলিতেছ? বাবা, তুমি শাস্ত্রাদি কিছুই পাঠ কর নাই; আমি অনেক যত্ন করিয়াও তোমাকে একটা শ্লোকও অভ্যাস করাইতে পারি নাই; তোমার শাস্ত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই নাই। আমি এত শাস্ত্র পাঠ করিয়াও যখন রাজার শান্তি উৎপাদন করিতে পারিলাম না, তখন তুমি শাস্ত্রাদি পাঠ না করিয়া কি প্রকারে তাঁহার শান্তি লাভের উপায় করিয়া দিবে? ইহা ত বুঝিতে পারিতেছি না!! বাবা, তুমি পাগল, তাই এ কথা বলিতেছ। ইহা পাগলের উক্তি মাত্র—আর কিছুই নহে।"

পুত্র পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,–"বাবা! এখনও ত এক সপ্তাহ কাল সময় আছে; আপনি না হয় অদ্যই রাজাকে বলিয়া আসুন যে, আমার পুত্র অদ্যই আপনাকে শান্তিলাভের উপায় বলিয়া দিবে; কিন্তু আমার পুত্র যাহা বলিবে ও করিবে, তাহাতে আপনি শেষ পর্য্যন্ত কোন কথাই বলিতে পারিবেন না; তাহার যদি কোন দ্রব্যের আবশ্যক হয়, তাহাও আপনি তাহাকে দিবেন; যদি না দেন, তাহা হইলে সে তাহা লইয়া যাইবে। আমি অদ্য বৈকালে পুত্রকে আপনার নিকট লইয়া আসিব। আপনি রাজাকে এই সকল কথা বলিয়া আসিলে, আমি অদ্যই আপনার সাথে রাজার নিকট যাইয়া, যদি তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে না পারি, তাহা হইলে, না হয় আপনি কল্য হইতে আবার এরূপ পড়িয়া থাকিবেন। আজ আপনি আমার কথায় বিশ্বাস করিয়া দেখুন, কি হয়।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

ব্রাহ্মণী সেই খানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের কথা সমর্থন করিয়া কর্ত্তাকে বলিতে লাগিলেন– "গোপাল যখন বল্‌ছে, তখন দেখতেই বা দোষ কি? এখনও ত সাত দিন সময় আছে। গোপালের কথায় না হয় একদিন চেষ্টাই করলে,–তাহাতে আর দোষ কি? বিপদে পড়লে লোকে যে কত রকম চেষ্টা করে; সকল চেষ্টাই কি সফল হয়? চেষ্টা ত কিছু করতে হবে; না হয় আজকের মতন গোপাল যা বল্‌ছে, তাই বা করলে; তা'তে আর ক্ষতি কি? আমার আজ গোপালের কথা শুনে গোপালকে আর পাগল বলে বিশ্বাস হচ্ছে না। বোধ হয়, গোপাল পাগ্‌লামি ক'রে আমাদের ছলনা ক'রে থাকে।"

কর্ত্তা এই সকল কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিলেন, –"তুমি পুত্রস্নেহে মুগ্ধ হইয়া, এই অন্তিমকালে ঐরূপ বলিতেছ। যাহাই হউক, আমিও অদ্যকার মত তোমাদের অনুরোধে তোমাদের বাক্যে স্বীকৃত হইলাম। ভাল, আমি এখনি রাজাকে বলিয়া আসিতেছি। তাহার পরে ফিরিয়া আসিয়া আহারাদি করিব। তোমরা এক্ষণে পাকাদি কার্য্য আরম্ভ কর, -আমি রাজবাটী হইতে আসি।"

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজবাটীতে গেলেন, এবং তথায় পৌঁছয়া দৌবারিক মুখে রাজাকে নিজ আগমন বার্ত্তা পাঠাইয়া দিলেন।

মহারাজ গুরুদেবের আগমন সংবাদ পাইবামাত্র দৌবারিককে বলিয়া দিলেন যে, – "তুমি গুরুদেবকে আমার প্রণাম দিয়া সম্মানের সহিত তাঁহাকে বাটীর মধ্যে আমার বিশ্রামগৃহে লইয়া আইস।"

দৌবারিক অবনত-মস্তকে মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিযা, গুরুদেবকে মহারাজের প্রণাম জানাইয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মহারাজের বিশ্রাম-গৃহে পৌঁছিয়া দিল। মহারাজও গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া, দন্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং গুরুদেবের শুষ্ক বদন দেখিয়া, তাঁহার স্নান ও আহার হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুদেব তদুত্তরে মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, –"মহারাজ! আহারাদি আর কি করিব! পরিজনবর্গের আহার হওয়া দূরে থাকুক, এখন পর্য্যন্ত পাকাদিও হয় নাই। আপনি যে নিদারুণ বাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে কি আর আহারাদি করিবার ইচ্ছা থাকে?"

গুরুদেবের আহারাদি হয় নাই শুনিয়া, মহারাজ ইঙ্গিত করিবামাত্র রাজমহিষী দাসীগণ সমভিব্যাহারে গুরুদেবের নিকটস্থ হইলেন এবং স্বয়ং গুরুদেবের চরণ ধৌত করিয়া দিয়া, নিজ অঞ্চলের দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিয়া, তাঁহার চরণে তৈল মর্দ্দন করিতে

লাগিলেন। দাসীগণও অন্যান্য অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে লাগিল। অপরাপর দাসীগণ স্বর্ণ কলস করিয়া জল আনয়নপূর্ব্বক গুরুদেবের মস্তকে ঢালিতে লাগিল। গুরুদেবের স্নান হইলে পর, তিনি সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া জলযোগ করিতে বসিলেন। জলযোগ শেষ হইলে, মহারাজ গুরুদেবের অসময়ে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুদেব পুত্রের সমস্ত বাক্য মহারাজকে জ্ঞাপন করিলেন।

মহারাজ গুরুর মুখে গুরুপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন—"দেব! আমার অন্তরের ইচ্ছা নহে যে, আমি আপনাদিগকে কোন কষ্ট দিই; তবে আমার রাজ্যসুখ আর ভাল লাগিতেছে না; বরং উহা বিষের জ্বালার ন্যায় অসহ্য বোধ হইতেছে; উহা হইতে কিছু শান্তি না পাওয়াতেই এই কঠোর আদেশ প্রয়োগ করিয়াছি। আমার এত ঐশ্বর্য্য থাকিতেও আমি কোন বিষয়েই সুখ পাইতেছি না। এক শান্তির অভাবে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন করিয়াও রাত্রিতে আমার নিদ্রা হয় না। সখীগণে পরিবৃত হইয়া রাজ্ঞী আমার তৃপ্তির জন্য স্বয়ং চামর ব্যজন করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাতেও তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। এ রাজবৈভবে আমার আর তৃপ্তি হইতেছে না। যদি কেহ আমায় শান্তি প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহাকে আমার এ অতুল বিভব আমি অনায়াসে দান করিতে পারি; কেন না, ইহাতে কিছুমাত্র সুখ বা শান্তি নাই। আমি বাল্যকাল হইতে এই ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া আসিতেছি, কিন্তু এক দিনের জন্যও নির্ম্মল আনন্দলাভ করিতে পারি নাই। বরং রাজ্য রক্ষার জন্য যে বিষময়ী চিন্তা উপস্থিত হয়, তাহা চিতা অপেক্ষাও গরিয়সী। অতএব দেব! গুরুপুত্রকে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কহিবেন এবং অদ্য তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আসিবেন। তিনি যাহা করিতে বলিবেন বা করিবেন, তাহাতে আমি কোন কথা কহিব না। তাঁহার যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, আমি তন্মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে তাহা আনাইয়া দিব। আর যদি তাঁহার কৃপায় আমার শান্তিলাভ হয়, তাহা হইলে, এই সমস্ত রাজ্যের ভার তাঁহাকে অর্পণ করিয়া, আমি নির্জ্জন স্থানে বসিয়া শান্তির সেবায় ব্যাপৃত থাকিব। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিবেন।"

এমন সময় রাজ্ঞী স্বয়ং আসিয়া মহারাজকে জানাইলেন—"গুরুদেবের আহার প্রস্তুত হইয়াছে, আহারের স্থান হইবে কি না।"

রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া মহারাজ গুরুদেবকে বলিলেন, —"আহারীয় সমস্ত প্রস্তুত; আপনি অনুমতি করিলেই আহারের স্থান করা হয়।"

গুরুদেব বলিলেন, —আজ আর এখানে আহার করিব না; কারণ বাটীতে কেহই এখনও জলস্পর্শ করেন নাই। আমি না খাইলে, তাঁহারাও কেহ কিছু খাইবেন না।

অতএব অদ্য বাটী যাই। আহারাদি সমাপনান্তে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, মহারাজের সমীপে একটু পরেই আবার উপস্থিত হইতেছি।-"

গুরুদেব এই কথা বলিয়া গমনোদ্যত হইলে, মহারাজ ও রাজ্ঞী উভয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিলেন। গুরুদেব রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া নিজ বাটীর দিকেই চলিলেন। অহো আশার কি মোহিনী শক্তি! এখন ব্রাহ্মণের আর পূর্ব্বের সে অবস্থা নাই; এখন তাঁহার মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণী যে বলিয়াছিলেন,— পুত্র ছদ্মবেশে পাগলের ন্যায় আচরণ করিয়া, আমাদিগকে ছলনা করিয়া থাকে, এখন সেই কথা ব্রাহ্মণের স্মরণপথে আসিল। ব্রাহ্মণ এখন ভাবিতেছেন যে, যদি ব্রাহ্মণীর এই বাক্য সত্য হয়, তাহা হইলে আর কি! পুত্রের কল্যাণে এ যাত্রা সকলকার জীবন রক্ষা ত হইলই,—তাহার উপর আবার রাজ্যলাভ!! কেননা, রাজা ত বলিয়াছেনই, আমার পুত্র শান্তি প্রদান করিতে পারিলে, তিনি পুত্রকে সমস্ত রাজ্যের ভার দিবেন। পুত্রের রাজ্যলাভ হইলে, তাহা প্রকারান্তরে আমারই হইল!! তাহা হইলে আর আমার ভাবনা কি? বিশ্বনাথ কি আমায় এমন দিন দিবেন!! যদি দেন, তাহা হইলে, কাশীতে গিয়া মহাসমারোহে বিশ্বনাথের পূজা দিয়া, তথায় একটি শিব স্থাপন করিয়া আসিব। ব্রাহ্মণ ইত্যাকার নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে প্রফুল্লবদনে বাটী আসিয়া পৌঁছিলেন।

ব্রাহ্মণী পাকাদি কার্য্য শেষ করিয়া বহির্দ্বারে ব্রাহ্মণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণকে আনন্দবদনে আসিতে দেখিয়া, সহাস্যবদনে বলিয়া উঠিলেন —"ওগো, কর্ত্তা বাড়ী আসছেন।" সকলেই কর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; সুতরাং কর্ত্তা বাড়ী আসিতেছেন শুনিয়া, সকলেই বর্হিবাটীতে আসিলেন। পুত্রও আজ এখনও বাটীতে আছেন। মাতার কথা শুনিয়া তিনিও সকলের সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কাহারও আহারাদি হয় নাই। কর্ত্তার আহার না হইলে কেহই আহার করিবেন না।

কর্ত্তা বাটীতে প্রবেশ করিলে, ব্রাহ্মণী ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে রাজবাটীর সমাচার জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ত্তাও আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা বলিয়া এবং রাজার ও রাজ্ঞীর শীলতা ও ভক্তির পরিচয় দিয়া, অবশেষে পরমানন্দ সহকারে গোপনে ব্রাহ্মণীকে বলিলেন যে,— "যদি বিশ্বনাথ দিন দেন, আর তুমি যাহা বলিয়াছ যে পুত্র পাগল নহে—তাহা যদি সত্য হয় এবং পুত্র যদি রাজাকে শান্তি প্রদান করিতে পারে, তাহা হইলে আমাদের রাজ্যলাভ! কেননা, রাজা বলিয়াছেন, আমার পুত্রের দ্বারা তাঁহার শান্তি লাভ হইলে, তিনি তাহাকে রাজ্যভার দিবেন। যদি ইহা ঘটে, তাহা হইলে আমি কাশী গিয়া বিশ্বনাথের পূজা দিয়া,

কাশীতে শিব স্থাপন করিয়া আসিব। তাহা হইলে, আর আমাকে এই বৃদ্ধাবস্থায় কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ভাবিতে হইবে না। আমি বসিয়া স্বচ্ছন্দ মনে মা'র নাম জপ করিতে পারিব। অতএব তুমি শীঘ্র শীঘ্র আহারাদির আয়োজন কর; আহারান্তে পুত্রকে সঙ্গে লইয়া রাজার নিকট যাইতে হইবে।

ব্রাহ্মণী বলিলেন, –"তুমি এর মধ্যেই কালনিমের লঙ্কাভাগ আরম্ভ কর্‌লে যে! র'সো আগে কার্য্যসিদ্ধিই হ'ক,– তারপর ত তুমি কাশী যাবে!! এখন কাশী যেতে হবে, কি ফাঁসী যেতে হবে, তারই ঠিকানা নাই; এর মধ্যেই এত আনন্দ ভাল নয়। এখনও মা জগদম্বাকে একমনে একপ্রাণে ডাক,– যাতে কার্য্যসিদ্ধি হয়। এখন ও সব কথা মুখেও আন্‌তে নাই।"

ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতে লাগিলেন, – "ব্রাহ্মণী ত বলিলেন জগদম্বাকে ডাক; কিন্তু জগদম্বা সাড়া দেন কৈ? ডাকিতে ত আর বাকী রাখি নাই; অনেক ডাকিয়াছি। ভাল, ব্রাহ্মণী যখন বলিতেছেন, তখন না হয় আবার ডাকা যাক্।" ব্রাহ্মণ স্বগত এই রূপ বলিয়া "মা জগদম্বা কার্য্য সিদ্ধি কর মা" বলিয়া জগদম্বাকে ডাকিতে লাগিলেন। আহারের স্থান হইলে, ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত আহার করিতে বসিলেন এবং আহার করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে পুত্রকে বলিতে লাগিলেন,–"বাবা গোপাল! রাজাকেশান্তি দিতে পা'রবে ত? না, কেবল যাওয়া আসা সার এবং শেষে যে দশা– সেই দশাই হইবে?"

পুত্র বলিলেন,– "আপনি নিশ্চিন্ত চিত্তে আহার করুন্; গুরুর কৃপায় যাহা হয়, তাহাই হইবে?"

পুত্রের এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া উঠিলেন–"ও আবার কি কথা! তুমি পারিবে না? গুরুকৃপা আবার কি? এই ত আমিও রাজার গুরু; আমি ত কিছুতেই রাজাকে শান্তি দিতে পারি নাই। রাজার প্রতি আমার কৃপাও যথেষ্ট আছে; তথাপি রাজার শান্তি লাভ হয় নাই। তুমি পারিবে কিনা, তা বল। গুরুকৃপায় আবার কি হইবে?"

পুত্র বলিলেন,–"বাবা, সদ্‌গুরুর কৃপায় কর্ম্ম প্রাপ্তি হইলে– সবই হইতে পারে। কর্ম্মই সদ্‌গুরু এবং যিনি সেই কর্ম্ম বলিয়া দেন, তিনিও সদ্‌গুরু।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন,–"আমরা কি কর্ম্ম বলিয়া দিই না? তবে আমরা কি অসৎ গুরু? না আমাদের কোন দোষ আছে?"

পুত্র বেগতিক দেখিয়া বলিলেন,– "বাবা! আপনি আহার করুন্; এখন সে সব কথা কি বলিব? যাহা হয় নিশ্চিন্ত হইয়া তাহা দেখিবেন। এখন আর ওসকল কথায় কাজ নাই; শেষে কার্য্য দেখিয়া যাহা বলিতে হয় বলিবেন।"

ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া আহার করিতে লাগিলেন। উভয়ের আহার

হইলে, আহারান্তে ব্রাহ্মণ ধূম পান করিতে লাগিলেন ও মধ্যে মধ্যে এক আধ্‌টা পান খাইতে লাগিলেন; কিন্তু মনে আর তাঁহার অন্য চিন্তা নাই। কেবল ভাবিতেছিলেন, কিসে এ দায় হইতে উদ্ধার পাইবেন। তবে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন তাঁহার মনের ব্যাকুলতার অনেকটা হ্রাস হইয়াছে। এখন তাঁহার মনে এক একবার আশার সঞ্চার হইতেছে, আবার পরক্ষণেই সেই আশা তিরোহিত হইয়া পুনরায় দুশ্চিন্তার উদয় হইতেছে। কিয়ৎকাল এইরূপে বিশ্রাম করিয়া, ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে; বেলা আর বেশী নাই; সূর্য্যদেব যেন পশ্চিম দিকে প্রায় ঢলিয়া পড়িয়াছেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের সকলের কি আহারাদি সমাপন হইয়াছে?"

ব্রাহ্মণী উত্তর করিলেন,—"কেহই আর আহারাদি করিতে বাকি নাই; সকলেরই আহারাদি শেষ হ'য়ে গেছে। তুমি এই বেলা পুত্রকে নিয়ে রাজবাড়ী যাও; আর বিলম্বের প্রয়োজন নাই।"

ব্রাহ্মণীর এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ পুত্রকে ডাকিতে লাগিলেন এবং পুত্র সম্মুখে আসিলে, তাঁহাকে বলিলেন, —"বাবা এইবার রাজবাড়ী চল; আর বেলা নাই,—সন্ধ্যা আগতপ্রায়।"

পুত্র বলিলেন,—"আমি প্রস্তুতই আছি; আপনি অনুমতি করিলেই যাইতে পারি।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তবে কাপড় চোপড় পরিয়া আইস এবং তোমার কপালে তিলক নাই দেখিতেছি; ঠাকুরঘরে গিয়া চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া, তিলক সেবা করিয়া আইস।"

পুত্র বলিলেন,—"কাপড় চোপড় আর কি পরিব; কাপড় তপরিয়াই আছি। আর কপালে আবার তিলক সেবা কি করিব; লোক ভুলান সাজে আর আবশ্যক কি?"

পিতা কহিলেন,—"ওরে বাপু! তুমি ওসব কিছু বুঝ না। তোমার ত শাস্ত্রাদির কোন জ্ঞান নাই; দুইটা শ্লোক বলিয়াও রাজাকে নিজ পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিবে না; অথচ ভাল কাপড় পরিতে ও তিলক সেবা করিতে চাহিতেছ না; তবে কি দেখাইয়া রাজাকে সন্তুষ্ট করিবে?"

পুত্র বলিলেন,—"বাবা! ওসব কিছুরই আবশ্যক নাই; বাহ্য আড়ম্বরে রাজার মনে শান্তি হইবে না। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে, রাজা এতদিনে শান্তিলাভ করিতেন।"

ব্রাহ্মণী সেইখানেই উপস্থিত ছিলেন। তিনি পুত্রের এই সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, —"গোপাল যা বল্‌ছে, তা মন্দ কি? ও যা বলে, আজকার মতন তুমি না হয় তাই কর না। এখন ভাল মন্দ বিচার কর্‌বার সময় নয়। ও যদি ঐতেই ফল দেখায়, তা হ'লে কাজ

কি আমার ফোঁটাচটায় ? তোমরাও ত অনেক ফোঁটা টোটা ক'রে যেতে; তা'র ফলে ত কাটা যেতে বসেছি। ভাল, ও ফোঁটা না কেটেই বা কি করে, তাই কেন দেখ না। ও যা ক'রতে চায়, তা'তে বাধা দিও না; এবং কোন কথাও কহিও না। তুমি বরং ফোঁটা টোটা বেশ ক'রে কেটে যাও। যদি কেউ কিছু বলে, তা হ'লে তাকে বল্‌বে যে,— ও বালক,- আপনার কাজ কর্ম্মেই থাকে; এর পরে সব কর্‌বে।"

ব্রাহ্মণীও যখন এইরূপ বলিলেন, ব্রাহ্মণ অগত্যা সম্মত হইয়া বলিলেন,— "আচ্ছা তাহাই হইবে; তবে এখন আমার সঙ্গে আসিতে বল, বেলা সব যায়।"

গোপাল নিকটেই ছিলেন,— মা ডাকিতেই কাছে আসিলেন। মা গোপালের দাড়ি ধরিয়া বলিলেন,— "বাবা গোপাল। তুমি তোমার জনকের সঙ্গে রাজবাড়ী (যাও বলিতে নাই) এস। বাবা, দেখো, এই সমস্ত পরিবারের জীবন তোমারই উপর নির্ভর কর্‌ছে; বাবা যা'তে সকলের জীবন রক্ষা হয়, তা করিও। বাবা দেখো — যেন পূর্ব্বপুরুষের পিন্ডলোপ না হয়।"

এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণী পুত্রের মুখ চুম্বন করিয়া, মস্তকের ঘ্রাণ লইয়া স্বামীর সহিত বিদায় দিলেন। পুত্রও মাতাকে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বাম পদ ধারণ পূর্ব্বক মাতার পদযুগলের ঘ্রাণ লইয়া পিতাকেও তদ্রূপ ভাবে প্রণাম করিয়া, পিতার সহিত রাজবাটীতে চলিলেন।

পথে যাইতে যাইতে পিতার সহিত আর কোন কথা হইল না। ব্রাহ্মণের বাটী হইতে রাজবাটিও বেশী দূর নহে। সুতরাং পিতা-পুত্রে শীঘ্রই রাজবাটীর দ্বারে পৌঁছিলেন। দ্বারপালেরা পুত্রের সহিত রাজগুরুকে দ্বারে উপস্থিত দেখিয়া সকলে সসম্ভ্রমে দন্ডায়মান হইয়া উভয় অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে নিবেদন করিল,—" মহাশয়, মহারাজকে কি জানাইবার আজ্ঞা হয় ?"

ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত নিজের আগমনবার্ত্তা রাজাকে জানাইতে বলিলেন। দৌবারিক তৎক্ষণাৎ গুরুদেবের আগমন-বার্ত্তা লইয়া রাজসন্নিধানে উপস্থিত হইল এবং অবনত মস্তকে রাজাকে সেই সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

রাজা একান্ত উৎসুকচিত্তে তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। দৌবারিক-মুখে এই সংবাদ প্রাপ্তিমাত্র রাজা স্বয়ং দ্বারদেশে আসিয়া উভয়কেই দন্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ভূমিতেই পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেব দক্ষিণপদের বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা রাজার মস্তক স্পর্শ করিয়া, আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ইঙ্গিতের দ্বারা পুত্রকেও তদ্রূপ করিতে বলিলেন।

পুত্র দেখিলেন, সর্ব্বনাশ! মস্তকে কিরূপে পদদ্বারা স্পর্শ করিতে পারা যায়!! জীবমাত্রেই শিবস্বরূপ; বিশেষতঃ নিজের মাথায় কেহ পা দেয় না এবং দিবার আবশ্যকও

হয় না। পিতা ইহা কিরূপে করিলেন!! এই ভাবিয়া স্তম্ভিত হইলেন। কিন্তু পিতাকে কিছু না বলিয়া, রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন,—"মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন্ এবং আমার উপদেশ মত কার্য্য করিয়া শান্তি লাভ করুন্। আমি আপনার শীতলতায় বড় প্রীত হইয়াছি।"

রাজা আজ্ঞামাত্র গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুদেবকে এবং গুরুপুত্রকে গৃহে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলে, রাজা, গুরু ও গুরুপুত্র তিন জনে একটি গৃহে প্রবেশ করিলেন। ঐ গৃহে তিনখানি আসন পাতা ছিল। রাজা গুরুদেবকে ও গুরুপুত্রকে আসনে বসাইয়া আপনি ভূমিতে বসিলেন।

ব্রাহ্মণ আজ আর বেশী কথা কহিতেছেন না; কেননা, দ্বারদেশে পুত্রের কার্য্য ও তাঁহার প্রতি রাজার ভক্তি দেখিয়া অবধি কেবল পুত্রের কার্য্য দেখিয়া চলিতেছেন ও পুত্র রাজাকে কি বলেন, তাহাই শুনিয়া যাইতেছেন। রাজাকে ভূমিতে বসিতে দেখিয়া, গুরুপুত্র তাঁহাকে বলিলেন,—"মহারাজ! নিরাসনে বসা উচিত নহে; আসনে উপবেশন করুন; তাহাতে আপনার অমঙ্গল হইবে না; বরং মঙ্গলই হইবে।" রাজা গুরুপুত্রের অনুমতিক্রমে উভয়কে প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলেন।

অনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যদিও আমি পিতার মুখে আপনার বৃত্তান্ত সমস্তই শুনিয়াছি, তথাপি আপনার মুখে একবার শুনিতে ইচ্ছা করি।"

গুরুপুত্র এরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলে, রাজা নিজের সমস্ত বিষয় তাঁহাকে আনুপূর্ব্বক বলিয়া কহিলেন, —"আমি উঁহাদের দ্বারা কিছুতেই শান্তি না পাইয়া অসহ্য অশান্তির জ্বালায় এইরূপ কঠোর দন্ডের বিধান করিয়াছি; কেন না, এই কঠোর দন্ডের ভয়ে যদি উঁহারা আমার শান্তির উপায় করিতে পারেন। নতুবা আমার অন্তরে ইচ্ছা নহে যে, উঁহাদের কোন দন্ড দিই। গুরুর কার্য্য শিষ্যের তাপ নিবারণ করা; কিন্তু আমার সে তাপ নিবারণ হইল কৈ? উঁহারা আমায় যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা না করিয়া যদি আমি মিথ্যা ভাণ করিতাম, তাহা হইলে আমার অন্যায় হইত বটে।

অনন্তর রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"আমি আপনাকে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, আমার এক শান্তি ব্যতীত আর কিছুরই আবশ্যক নাই। আপনি কৃপা করিয়া তাহারই উপায় বলিয়া দিউন।"

গুরুপুত্র রাজার এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া মনে মনে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, —"মহারাজ! আপনি কোন চিন্তা করিবেন না; আমি আপনাকে ইহার সদযুক্তি বলিয়া দিব। কিন্তু আপনি যে দন্ডের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহার প্রত্যাখান করিবেন।"

রাজা অবনত মস্তকে তাহাতে স্বীকৃত হইলে, গুরুপুত্র বলিলেন—"অদ্য রাত্রি এক প্রহরের পর আপনাকে আমার সহিত যাইতে হইবে; সঙ্গে কেহই থাকিবে না; কেবল আমার পিতা থাকিবেন। ইহাতে আপনি সম্মত আছেন কি?"

রাজা অবনত মস্তকে তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন।

ব্রাহ্মণ সবই শুনিতেছেন, কিন্তু কোন কথা কহিতেছেন না। কেননা, ব্রাহ্মণী কোন কথার উত্তর দিতে নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। তবে রাজার সহিত পুত্রের এ পর্য্যন্ত যে কথোপকথন হইতেছে, ব্রাহ্মণ তাহাতে বরং তৃপ্তিই লাভ করিতেছেন। বিশেষতঃ যখন রাত্রি এক প্রহরের পর যাইতে হইবে, এই কথা শুনিলেন, তখন ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন পুত্র যে সময় অবধারিত করিলেন, তাহা অপ্রশস্ত নহে। বোধ হয়, এইবার মা জগদম্বার পূজার ব্যবস্থা করিয়া পূজার দ্রব্যাদির বিষয় রাজাকে বলিবে; নতুবা আমায় সঙ্গে লইতে বলিবে কেন? ভাল, দেখাই যাউক কি করে, কোন কথায় কাজ নাই।

তদনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"মহারাজ! আমার দুইটি দ্রব্যের প্রয়োজন আছে। দুইগাছি বড় নূতন ও শক্ত দড়ি চাই। রাজা তৎক্ষণাৎ ভৃত্যকে শীঘ্র ঐ রূপ দুই গাছি দড়ি আনিতে অনুমতি করিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণ ভাবিতেছিলেন, —পুত্র রাজাকে এইবার পূজার দ্রব্যাদিব কথা বলিবেন; কিন্তু যখন পুত্রের মুখে দড়ির কথা শুনিলেন, তখন বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—এ আবার কি? দড়ি কেন? পূজায় ত কখনও দড়ির আবশ্যক হয় না। আঁটকুড়ির বেটা দড়ির কথা বলে কেন? আমি পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণীকে বলিয়াছিলাম যে, পুত্র লেখা পড়া জানে না,—তাহার শাস্ত্রাদি দেখা শুনাও নাই, উহার দ্বারা আর কি উপায় বা উপকার হইতে পারে? এখন ফলেও তাহাই দেখিতেছি!! এত জিনিষ থাকিতে দড়ি কি করিবে? দড়ি দ্বারা রাজাকে কি শান্তি দিবে? কথায় যে বলে "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" এখন তাই দেখিতেছি। স্ত্রীবুদ্ধিতে কার্য্য করিয়া আজই বুঝি রাজার হস্তে প্রাণ যায়!! এই প্রকার নানা রূপ চিন্তা করিতে করিতে, ব্রাহ্মণ এক এক সময় ক্রোধে আত্মহারা হইয়া নিজ মনের ভাব ফুটিয়া ব্যক্ত করিতে যান, আবার পরক্ষণেই ব্রাহ্মণীর নিষেধ বাক্য যেমন মনে পড়ে, অমনি সে ভাব গোপন করিয়া চুপ করিয়া থাকেন।

এমন সময় ভৃত্য দুই গাছি দড়ি লইয়া উপস্থিত হইল এবং রাজার হস্তে উহা অর্পণ করিল। রাজা গুরুপুত্রকে দড়ি দুই গাছি দেখাইলেন এবং উহাতে কার্য্য হইবে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। গুরুপুত্র দড়ি দেখিয়া বলিলেন,—"উহাতেই চলিবে।"

ব্রাহ্মণ এই সমস্ত দেখিয়া ও শুনিয়া ক্রোধে অধীর হইয়া মনে মনে বলিতে

লাগিলেন,—"চলিবে বৈকি! তোমার গোষ্ঠীর মাথা চলিবে!" কিন্তু ফুটিয়া কিছুই বলিতে পারিতেছেন না; কেননা, কথা কহিতে ব্রাহ্মণীর নিষেধ আছে। সুতরাং যাহা কিছু সবই তাঁহার মনে মনেই হইতেছে।

এমন সময় গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন্, সময় আগতপ্রায়; সুতরাং আর বিলম্ব করা উচিত নহে।"

রাজা বলিলেন,—"আমি প্রস্তুতই আছি, তবে চলুন।"

রাজার এই কথার পর পুত্র পিতাকে বলিলেন,—"বাবা, আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন।"

ব্রাহ্মণ পুত্রের বাক্যে পূর্ব্ব হইতেই চটিয়াছিলেন। এখন বেশী কিছু না বলিয়া কেবল বলিলেন,— "আমি না গেলে কি চলে না? রাত্রিকাল, বুড়ো মানুষ, আমি কি যাইতে পারিব?"

পুত্র বলিলেন,—"আপনি আসুন,— কোন চিন্তা নাই; আমি আপনার হাত ধরিয়া লইয়া যাইব।"

এই কথায় ব্রাহ্মণ অগত্যা যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তিন জনেই নিঃশব্দে চলিলেন। এখন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পথে লোকও কম চলিতেছে। পুত্র পিতাকে ও রাজাকে লইয়া সহরের এক প্রান্তভাগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে পৌঁছিয়া চতুর্দ্দিকে অবলোকন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লইয়া সম্মুখস্থ এক নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন।

বৃদ্ধ পিতা তখন পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বাবা গোপাল! এ বনের মধ্যে আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাও? শুনিয়াছি এই বনে বড় হিংস্র জন্তুর ভয়। বাবা! শেষ দশাটায় পাছে বাঘের পেটে যাইতে হয়, সেই ভয় বড় হইতেছে।"

পুত্র কহিলেন,—"বাবা! কিছু ভয় করিবেন না; আমি থাকিতে আপনার ও মহারাজের কোন ভয়ই নাই। আপনারা নির্ভয়ে ও নিশ্চিন্ত চিত্তে আমার সঙ্গে আসুন।" পিতাকে এই কথা বলিয়া রাজাকেও বলিলেন,—"মহারাজ! আপনিও কোন ভয় বা চিন্তা করিবেন না।"

রাজা গুরুপুত্রকে—"যে আজ্ঞা" বলিয়া নির্ভয়ে চলিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত চলিতেছেন ও ভাবিতেছেন; —"রামে মেলে ও মেরেছে, রাবণে মেলেও মেরেছে," আজ অব্যাহতি নাই। হয় রাজার হাতে, না হয় বাঘের হাতে, একটা না একটা হইবেই হইবে। যে রকম গতিক, তাহাতে শুভলক্ষণ কিছুই দেখিতেছি না। দেখাই যাউক,—কি হয়! এখন ত আর কোন উপায় নাই। কপালে যাহা আছে তাহা হইবেই।

এমন সময় পুত্র বলিলেন,—"আর যাইতে হইবে না। এক্ষণে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। আপনারা উভয়ে এই উভয় বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া একটু বিশ্রাম লাভ করুন্।"

ব্রাহ্মণ পুত্রের কথা শুনিয়া একটি বৃক্ষমূলে বসিলেন এবং রাজাও অন্য একটি বৃক্ষমূলে বসিলেন। পুত্র উভয়ের সম্মুখেই বসিয়া রহিলেন।

ক্ষণেক পরে গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"এক্ষণে আপনার শ্রম দূর হইয়াছে কি"?

রাজা বলিলেন,—"দেব! আমার পথশ্রান্তি দূর হইয়াছে।"

ইহাতে গুরুপুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ! তবে কি আমি কার্য্য আরম্ভ করিতে পারি?"

রাজা আনন্দের সহিত কহিলেন, "আপনি অনায়াসে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।"

ব্রাহ্মণ বৃক্ষমূলে বসিয়া মনে মনে নানাপ্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, এবং পাছে পিছন হইতে কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করে, এই ভয়ে তিনি মধ্যে মধ্যে এক একবার নিজ পশ্চাৎদিকে দৃষ্টি করিতেছেন। এইরূপ শঙ্কিত ভাবে থাকিয়া ব্রাহ্মণ মনে মনে আন্দোলন করিতেছেন যে, যদি ব্রাহ্মণীর কথা না শুনিতাম, তাহা হইলে আর অদ্যই প্রাণ যাইত না; এক সপ্তাহ ত বাঁচিতাম। সপ্তাহ কাল সময় পাইলে, কিছু না কিছু চেষ্টাও করিতে পারিতাম। অন্য কিছু করিতে না পারিলেও অন্ততঃ গ্রহ শান্তিও ত করিতে পারিতাম। পাগলের হাতে পড়িয়া তাহাও গেল। রাজা কেমন সুবিধার কথা বলিতেছেন। পাগল কি কার্য্য জানে, যে তাহার অনুষ্ঠান করিবে? যদি কার্য্যের অনুষ্ঠানই জানিত, তাহা হইলে, রাজার নিকট হইতে আর দড়ি চাহিত না! দড়ির দ্বারা যে উহার কি পিন্ড চট্‌কাইবে, তা' ওই জানে। যাহৌক, এ যাত্রা মনের কথা মনেই রহিল,—ব্রাহ্মণীর জন্য আর ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। পাছে ব্রাহ্মণী রাগ করেন, এই ভয়ে ব্রাহ্মণ ফুটিয়া কিছুই বলিতে না পারিয়া, চুপ করিয়াই রহিলেন।

গুরুপুত্র রাজার কথায় প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং এক গাছি দড়ি লইয়া রাজাকে বলিলেন,—"আপনি গাত্রোত্থান করুন্। রাজা গুরুপুত্রের আজ্ঞামাত্র উঠিয়া দাঁড়াইলে, তিনি রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি ক্ষণকালের জন্য আপনাকে এই বৃক্ষে বাঁধিতে পারি কি?"

রাজা অকুতোভয়ে বলিলেন,—"আপনার যাহা ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে তাহা করিতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া রাজা বৃক্ষের পার্শ্বে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইলে, গুরুপুত্র তাঁহাকে বন্ধন করিতে লাগিলেন। তিনি রাজার উভয় হস্ত একত্র করিয়া একটি ফাঁস দিলেন; পরে ঐ দড়ি হস্তে জড়াইয়া জড়াইয়া কণ্ঠদেশে আনিয়া কণ্ঠের ঊর্দ্ধে গলার কাছে, যেখানে টিপিলে জিহ্বা বাহির হয় সেই স্থানে, একটি গ্রন্থি দিলেন। পুনরায় ঐ দড়ি জড়াইয়া জড়াইয়া কোমরের নীচে গুহ্যদেশে আনিয়া সেই স্থানে একটি গ্রন্থি দিয়া বৃক্ষের সহিত জড়াইয়া ফাঁস দিয়া রাখিলেন। কেবল চরণটি খোলা রহিল। কিন্তু এমন কৌশলে বন্ধন করিলেন যে, কৌশলটি দেখাইয়া দিলে একমাত্র চরণের সাহায্যে সমস্ত গ্রন্থি খোলা যাইতে পারে। গ্রন্থি খুলিতে পারিলে, ফাঁস আর কতক্ষণ থাকে? উহা অতি সহজ উপায়েই খোলা যায়।

এদিকে পুত্র রাজাকে বন্ধন করিতেছেন দেখিয়া –ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,–তবে কি গোপাল রাজাকে বাঁধিয়া বধ করিবে? ওঃ! তাহা হইলে ত উহার এ সঙ্কল্প বড় ঘৃণিত! ইহাই যদি উহার উদ্দেশ্য হয়, তবে আমি বাঁচিয়া থাকিতে ত কখনই ঐ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে দিব না। ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ও পাগল, উহার কোন কান্ডাকান্ড জ্ঞান নাই; সুতরাং ও সবই করিতেপারে। এমন রাজাকে কি কখন বধ করিতে আছে? রাজা ভক্তিমান, দয়ালু, প্রজাবৎসল ও শান্তিপ্রিয়। কিন্তু এই শান্তিপ্রিয়তাই মজাইয়াছে। এবার বুঝি পাগলের হাতেই বা তাঁহাকে মজিতে হয়; কিন্তু তাহা কিছুতেই করিতে দেওয়া হইবে না। আমি বৃদ্ধ; সুতরাং আমি ত উহার জোরে পারিব না। তবে এক কথা আছে, প্রথমে সাহসে ভর করিয়া ভয় দেখাইয়া উচ্চরবে ধমকাইয়া উঠিব। তাহাতে যদি না হয়, শেষে হাতে পায়ে ধরা ত আছেই। এমন সময় ব্রাহ্মণ দেখিলেন যে, গোপাল রাজার বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া, আবার যেন কি আনিতে গেল। ব্রাহ্মণ জানেন না যে, এইবার তাঁহার পালা; সুতরাং তাঁহার মনে পূর্ব্ববৎ চিন্তাই হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন, পুত্র বুঝি এইবার রাজাকে বধ করিবার জন্য অস্ত্র আনিতে যাইতেছে। কিন্তু পুত্র যে তাঁহাকেই বাঁধিবার জন্য দড়ি আনিতে যাইতেছেন, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই।তাই আর চুপ করিয়া থাকিতে না পারিয়া, চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন,--"পাগলা, তুই যে বড় রাজাকে গাছের সহিত বাঁধিয়া রাখ্‌লি? তোর মতলব কি? তুই এমন ভক্ত, প্রজাবৎসল ও আমাদের অন্নদাতা রাজাকে বধ কর্‌বি না কি?"

এই কথা বলিতেছেন এবং ভয়ে ও রাগে কাঁপিতেছেন। এমন সময় পুত্র দড়ি লইয়া পিতার নিকট আসিয়া বলিলেন,–"মা আপনাকে কথা কহিতে নিষেধ করিয়াছেন; আপনি কথা কহিতেছেন কেন? বিরক্তই বা হইতেছেন কেন? আমি রাজাকে মারিবও না,– কাটিবও না। আমি তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিতে আসিয়াছি, –তাহারই চেষ্টা

করিব। আপনি এইরূপ বাধা দিলে সে কার্য্যে বিঘ্ন হইতে পারে।"

এখন ব্রাহ্মণীর কথা ব্রাহ্মণের স্মরণ-পথে আসিল, সুতরাং ব্রাহ্মণ ভীত হইয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, বাপু, তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর; রাজাকে প্রাণে মারিও না।" এই কথা বলিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ চুপ করিয়া রহিলেন।

তাহার পর গোপাল পিতাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—আপনিও একবার অনুগ্রহ করিয়া রাজার ন্যায় বৃক্ষের পার্শ্বে দাঁড়ান। আমি ক্ষণকালের জন্য আপনাকেও বৃক্ষের সহিত বন্ধন করিয়া রাখিব।"

ব্রাহ্মণ পুত্রের এই কথা শুনিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধের ন্যায় থাকিয়া বলিলেন,—"বাবা! আমায় ছাড়িয়া দাও; আমি বৃদ্ধ, আমায় বাঁধিও না। বৃদ্ধ পিতাকে কি বাঁধিতে আছে? ইতঃপূর্ব্বে আমি যে তোমায় কঠোর কথা বলিয়াছিলাম, তাহা কেবল রাজার প্রতি স্নেহবশতঃ। বাবা, আমি আর তোমায় কখনও কিছু বলিব না। আজিকার মত আমায় ছাড়িয়া দাও। বাবা! পুত্র হইয়া কি পিতাকে কষ্ট দিতে আছে? লক্ষ্মী বাপধন, আমায় ছাড়িয়া দাও।"

গোপাল পিতার এইরূপ কাতরোক্তি শুনিয়া বলিতে লাগিলেন,—"বাবা! আপনি এত ব্যাকুল হইতেছেন কেন? আমি জানি যে পিতাকে বাঁধিতে নাই। তবে কি করি, মহারাজকে শাস্তি প্রদানের অনুরোধে ও কতকগুলি জীবনের উদ্ধারের জন্যই আমাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে। আপনি তজ্জন্য আমায় ক্ষমা করিয়া আশীর্ব্বাদ করুন্। বিশেষতঃ মা বলিয়াছিলেন যে, আমি যাহা করিব, তাহাতে আপনি কোন বাধা দিবেন না।"

ব্রাহ্মণ পুত্রের এই সকল কথায় বলিলেন,—"বাবা! ব্রাহ্মণী বাধাই দিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; আমাকে বাঁধিতে ত আর বলেন নাই। আচ্ছা বাবা, তবে তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, তাহাই কর এবং আমাকে বাঁধিলেই যদি ভাল হয়, তবে বাঁধ।"

গোপাল যখন পিতাকে রাজার ন্যায় বাঁধিতে লাগিলেন, তখন বৃদ্ধ পিতা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু এ অবস্থায় ব্রাহ্মণ পুত্রের একটু আশ্চর্য্য ক্ষমতা দেখিলেন। পুত্র এত বাঁধিলেন, তথাপি সে বন্ধনে কোন কষ্ট বোধ হইল না। বরং শরীর যেন শীতল হইয়া আসিতেছে বোধ করিতে লাগিলেন। পুত্র যখন ব্রাহ্মণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বাঁধিতেছিলেন, তখন তিনি পুত্রের শরীর হইতে যেন একটি কোমল জ্যোতিঃ বাহির হইতে দেখিলেন। সেই জ্যোতিঃ দেখিয়া ব্রাহ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া, স্থিরভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহা কাহারও মায়ার দ্বারা যেন ভুলাইয়া দিল।

গোপাল বন্ধন কার্য্য শেষ করিয়া দশ বার হাত অন্তরে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং

রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,–"মহারাজ! আপনি এইবার আমার সহিত আসুন; আমি আপনার শান্তির উপায় বলিয়া দিতেছি। বিলম্ব করিবেন না; যত শীঘ্র পারেন, আমার সঙ্গে আসিবার চেষ্টা করুন্।"

রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন,–ঠাকুর! আপনি যে আমাকে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, –বন্ধন খুলিয়া না দিলে, আমি কিরূপে আপনার চরণসমীপে যাইতে পারি? বিশেষতঃ বন্ধনের প্রথমাবস্থায় বন্ধনজ্বালা অনুভব করিতে পারি নাই; কিন্তু এখন বন্ধনের অবস্থায় অনেকক্ষণ থাকায় জ্বালা ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। দেব! এ বন্ধন রজ্জু খুলিয়া দিয়া, আমার বন্ধনজ্বালা নিবারণ করুন। আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইলে, আপনার নিকটস্থ হইতে পারি; নতুবা আপনার নিকটে আমার যাওয়া অসম্ভব। পরন্তু গ্রন্থির দ্বারা এ রজ্জু যেরূপ ভাবে বৃক্ষের সহিত জড়ান ও বাঁধা আছে, তাহাতে কাহারও সাহায্য ব্যতীত উহা হইতে মুক্ত হইবার উপায় নাই।"

রাজার ঐ সকল কথায় গুরুপুত্র বলিলেন,–" আমার পিতাকে বলুন; উনিই আপনার বন্ধন খুলিয়া দিবেন।"

ব্রাহ্মণ সবই শুনিতেছেন, কিন্তু ভয়ে আর কোন কথা কহিতেছেন না। কিন্তু মন ত আর চুপ করিয়া থাকিবে না। বিশেযতঃ মনের উপর ব্রাহ্মণের কিছুমাত্র আধিপত্য নাই। সুতরাং মনে ,মনে বলিতেছেন –"আজ পাগলের হাতে পড়িয়া এই জঙ্গলের মধ্যেই প্রাণটা বা যায়। পাগলার কোন কান্ডজ্ঞান নাই; তাই রাজাকে বলিতেছে, বাবা আপনার বন্ধন খুলিয়া দিবেন! অরে মূর্খ! বাবাও যে বদ্ধাবস্থায় আছে; বাবা কেমন করিয়া রাজার বন্ধন খুলিয়া দিবে? তাই না হয় অগ্রে আমার বন্ধন খুলে দে,-তারপর আমি গিয়া রাজার বন্ধন খুলে দিব। একবার খুলে দিলে হয়,–তাহা হইলেই রাজার বন্ধনটা খুলে দিয়ে একবারে টানা দৌড় মারিব; আর কোন দিকেই তাকাইব না। বোকা পাগলা! তুই যে নিজেই আমাকেও বাঁধিয়া রাখিয়াছিস্। আবার রাজাকে বলিতেছিস্– বিলম্ব করিবেন না শীঘ্র আমার সহিত আসুন!!! আঃ! এমন পাগলের হাতেও মানুষ পড়ে!! ব্রাহ্মণীর কথাতেই কেবল এই সর্ব্বনাশের উপর সর্ব্বনাশ!! নচেৎ বাটীতে থাকিলে ত আর এ অবস্থা হইত না। এ ত পাগল; যদি আমাদিগকে এই অবস্থায় রাখিয়া পলাইয়াই যায়, তাহা হইলেই প্রতুল! রাজাও বন্ধনাবস্থায় আছেন। এই অবস্থায় যদি কোন হিংস্র জন্তু আসিয়া আক্রমণ করে, তাহা হইলে উদ্ধারের আর কোন উপায় নাই। পূর্ব্বেও বলিয়াছিলাম,- -হয় রাজার হাতে, না হয় বাঘের হাতে মরিতে হইবে। এখন দেখিতেছি যে, রাজার হাতে মরিতে হইল না; পুত্রের দোষে বাঘের হাতেই প্রাণটা বা যায়!! যাহা হউক কোন কথায় কাজ নাই,–কি জানি যদি পাগল এবার মেরেই বসে।"

এমন সময় রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন,—"ঠাকুর! গুরুদেবও যে আমার মতন বদ্ধাবস্থায় আছেন। তিনি কি প্রকারে আমাকে বন্ধন দশা হইতে মুক্ত করিবেন? ঠাকুর, আপনার বন্ধন নাই—আপনি মুক্ত অবস্থায় আছেন; সুতরাং আপনি বা আপনার ন্যায় কোন মুক্ত ব্যক্তিই আমার এই বন্ধন খুলিয়া দিতে পারেন। নচেৎ আপনার পিতা নিজে বদ্ধাবস্থায় থাকিয়া কি প্রকারে আর একজনের বন্ধন মোচন করিবেন? অতএব আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে এ বন্ধনজ্বালা হইতে মুক্ত করিয়া শান্তি প্রদান করুন্। আপনার পিতার দ্বারা আমার এ বন্ধন মোচন হইবে না; কেন না, তিনিও বদ্ধ আছেন; একজন অন্ধ যেমন অপর একজন অন্ধের পথপ্রদর্শক হইতে পারে না, তদ্রূপ গুরুদেব নিজে বদ্ধ থাকিয়া, কি প্রকারে আমার বন্ধন খুলিবেন? ইহা নিতান্ত অসম্ভব। তিনি অগ্রে আপনার ন্যায় কোন মুক্ত ব্যক্তির দ্বারা নিজের বন্ধন মোচন করাইয়া স্বয়ং মুক্ত হউন, তাহার পর তিনি আমাকে মুক্ত করিতে পারিবেন, নচেৎ নহে।"

ব্রাহ্মণ সবই শুনিতেছেন, কিন্তু পুত্রের ভয়ে ও ব্রাহ্মণীর ভয়ে কোন কথা কহিতেছেন না। পরন্তু মনে মনে রাজাকে এই সকল কথার জন্য ধন্যবাদ দিতেছেন ও বলিতেছেন,—"রাজবুদ্ধি না হইলে কি আর এমন কথা কাহারও মুখ হইতে বাহির হয়? মহারাজ একবার কোন গতিকে পাগলাকে ভুলাইয়া নিজে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলেই, আমিও তাঁহাকে আমার বন্ধন খুলিয়া দিতে বলিব। তাহার পর তিনি বাটী গিয়া ত আমাকে বধ করিবেন। আমার পক্ষে তাহাও মঙ্গল; কেন না, তবুও ত আরো একবার বাটীর সকলকে দেখিয়া মরিতে পারিব। রাজা কখনই এমন পাষন্ড নহেন যে, আমাকে এই জঙ্গলের মধ্যে একাকী ফেলিয়া যাইবেন। পাগলাকে কিছু বলা হইবে না; কারণ পাগলা বোধহয় আমার উপর চটিয়াছে। কি জানি, যদি সেই রাগে আমাকে বন্ধন হইতে মুক্ত নাই করে। নাঃ, এতদূর বোধ হয় করিবে না। বৃদ্ধ পিতাকে কি আর বাঘের দ্বারা খাওয়াইবে? তাহা হইলে, উহার জননীই বা উহাকে কি বলিবে? অন্ততঃ উহার গর্ভধারিণীর ভয়েও আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। আর একান্তই যদি না খুলিয়া দেয়, তাহা হইলে, রাজা যেমন মিষ্ট কথায় পাগলকে বশ করিবার চেষ্টায় আছেন, আমিও তাহাই করিব। পাগলা নিশ্চই রাজার উপর সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বন্ধন খুলিয়া দিবে এবং তাহা হইলে, আমারও একটা না একটা কিনারা হইবে। দেখা যাক্,--মা জগদম্বার কৃপায় কতদূর কি হয়।"

রাজার বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুপুত্র বলিলেন,—"মহারাজ আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহা কি সত্য?"

পুত্রের এই কথা শ্রবণমাত্র ব্রাহ্মণ মনে মনে বলিতেছেন,— "আরে গেল,—

পাগলা বলে কি? সত্য নয় ত কি মিথ্যা? আয় আমি তোকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে দিই। একবার আমায় খুলে দে দেখি, তারপর তোকে আমি আগে এই দড়ি দিয়ে বেশ ক'রে বাঁধি,তখন জান্‌তে পার্‌বি, রাজা সত্য বলিলেন, কি মিথ্যা ব'ললেন।পাগলা নিজে কিনা মুক্ত অবস্থায় আছে, তাই আমাদের এই বদ্ধাবস্থার কষ্ট দেখে দেখ্‌ছে না। যার জ্বালা, সেই জানে। আমরা বন্ধন জ্বালায় জ্বলে মরছি,– পাগলা মজা করে বলছে,– ইহা কি সত্য?"

গুরুপুত্রের কথা শ্রবণ করিয়া, মহারাজ বলিলেন,–"দেব! ইহা নিশ্চয়ই সত্য,– তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"

অনন্তর গুরুপুত্র রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,–"মহারাজ! ইহা যদি সত্যই হয়, তবে আপনি আমার বৃদ্ধ পিতাকে কঠোর দন্ডাজ্ঞা দিয়াছেন কেন?"

রাজা গুরুপুত্রকে সবিনয়ে বলিলেন,–"দেব! দন্ডাজ্ঞা দিবার কারণ আমি ত পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি। আমার অন্তরের ইচ্ছা শান্তিলাভ, ইঁহারা যখন কোন কর্ম্মের দ্বারা আমায় শান্তি দিতে পারিলেন না, তখন আমি অসহ্য অশান্তির জ্বালায় অস্থির হইয়া মনে করিলাম যে, গুরুদেবের প্রতি এইরূপ কঠোর দন্ডের ব্যবস্থা করিলে, দন্ড ভয়েও তিনি আমার শান্তির কোন উপায় করিতে পারেন; নতুবা গুরু বা ব্রাহ্মণ বংশের নাশ করা আমার অন্তরের অভিপ্রায় নহে।"

তদুত্তরে গুরুপুত্র রাজাকে বলিলেন,–"মহারাজ! আপনি শান্তিলাভের জন্য যে উপায়টি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত মন্দ নহে। তবে আপনার বিবেচনায় কিছু ত্রুটি হইয়াছে। আপনি এই মাত্র বলিলেন যে, নিজে বদ্ধ থাকিতে অপরের বন্ধন মোচন করা যায় না। আপনি যে সকল ব্রাহ্মণের দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদি করাইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই বদ্ধজীব, সুতরাং কর্ম্মকান্ড জানেন না। আপনি যেমন রজ্জু দ্বারা এই বৃক্ষে বাঁধা আছেন, তাঁহারাও তেমনি মায়ারূপ রজ্জু দ্বারা এই সংসার-বৃক্ষে আবদ্ধ আছেন। সুতরাং তাঁহারা কেহই এই বন্ধন-দশা হইতে মুক্ত হইবার কৌশল অবগত নহেন; অথচ তাঁহারা পান্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া, আপনাদিগকে জ্ঞানী মনে করিয়া সমস্ত কর্ম্মকান্ডই করিয়া থাকেন। কর্ম্মকান্ড করিতে বা করাইতে হইলে, নিজে যোগী হওয়া চাই। শাস্ত্রোক্ত কর্ম্মকান্ড যোগী ব্যতীত অপরে অবগত নহেন। সুতরাং তাঁহারা যে সকল কর্ম্ম করাইয়া থাকেন, সে সকলের ফলও বিপরীত ফলিয়া থাকে। এজন্য সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা শান্তি না হইয়া বরং অশান্তিই হইতে দেখা যায়।

"মহারাজ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেছেন,– ব্রাহ্মণপন্ডিতগণ আপনাকে কর্ম্মকান্ডের আর কিছুই করাইতে বাকী রাখেন নাই; অথচ আপনার কিছুমাত্র শান্তিলাভ

হয় নাই। বরং তাঁহারাই মহারাজের অশান্তির হেতু হইয়াছেন। তাঁহারা মুক্তিমার্গ বা শান্তিলাভের উপায় অবগত নহেন; সুতরাং মুক্তও নহেন। যাঁহারা নিজে বন্ধনদশাগ্রস্ত, তাঁহারা কাজে কাজে অপরের বন্ধন মোচনে অশক্ত। নিজের বা অপরের বন্ধন মোচন করিতে হইলে, প্রাণায়ামরূপ যোগকৌশল জানা উচিত। এই অপূর্ব্ব যোগরূপ কৌশলই মানবের সহজে মুক্ত হইবার এরমাত্র উপায়। এই যোগরূপ অপূর্ব্ব কৌশলই মানবের সহজে মুক্ত হইবার একমাত্র উপায়। এই যোগরূপ অপূর্ব্ব কৌশলের অভাবে যাগ যজ্ঞ পূজা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্ম পন্ড হইতেছে। কালক্রমে ব্রাহ্মণপুত্রগণ বিলাসিতায় মত্ত হইয়া, সাধনমার্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মশূণ্য হওয়ায় তাঁহাদের বচন মাত্র সার হইয়াছে। নিজের জানা থাকুক্ বা নাই থাকুক্, লোককে দশবিধ কর্ম্মের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহারা নিজে কোন কর্ম্মই প্রকৃত প্রস্তাবে জানেন না। তবে ব্যবসায়-রক্ষার অনুরোধেই কেবল লোক-দেখান দুই একটা বাহ্য কর্ম্ম করেন মাত্র। কেননা, তাহাতে সাংসারিক হিসাবে লাভব্যতীত লোকসান নাই। তাঁহারা পুঁথিতে জ্ঞানশাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া জ্ঞানী হইয়াছেন? বচনে ব্রহ্মজ্ঞানের ছড়াছড়ি,— কার্য্যে বদ্ধ জীবভাবের পরিচয়!!

"মহারাজ! আপনি বদ্ধ জীবের দ্বারা যাগযজ্ঞাদি করাইয়াছিলেন; সুতরাং তদ্দ্বারা আপনার শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। ইহাদের দ্বারা কর্ম্ম করাইলে বরং পতিত হইয়া অশান্তিরূপ নরকে বাস করিতে হয়। মহারাজেরও তাহাই ঘটিয়াছে। রাজা পরীক্ষিতেরও আপনার ন্যায় অশান্তি হইয়াছিল। পরীক্ষিৎ যখন শুনিলেন যে, ব্রহ্মশাপে সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার প্রাণ যাইবে, তখন তাঁহার মনে অসহ্য অশান্তির উদয় হয়। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভাস্থ সকলের নিকট নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলে পর, সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ বা যজ্ঞের দ্বারা কেহ বা দানের দ্বারা, কেহ বা জপাদির দ্বারা, আবার কেহ বা ব্রতনিয়মাদির দ্বারা সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার উপদেশ দিয়াছিলেন। অবশেষে যখন তিনি জানিলেন যে, ইঁহারা সকলে শান্তি প্রদানে অশক্ত, একমাত্র ব্যাসপুত্র মুক্ত পুরুষ শুকদেবই তাঁহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারেন এবং তদ্ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা তাঁহার শান্তিলাভ হইবে না, তখন তিনি শুকদেবকে আনয়ন করাইলেন।

"শুকদেব রাজ্যে প্রবেশ করিলে, অনেকেই তাঁহাকে পাগল বলিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। তিনি পাগল ছিলেন বটে, কিন্তু কাজের পাগল ছিলেন। তিনি রাজর্ষি জনকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া, প্রাণায়ামাদি যোগাভ্যাসের দ্বারা পরম শান্তি লাভ করিয়া, পরম যোগী হইয়াছিলেন। তিনি না পড়িয়াই সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইয়া পুরাণাদি শাস্ত্রের নিগূঢ় তাৎপর্য্যে সম্যক্ অভিজ্ঞতা লাভও করিয়াছিলেন। রাজা পরীক্ষিৎ তাঁহাকে

নিজের বিষয়ে আদ্যোপান্ত জ্ঞাপন করিয়া, যাহাতে স্বীয় অশান্তি দূর হয়, ব্যাকুলহৃদয়ে এমত উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। মুক্ত পুরুষ শুকদেবও রাজার মনের অবস্থা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়া, তাঁহাকে পুরাণাদি শাস্ত্রের সারমর্ম্ম আত্মযোগের উপদেশ দিলেন।

"মহারাজ! সমস্ত পুরাণেই এই আত্মযোগের রহস্য ব্যক্ত আছে; কিন্তু তাহার কার্য্য প্রণালী একমাত্র যোগীরাই জানেন,—তদ্ব্যতীত অন্যেরা অবগত নহেন। আত্মযোগের উপদেশ দিয়া শুকদেব রাজার আত্মসাক্ষাৎকার করাইয়া দিলেন। এইরূপে আত্মদর্শন করিয়া রাজা পরীক্ষিৎ পরম প্রীতি লাভ করিয়া, শুকদেবকে কহিলেন,—প্রভো! আজ আমি আপনার কৃপায় যে অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিলাম, ইহাতে আমি স্বয়ং চরিতার্থ ও ধন্য মনে করিতেছি। কিন্তু নিত্য কিসে আমার এই রূপের দর্শন লাভ হইবে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার উপদেশ প্রদান করুন্। তখন শুকদেব রাজাকে বলিলেন,—আমি অদ্য আপনাকে যে আত্মকর্ম্মের উপদেশ দিলাম, ঐ কর্ম্ম দ্বারাই আপনার নিত্য ঐ রূপ দর্শন হইবে। আপনি এই কর্ম্মের অভ্যাস করুন্; একমাত্র এই আত্মকর্ম্মই আপনাকে শান্তি প্রদান করিবে; যেহেতু কর্ম্মই ব্রহ্ম। রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট হইতে এইরূপ উপদেশ পাইয়া, পরম সুন্দর যোগরূপ কৌশলের দ্বারা ভববন্ধন-গ্রন্থি ছিন্ন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছিলেন।

মহারাজ! যোগী ব্যতীত সাধারণ ব্রাহ্মণ পন্ডিতের নিকট আত্মকর্ম্মের উপদেশের আশা দুরাশা মাত্র। ইঁহাদের নিকট শাস্ত্রীয় বচন ব্যতীত ভবনদী পার হইবার সাঁতাররূপ কৌশল জানা যায় না।

গুরুপুত্র এইকথা বলিয়া দৃষ্টান্তচ্ছলে রাজাকে এই গল্পটি বলিলেন—

মহারাজ! কোন এক সময়ে এক পন্ডিত নৌকারোহণে স্থানান্তরে যাইতেছিলেন। যাইতে যাইতে তিনি নাবিককে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ওহে নাবিক! তুমি দর্শনশাস্ত্র অভ্যাস করিয়াছ কি?"

নাবিক উত্তর করিল,—'আজ্ঞা, আমি নাবিকের কার্য্য করিয়া থাকি, দর্শনশাস্ত্র জানিব কি রূপে?"

পন্ডিতবলিলেন,—"এঃ! তবে ত দেখিতেছি—তোমার জীবনের সিকি অংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।"

কতকদূর অগ্রসর হইয়া পন্ডিত আবার উহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল, বাপু, তুমি কি জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছ? একটু জ্যোতিষ জানা সকলেরই আবশ্যক?"

নাবিক বলিল,—"আজ্ঞা না মহাশয়, আমি নাবিক, ওসব শাস্ত্রের ধার ধারি না।"

এই কথা শুনিয়া পন্ডিত বলিয়া উঠিলেন ,–"এঃ! দেখিতেছি– তোমার জীবনের অর্দ্ধাংশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আচ্ছা বাপু! তুমি বেদ পুরাণাদি শাস্ত্র কিছু পড়িয়াছ?"

নাবিক বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক বলিল –"আজ্ঞা না মহাশয়, ও সব কিছুই জানি না। আপনি বারে বারে কেবল ওই সবই জিজ্ঞাসা কর্‌বেন ? আমি নাবিক, আমার ওসবে দরকার কি ? ওসবের দ্বারা আমার কি লাভ হ'বে মহাশয় ?"

এই কথা শুনিয়া পন্ডিতবলিয়া উঠিলেন,–"এঃ! দেখিতেছি, তোমার জীবনের তিন অংশ নষ্ট হইয়াছে।"

এমন সময় দৈবাৎ নৌকার তলা ফাটিয়া নৌকায় জল উঠিতে লাগিল, নৌকা জলে মগ্নপ্রায় হইলে, নাবিক চীৎকার করিয়া পন্ডিতকে বলিল, –"মহাশয়! আপনি কি সাঁতার জানেন ?"

পন্ডিত উত্তর করিলেন,–"না বাপু, আমি সাঁতার জানি না।"

উহাতে নাবিক কহিল, –"মহাশয়! এক সাঁতারের অভাবে এখন আপনার সমুদয় জীবনটিই নষ্ট হ'ল এবং তার সঙ্গে বেদপুরাণ জ্যোতিষ দর্শন প্রভৃতি সমস্তই বৃথা নষ্ট হয়ে গেল। নৌকার তলা ফেটে গেছে– নৌকা ডুবুডুবু হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া পন্ডিত মহাশয় ভয়ে হতাশ হইয়া নাবিককে বলিলেন–"নাবিক! আমায় রক্ষা কর,–আমার প্রাণ বাঁচাও, আমি সাঁতার না শিখিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছি।"

নাবিক পন্ডিতের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু তাহা সফল হইল না। পন্ডিত মহাশয় নৌকার সহিত জলমগ্ন হইয়া অতল জলে তলাইয়া গেলেন। নাবিক উত্তমরূপে সাঁতার জানিত; সুতরাং সে অনায়াসে গা ভাসান দিয়া নদী পার হইল এবং তীরে উত্তীর্ণ হইয়া, জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইল।"

এই কথা শুনিয়া রাজা গুরুপুত্রকে একটি প্রশ্ন করিলেন,–"দেব! উত্তম সাঁতার জানিলেও ত দুই এক জনকে ডুবিয়া মরিতে দেখা যায় ?"

গুরুপুত্র উত্তর করিলেন,– হাঁ তাহা দেখা যায় বটে, তাহাই যোগভ্রষ্টের অবস্থা। সকলেই যে এক জন্মে পরমগতি লাভ করিবেন, এমন নহে। যদিও যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিরা এক জন্মেই পরমগতি লাভ করিতে পারেন না, তথাপি তাঁহারা সাধারণ জীবের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শান্তিলাভ করিয়া, পরজন্মে যোগীদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন এবং পুনরায় পূর্ব্বজন্ম সংস্কার লব্ধ যোগাভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, শেষে পরমগতি লাভ করেন। এরূপ জন্মও দুর্লভ।"

এই সকল কথার পর রাজা গুরুপুত্রকে কহিলেন,–"দেব! আপনি বলিয়াছেন

যে, যোগরূপ কৌশলব্যতীত শান্তি লাভের অন্য উপায় নাই। দেব! যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে, ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পূজা যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম সকল কি মিথ্যা? ঐ সকল কার্য্যে কি কোন ফল দর্শে না?"

গুরুপুত্র বলিলেন,—"মহারাজ! এই সকল কর্ম্ম মিথ্যা নহে। তবে এই পূজাদির মধ্যে যে সকল মন্ত্র, ভূতশুদ্ধি ও ন্যাস প্রভৃতি বায়ুক্রিয়া নিহিত আছে, তৎসমুদায়ই যোগক্রিয়া। এই জন্যই ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপরের দ্বারা ঐ সকল পূজাদির অনুষ্ঠান করাইবার বিধি নাই এবং এই জন্যই এখনও কেবল ব্রাহ্মণের দ্বারাই ঐ সকল করান হইয়া থাকে। যোগীরাই একমাত্র ব্রাহ্মণ পদবাচ্য এবং তাঁহারাই কেবল ঐ সকল পূজাদি প্রকৃত প্রস্তাবে, যথোক্তবিধানানুসারে করিতে সমর্থ। উপস্থিত কালে তাদৃশ ব্রাহ্মণ অত্যন্ত বিরল। ব্রাহ্মণের অভাব বশতঃ শ্রাদ্ধাদিতে আজকাল কুশময় ব্রাহ্মণের পূজা করা হয়। প্রকৃত আচার্য্যের অভাবে ঐ সকল কর্ম্ম তামসিক বা রাজসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তামসিক ও রাজসিক কর্ম্মের ফল কখনও শান্তি হইতে পারে না। এই সকল কর্ম্ম যোগীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, যাহাতে ঐ গুলি বাহ্য যাগ না হইয়া, অর্ন্তযাগে পরিণত হয়, তিনি এরূপ ভাবে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং শিষ্যকেও সেইরূপ সাত্ত্বিক ভাবের উপদেশ দিয়া শান্তি প্রদান করিয়া থাকেন। বাহ্যযাগ কিংবা তামসিক বা রাজসিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা শান্তি লাভের আশা করা দুরাশা মাত্র। অপর দৃষ্টান্ত দিয়া ইহা বুঝানো নিষ্প্রয়োজন; কারণ মহারাজ নিজেই ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

"মহারাজ নিজেই ত এতদিন পূজা যাগ যজ্ঞ অনেক করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম তামসিক বা রাজসিক ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়াই এপর্য্যন্ত একদিনের জন্যও আপনার শান্তিলাভ হয় নাই। বরং অসহ্য অনুতাপ ও শান্তির স্থলে অশান্তিই হইয়াছিল।

" প্রকৃত উপদেষ্টার অভাবে একই ধর্ম্ম পৃথক্ পৃথক্ নানাভাবে পরিণত হইয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, শাক্ত ও বৈষ্ণবাদি নানাপ্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় নানা প্রকার বাহ্যক্রিয়াদির অনুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদগীতোক্ত যে অধ্যাত্ম কর্ম্ম দ্বারা জীবের উদ্ধার সাধন হয়, তদ্‌বিষয়ে কেহ লক্ষ্য করেন না। সে কর্ম্মে জাতি ও বর্ণ ভেদ নাই — সকলকারই অধিকার আছে; সে কর্ম্ম সহজ ও সুখসাধ্য। সকলে সকল অবস্থাতেই ইহার সাধন করিতে পারেন। ইহার জন্য স্ত্রীপুত্রাদি ত্যাগ করিতে হয় না,— কোন উদ্যোগ বা আয়োজনের আবশ্যক হয় না,—'করিব' মনে করিলেই করিতে পারেন। ইহা ইন্দ্রিয় সেবার জন্য নহে; সুতরাং রাজসিক ও তামসিক লোকের রুচির অনুযায়ী নহে, ইহাতে ব্যবসায় বা দোকানদারী নাই। বর্ত্তমানকালে লোকে দেবদেবীর মূর্ত্তিস্থাপনাদি উপলক্ষ্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। পরন্তু ইহার জন্য জীবকে গৈরিকবসনাদি দ্বারা

ভেক ধারণ পূর্ব্বক নানা দেশে বেড়াইতে হয় না। সেই গীতোক্ত কর্ম্ম জীবমাত্রেই সমান ভাবে রহিয়াছে; সুতরাং জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই তুল্যাধিকারী। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খ্রীষ্টান সকলেই উহা সুখে অভ্যাস করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারেন।''

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—''ঠাকুর! প্রাণায়ামাদি বায়ু ক্রিয়ার দ্বারাই যে শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি হইতে পারে, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যাইতে পারে? আমার বোধ হয়, প্রাণায়ামাদি বায়ুক্রিয়া সাধন করাও কঠিন। ইহা অপেক্ষা কি আর এমন কোন সহজ ক্রিয়া নাই, যদ্দ্বারা শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি হয়?''

গুরুপুত্র বলিলেন,—''মহারাজ! প্রাণায়াম যোগসাধনই শান্তি লাভের বা ভগবৎপ্রাপ্তির এক মাত্র মুখ্য উপায়। আপনি যাহাকে সহজ মনে করেন, তাহা প্রকৃত সহজ নহে। ভগবৎসাধন করিতে গেলে, বাক্য বা কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহা করা গৌণ সাধন মাত্র; কেন না, প্রাণ হইতে ঐ সকল গৌণ। প্রাণের অস্তিত্বেই বাক্য মন ইন্দ্রিয় বা শরীরের অস্তিত্ব এবং প্রাণ হইতেই উহাদের উৎপত্তি। প্রাণের উৎপত্তি অব্যক্ত হইতে। সুতরাং বাক্য, মন, ইন্দ্রিয় ও শরীর —ইহারা সকলেই অব্যক্ত হইতে প্রাণ অপেক্ষা দূরে অবস্থিত। বিশেষতঃ প্রাণকে স্থির করিতে না পারিলে, মনও স্থির হয় না।

''আপনি বলিতে পারেন,—কেন? কোন একটা বিষয়ে বা ভগবন্মূর্ত্তিতে মনোনিবেশ করিবার অভ্যাস করিব। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার মন স্থির হইবে।'' কিন্তু ইহা মুখে বলিতে ভাল, কার্য্যে পরিণত করা যে কত কঠিন, তাহা যিনি ভুক্তভোগী তিনিই জানেন; অপরের জ্ঞাতব্য নহে। জীবমাত্রেই ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ অবস্থিতি করিতেছে। ইহাদের প্রত্যেকটিই দুর্জ্জয়। যখন ইহারা সকলে মিলিয়া এক সঙ্গে আক্রমণ করিবে, তখন সেই ভীষণ আক্রমণ হইতে কে রক্ষা করিবে? মন স্বভাবতঃ চঞ্চল; প্রাণের চঞ্চলতা দূরীভূত না হইলে, মন কিছুতেই স্থায়িরূপে এক বিষয়ে স্থির ভাবে অবস্থান করিতে পারিবে না। ইহা মনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব। অতএব প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত আর কিছুতেই সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

''মনে করুন,—আপনি একটা তরকারী পাক করিবেন। পাক করিতে গিয়া হাঁড়ীতে ঝাল, মসলা, লবণ, জল, তৈল বা ঘৃত ও তরকারি দিয়া হাঁড়ী উনানে চড়াইয়া দিলেন; কিন্তু অগ্নি ব্যতীত ঐ সকল তরকারী কি সিদ্ধ করা যায়? নিশ্চয় ঐ গুলি অগ্নি ব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। তদ্রূপ তেজোরূপ প্রাণকে ছাড়িয়া ইন্দ্রিয়গণকে সিদ্ধ (জয়) করিতে পারা যায় না। প্রাণের সাহায্য ব্যতীত কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না, অগ্নির সাহায্য ব্যতীত তরকারী ন্যায় কাঁচা থাকিবে। অসিদ্ধ তরকারী যেমন মনুষ্যের আহারে না আসিয়া পশুদিগের আহারে আইসে, তদ্রূপ অসিদ্ধ (অজিত) ইন্দ্রিয়গণও আত্মার উপকারে না

আসিয়া, পশুরূপী রিপুগণেরই উপকারে আইসে অর্থাৎ এরূপ ব্যক্তি নিজের বুদ্ধির দোষে রিপুকুলের প্রাধান্য পরিবর্দ্ধিত করাইয়া আত্মার অধোগতি সম্পাদন করে মাত্র। আত্মার উন্নতিই আত্মার উপকার! অধোগতিই আত্মার অপকার বা অবসাদ-সম্পাদক; সেই আত্মা প্রাণরূপে সমস্ত জীবেই বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

"যাঁহারা তমঃ বা রজোগুণান্বিত, তাঁহারা পরিণামদর্শী নহেন। তাঁহারা যে যে কর্ম্ম করেন, সেগুলি পরিমাণে ক্লেশকর; কিন্তু আশু মোহকর বা সুখোৎপাদক। তাঁহারা যাহাতে প্রথমে একটু কষ্ট দেখেন, তাহাকেই কষ্টকর মনে করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকেন এবং অযথা তাহার নিন্দা করেন। সুতরাং প্রাণায়ামরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্মেও প্রথমে কিছু কষ্ট মনে করিয়া, উহা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। সাত্ত্বিক কর্ম্ম প্রথম আরম্ভমুখে কিছু কষ্টকর বোধ হইলেও উহা পরিণামে সুখকর। একটি সোজা কর্ম্ম ভ্রমবশতঃ উল্টা অভ্যাসে সড়গড় হইয়া গেলে, তাহাকে সোজা করিতে যেমন একটু কষ্ট বোধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়ামরূপ সাত্ত্বিক কর্ম্মও প্রথমে একটু কষ্টকর হইয়া থাকে। নচেৎ প্রকৃত প্রস্তাবে উহা কষ্টকর নহে। জীবমাত্রেই প্রাণের কর্ম্ম আপনা আপনি হইতেছে। ইহাতে কোন কামনার লেশমাত্র নাই। যে কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষারহিত, সঙ্গরহিত রাগদ্বেষবর্জ্জিত ও পরিণামে সুখকর, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। একমাত্র প্রাণকর্ম্মেই এইগুলি সব দেখা যায়। ইহার সহবাসে যিনি অনুক্ষণ অবস্থান করেন; তিনিও তদ্‌ভাবাপন্ন হন; কেননা, যাহার যেমন ভাবনা, যাহার যেমন সঙ্গ, তাহার গতিও তদ্রূপ। পরে তাহাতে থাকিতে থাকিতে, তিনি তাহার অতীত অবস্থা প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত অবস্থা লাভ করেন।

"গুরূপদেশে প্রাণকে অর্ন্তমুখ করিয়া প্রাণের বৃদ্ধি করার নাম "প্রাণায়াম"। পরন্তু গুরূপদেশ ব্যতীত প্রাণায়াম করিলে, অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা! প্রাণায়ামে বায়ুরোধ নাই। যাহারা প্রাণায়াম জানেন না, তাঁহারাই কিম্ভুত কিমাকার করিয়া বায়ুরোধ ও তদ্দ্বারা সাধারণের সন্দেহ বর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই প্রাণায়ামের অপর একটি নাম "সহজ কর্ম্ম"। জন্মের সহিত যাহা পাওয়া যায়, তাহাকেই সহজ (সহ জায়তে ইতি সহ + জন + ড = সহজ) বলে। এক মাত্র প্রাণকেই জন্মের সহিত পাওয়া যায়। প্রাণই বীর্য্যরূপে জরায়ুতে প্রবেশ করে এবং সেই বীর্য্যরূপী প্রাণের দ্বারা দেহাদি সংগঠিত হয়। সুতরাং প্রাণই "সহজ" এবং এই প্রাণের কর্ম্মই "সহজ কর্ম্ম"। মহারাজ! ইহা অপেক্ষা সহজ কর্ম্ম আর কিছুই নাই। এই সহজ কর্ম্মের দ্বারা যে এক অনির্ব্বচনীয় অবস্থা লাভ হয়, তাহাকেই "সহজাবস্থা" বলে। মহারাজ! এই সহজাবস্থা অত্যন্ত দুর্লভ। ইহা বুঝিবার নহে; ইহা নিজবোধ না হইলে, বুঝিতে পারিবেন না। এই সহজাবস্থাই পরম সুখপ্রদ এবং ইহা একমাত্র সহজ প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত আর কিছুতেই লাভ হইবার নহে।

"পূর্ব্বে দৃষ্টান্ত স্বরূপ প্রাণকে তেজোরূপ বলিয়াছি। এক্ষণে মহারাজের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ তাহা বুঝাইয়া দিতেছি। প্রাণ তেজোময় এবং সেই তেজে উত্তাপও আছে। গাত্রে যে উত্তাপ অনুভূত হয়, তাহা প্রাণ হইতেই আসিতেছে। প্রাণ বহির্গত হইলেই ঐ তাপও সঙ্গে সঙ্গে বহির্গত হয় এবং দেহ একেবারে ঠাণ্ডা হওয়ায় জীবমাত্রকেই জীবলীলা সংবরণ করিতে হয়।

"মহারাজ! জনকাদি ঋষিগণ সকলেই এই সহজ প্রাণরূপ যোগাভ্যাসের দ্বারা মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অপার শান্তি লাভ করিয়াছিলেন। তবে মোহবশতঃ যাঁহাদের অন্তরে এই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখভোগকেই মোক্ষ বলিয়া ধারণা আছে, তাঁহারাই ভোগলালসা পরিতৃপ্তির জন্য এবং নিজ নিজ পান্ডিত্য প্রচারের জন্য এই প্রাণায়ামরূপ মহাধর্ম্মের অযথা নিন্দা করিয়া থাকেন। এই প্রাণায়াম সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত এবং এক এক সম্প্রদায়ের যে এক এক অভীষ্ট দেবতা আছেন, সেই সেই অভীষ্ট দেবতারাও এই প্রাণায়াম যোগাভ্যাস করিতে বিধি দিয়াছেন। তাঁহারা স্বয়ংও এই প্রাণায়ামরূপ আত্মকর্ম্মের দ্বারা সকলের পূজ্য হইয়াছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শ্রীকৃষ্ণ, মহাদেব, শ্রীরামচন্দ্র, সূর্য্য, গণেশ, মনু, ইক্ষ্বাকু, জনক, নারদাদি ঋষিগণ, শুকদেব, দত্তাত্রেয়, যোগিযাজ্ঞবল্ক্য, মৎস্যেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ, গুরু রামানন্দ, তুলসীদাস, কবির, নানক, সুরদাস, প্রমুখ সাধুগণ এবং ইদানীন্তন সাধুদিগের মধ্যে শ্রীজীব গোস্বামী প্রমুখ গৌরাঙ্গদেবের শিষ্যগণ, চন্ডীদাস, আউল চাঁদ (বাউল সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক) এবং রামপ্রসাদ প্রভৃতি সকলেই এই প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের দ্বারা শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইদানীন্তন কালেও সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত প্রাপ্ত যোগীগণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের কাহারও বা সিদ্ধাবস্থা চলিতেছে, কেহবা মুক্তাবস্থায় আছে। নাম প্রকাশ করা গেল না।

"অতএব দেখা যাইতেছে যে, সমস্ত ঋষিগণ ও দেবগণ নিজে নিজে এই প্রাণায়াম করিয়া, উহা আমাদিগকে করিতে বিধি দিয়া গিয়াছেন, তখন ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ করা হিন্দু মাত্রের উচিত নহে। বিশেষতঃ দেবতা ও ঋষিগণ সকলেই কি বোকা ছিলেন, এবং আমাদের বুদ্ধি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা বেশী? এই প্রাণায়াম একান্ত প্রয়োজনীয় না হইলে, তাঁহারা হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক যাবতীয় ক্রিয়াকলাপেই তাহার ব্যবস্থা দিবেন কেন? হায়! দুই একটা শ্লোক বা দুই এক পাতা পুঁথি পড়িয়া আমাদের এত অহঙ্কার হইয়াছে যে, আমরা অনায়াসে বলিয়া থাকি যে, প্রাণায়ামের দ্বারা আমাদের শান্তি বা ভগবৎপ্রাপ্তি কিরূপে হইতে পারে? তাহাও না হয় স্বীকার করা যাইত, যদি ঐ সকল মহাত্মাদিগের ন্যায় এ পর্য্যন্ত কেহ কোন কার্য্য দেখাইতে পারিতেন। অতএব বুঝিতে হইবে যে, ঋষিবাক্য অভ্রান্ত —আমাদের বাক্যই ভ্রান্ত।"

রাজা গুরুপুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—ঠাকুর! আপনার নিকট হইতে সারগর্ভ তত্ত্বোপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া, আমার অন্তরে যে কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইয়াছে, তাহা আমি মুখে ব্যক্ত করিতে পারিতেছি না। ঠাকুর! অদ্য আপনি যেরূপ কৌশলে,—জলন্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা আমাকে তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতে আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে যে, আপনি ব্যতীত আর কেহই আমাকে শান্তিমার্গ দেখাইতে পারিবেন না। রাজা পরীক্ষিৎ যেমন শুকদেবের উপদেশে শান্তি লাভ করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি আপনার নিকট হইতে উপদেশ লাভ করিয়া নিশ্চয় শান্তি প্রাপ্ত হইব। শুকদেবও যেমন পাগল ছিলেন, আপনিও তেমনি পাগল! তবে আপনারা কর্ম্মের পাগল। আপনারা কর্ম্মব্রহ্মে তন্ময় হইয়া পাগল সাজিয়াছেন, আর যাহারা সাধারণ পাগল, তাহারা পার্থিব বিষয়ে তন্ময় হইয়া "পার্থিব পাগল"। সংসারে আপনাদের মত দুই একজন পাগলের প্রকাশ হইলে, সংসারের অন্ধকাররূপ তমোগুণের নাশ হওয়ায় জ্যোতিঃস্বরূপ সত্ত্বগুণের প্রকাশ হয়।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আপনারা সর্ব্বত্র থাকিয়াও সর্ব্বত্র প্রকাশমান নহেন। আপনারা যে সকল সাংসারিক জীবের হৃদয়ে প্রকাশমান, তাঁহারাই জগতীতলে ধন্য। নাথ! আমি অধম অপেক্ষাও অধম। রাজা পরীক্ষিৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সুকৃতিবলেই তপোনিরত মহর্ষি শমীকের পুত্র শৃঙ্গীর নিকট অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বোধ হয়, ঋষিপুত্র ভক্ত রাজার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া, তাঁহাকে মুক্তি দিবার ছলেই শাপ দিয়াছিলেন। ঋষিপুত্র শাপ না দিলে ত রাজা পরীক্ষিৎ শুকদেবের চরণ দর্শন পাইতেন না এবং শুকদেবের চরণ দর্শন না পাইলে, তাঁহার শান্তিও লাভ হইত না। অতএব আমার বিবেচনায় ঋষিপুত্র ভক্ত রাজাকে শাপ দিয়া প্রকারান্তরে বর প্রদানই করিয়াছিলেন। কিন্তু নাথ! আমার দশা কি হইবে? আমিও ত গুরুদেবকে কঠোর দণ্ডাজ্ঞা দিয়াছিলাম; কিন্তু পরীক্ষিতের ন্যায় বরবৎ ব্রহ্মশাপ ত প্রাপ্ত হই নাই? আমার পূর্ব্বে সুকৃতি আছে কি না, জানি না। ইহ জন্মেও কোন সৎকর্ম্ম করিয়াছি কি না, মনে হয় না; বরং দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি বলিয়া মনে হয়। নাথ! আমার কি গতি হইবে? আমি কি আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রাপ্তির উপযুক্ত নহি? আমার যে রূপ অবস্থা, তাহাতে আপনার নিকট হইতে তত্ত্বোপদেশ প্রার্থনা করিতেও সাহস হয় না। নাথ! আমি আপনার শরণাগত,—শিষ্যেরও অনুপযুক্ত; আমাকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ রক্ষা করুন্।"

গুরুপুত্র রাজার এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, রাজাকে ধন্যবাদের সহিত আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—'আপনি ক্ষণকালের জন্য-স্থির হউন; আমি পিতাকে রজ্জুবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি; তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া, আপনার আত্মজ্ঞানলাভজনক কর্ম্মের উপদেশ দিব।"

এই কথা শ্রবণমাত্র রাজার দুই চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুবারি পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,— ওঃ, আমি কি ভাগ্যবান্! গুরুপুত্র আমাকে আত্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া, আমার এই দগ্ধ মরুবৎ অন্তঃকরণে শান্তির সুবিমল স্রোত প্রবাহিত করিবেন!! অনন্তর তিনি গুরুপুত্রের বাক্যানুসারে নিবাত নিষ্কম্প দীপের ন্যায় স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

এদিকে, পুত্রের এই সকল বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, পুত্তলিকাবৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন, আর ভাবিতেছেন,— গোপাল রাজাকে যে সকল কথা বলিতেছে, তাহা কোথাও পড়া দূরে থাকুক, কখন শুনি নাই। এরূপ ভাবের কথা এ কোথায় শিখিল? আমি জানিতাম,— এ পাগল। এখন দেখিতেছি, পুত্র ত পাগল নহে, আমিই পাগল। ব্রাহ্মণীও বলিয়াছিল,— পুত্র ছদ্মবেশে আমাদের ছলনা করে; ও পাগল নহে। তখন মনে করিয়াছিলাম, ব্রাহ্মণী স্ত্রীলোক— স্নেহের খাতিরে এই কথা বলিতেছে; এখন ত দেখিতেছি, ব্রাহ্মণী যাহা বলিয়াছিল, তাহাই ঠিক। ব্রাহ্মণী ধন্যা! সে রত্নগর্ভা; তাহার পুণ্যেই এই অমূল্য রত্ন লাভ করিয়াছি। আমার বিদ্যাবুদ্ধি আজ সব ধরা পড়িয়াছে! এতকাল মনে করিতাম,— আমি রাজগুরু — আমার ন্যায় দশকর্ম্মান্বিত পন্ডিত আর কে আছে? হায়! হায়! ধিক্ আমার পান্ডিত্যাভিমানে! ধিক্ আমার দশকর্ম্মান্বিত উপাধিতে! আমার কোন কর্ম্মেরই জ্ঞান নাই। আমি লোভের বশীভূত হইয়া, অহঙ্কার মদে মত্ত হইয়া সাধন মার্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক বৃথাভিমানে মত্ত ছিলাম। হায়! হায়! ব্রাহ্মণী যদি এই অমূল্য রত্ন গর্ভে ধারন না করিত, তাহা হইলে ত আজ আমায় সপরিবারে বিনষ্ট হইতে হইত,— কেহই রক্ষা করিতে পারিত না। রক্ষা করার আমার ত সাধ্য ছিল না। ব্রাহ্মণী! তুমিই ধন্যা! আমি অত্যন্ত নারকী, ক্ষমতা নাই,— কোন ক্ষমতা ছিলও না; কিন্তু বিষ না থাকিলেও কুলার মত চক্র ছিল। হা ধিক্! এখন পূর্ব্বকথা মনে করিতেও ঘৃণা বোধ হইতেছে।

ব্রাহ্মণ মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় গোপাল নিকটে আসিয়া পিতাকে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"পিতঃ! আমি আপনাকে এতক্ষণ বদ্ধ রাখিয়া অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছি; তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিয়া, এক্ষণে বন্ধন মোচন করিতে অনুমতি করুন।"

পিতা পুত্রকে বলিলেন,—"বাবা! তুমি আর আমাকে পিতা বলিয়া সম্বোধন করিও না। বাবা! তোমার মুখে জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের সহিত যে সকল উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিলাম, তাহা কখনও কর্ণেও শুনি নাই। বাবা! বলিতে কি, এখন তোমার বা রাজার নিকট আমার কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা নাই। বাবা! বাল্যকাল হইতে আজ পর্য্যন্ত সন্ধ্যাহ্নিক

গায়ত্রী জপ প্রভৃতি করিয়া আসিতেছি,—এই সব করিয়া মাথার চুল পাকিয়া গেল; কিন্তু বাবা! শান্তি লাভ দূরে থাক্, এক মুহূর্ত্তের জন্যও আমার পাপময় চিত্ত হইতে অশান্তি দূর হয় নাই; সময় সময় ভক্তিশ্রদ্ধার সহিতও সন্ধ্যাহ্নিক করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই ক্ষণকালের জন্যও নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিতে পারি নাই। এক্ষণে তোমার নিকট এই সকল কথা শুনিয়া তাহার কারণ বুঝিলাম!

"পূর্ব্বে জানিতাম না যে, সন্ধ্যাগায়ত্র্যাদির মধ্যেও যোগক্রিয়া আছে। কেবল পক্ষীর ন্যায় আবৃত্তি করিতাম মাত্র। আমার মন অন্যদিকে বিষয়চিন্তা করিত,—কিছুতেই তাহাকে স্থায়িরূপে কোন এক বিষয়ে রাখিতে পারিতাম না। মুখে শব্দ করিয়া দুর্গানামাদি জপ করিয়া যাইতাম,—মন সম্মুখস্থিত দ্রব্য সামগ্রীতে বা হাটে বাজারে ঘুরিয়া বেড়াইত। বাবা! যোগক্রিয়া না জানা থাকিলে যে সন্ধ্যাও পূজাদি হয় না, তাহা জানিতামও না; কেবল জিনিষপত্র লইয়া কাড়াকাড়ি করিতাম, সুতরাং নিজেও শান্তি পাইতাম না এবং যাঁহার জন্য করিতাম, তিনিও শান্তি পাইতেন না। বাবা! আমি এক্ষণে সব বুঝিয়াছি, আর আমি যোগক্রিয়ার দ্বারা সিদ্ধমনোরথ না হইয়া বাহ্যকর্ম্মে লিপ্ত হইব না।

"বাবা, তুমি আমার পুত্র নহ,—আমিই তোমার পুত্র,—তুমিই আমার পিতা। বাবা! আমি তোমাকে এ দড়ির বাঁধন খুলিয়া দিতে বলি না; তবে রাজাকে যেমন শান্তি লাভের জন্য যোগরূপ কৌশলের উপায় সকলের উপদেশ দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছ, তদ্রূপ যদি আমার কাছেও প্রতিশ্রুত হও যে, তুমি তোমার গর্ভধারিণীকে ও আমাকে শান্তিলাভের উপায় বলিয়া দিবে, তাহা হইলে, তুমি আমার দড়ির বন্ধন খুলিয়া দিয়া, যাহাতে আমি ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহার উপায় করিয়া দাও। বাবা! শান্তিবিষয়ক যেরূপ উপদেশ দিয়াছ, তাহা আমার ন্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে নিতান্ত দুর্লভ। বাবা! আমরা পূজার অন্তে বা কোন যাগযজ্ঞাদির অন্তে যজমানের গায়ে মন্ত্র পড়িয়া শান্তিজল ছিটাইয়া দিতাম, তাহাতে না যজমানের,—না আমার শান্তি হইত। এক্ষণে বুঝিলাম ; তাহাতে যজমানের অশান্তিই হইত; কেননা পয়সা খরচ করিয়া শান্তিজল লইয়া শান্তি না পাওয়ায় বরং তাহার অর্থকষ্ট ও মনঃকষ্ট দুই রকম কষ্টই হইত। আমার তবু কিয়ৎপরিমাণে অর্থকষ্ট দূর হইত; কিন্তু তাহা কয় দিনের জন্যই বা ? ফুরাইলেই আবার যে কষ্ট, সেই কষ্ট। এক্ষণে বাবা! আমি তোমার কাছে সে রকম ক্ষণস্থায়ী কলুষিত, পার্থিব শান্তি সুখের প্রার্থী নহি। রাজাকে শাস্ত্রোক্ত যোগক্রিয়া এবং তদ্দ্বারা সুনির্ম্মল শান্তি লাভের যেরূপ উপদেশ দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ, আমি তাহারই প্রার্থী।

পুত্র বলিলেন,— "পিতঃ! শান্তি কাহারও দিবার অধিকার নাই। একমাত্র আত্মকর্ম্মই শান্তি দিতে সমর্থ; কর্ম্মই ব্রহ্ম এবং সেই কর্ম্মই আত্মকর্ম্ম। যিনি আত্মকর্ম্মের

অভ্যাস করেন, বা তাহাতে লাগিয়া থাকেন, তিনিই শান্তি লাভ করিয়া থাকেন; কারণ সেই কর্ম্ম শান্তিময়। জীব সেই কর্ম্মে লাগিয়া থাকিতে থাকিতে শিব-ভাব প্রাপ্ত হয়। শিবভাবই মঙ্গলময় ভাব এবং তাহাই শান্তি। কর্ম্মের দ্বারা জীবভাবের নাশ হইয়া, যখন শিবভাব-প্রাপ্তি হয়, তখনই পরা শান্তি লব্ধ হয়। পিতঃ! ইহা ত দিবার নহে, — কর্ম্ম করিয়া ইহা লাভ করিতে হয়। আপনি আমার পিতা— গুরু; কেননা আমি আপনাকে আত্মকর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেও কালে তাহাতে আপনার অশ্রদ্ধা আসিতে পারে। তবে আমি প্রতিশ্রুত হইতেছি যে, আমি আপনাকে ও মাতা ঠাকুরাণীকে আমার গুরুদেবের নিকট হইতে উপদেশ দেওয়াইব। রাজাও আমার নিকট উপদেশ চাহিতেছেন; কিন্তু আপনাকে যখন আমার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইতে হইতেছে, তখন তাঁহাকেও গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইব এবং তিনিও তাঁহারই নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন। তিনি মুক্তপুরুষ; সুতরাং তিনিই প্রকৃত শান্তি লাভের উপায় বিধানে সমর্থ।''

ব্রাহ্মণ পুত্রের এই কথা শুনিয়া একবার মনে মনে ভাবিলেন যে, রাজাকে আর সেখানে লইয়া যাইবার আবশ্যক কি? রাজা আমাদের শিষ্য, তাঁহাকে সেখানে লইয়া গেলে, শিষ্য ঘরটি যদি যায়? ব্রাহ্মণ তখনই আবার নিজ মনকে ধিক্কার দিয়া স্বগত বলিতে লাগিলেন, — হা ধিক্, তুমি এখনও আমার শান্তিপথের কণ্টক হইতেছ! তুমি শিষ্যেরও উপযুক্ত নও; তথাপি এখনও তোমার গুরু হইবার অভিলাষ। শিষ্য করিবার ইচ্ছা হইতে ক্ষান্ত হও; ঐ অভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং পুত্র যাহা বলিতেছে, তাহাতে বাধা দিও না। ব্রাহ্মণ তখন নিজ মনোভাব প্রকাশ করিয়া অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

পিতার মনোভাব অবগত হইয়া পুত্র বলিলেন,—''পিতঃ! মনের ধর্ম্মই এইরূপ! মনকে জয় করিতে না পারিলে, ভগবদ্রাজ্যে বা শান্তিরাজ্যে কাহারও যাইবার অধিকার নাই।

এই সকল কথার পর পুত্র পিতার অনুমতিক্রমে তাঁহার বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিলেন এবং পিতাপুত্র উভয়ে রাজার সমীপে উপস্থিত হইলেন।

গুরুপুত্র তখন রাজাকে বলিলেন,—''মহারাজ এইবার আপনার বন্ধনরজ্জু খুলিব এবং রজ্জুবন্ধনের কৌশলও বুঝাইয়া দিব; পরে যদি কোন দৈব প্রতিবন্ধক না ঘটে, তাহা হইলে, আপনাকে ও আমার পিতাকে সঙ্গে করিয়া গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইব এবং তাঁহাকে বলিয়া আপনাদের সকলকে উপদেশ দেওয়াইব।''

গুরুপুত্রের এই কথা শুনিয়া রাজা কহিলেন,—নাথ! আপনি কি আমাকে কৃপা করিবেন না?''

গুরুপুত্র বলিলেন,—''মহারাজ! আমার ত আপনার উপর অকৃপা নাই— বরং

প্রীতিই আছে; আমি যাহা বলিতেছি, তাহাতে আপনার মঙ্গল ব্যতীত অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কারণ, আমার যিনি গুরুদেব, তিনি সাক্ষাৎ মঙ্গলময় আনন্দস্বরূপ। আপনারা তাঁহাকে দেখিয়া ধন্য হইবেন।"

গুরুপুত্রের বাক্য শ্রবণে রাজা বলিলেন,– " তিনি কি এই অধম অকৃতজ্ঞ নরাধমকে দয়া করিবেন?"

গুরুপুত্র উত্তর করিলেন,– তিনি কাহারও প্রতি বাম নহেন। তিনি সকলকেই আত্মতুল্য দেখিয়া থাকেন। তবে যিনি যেমন ভাবে তাঁহার নিকট যান, তিনি তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তিনি দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ, দর্পণের সম্মুখে আমি যেরূপ ভাবে দাঁড়াইব, দর্পণস্থ প্রতিবিম্বেও ঠিক তদ্রূপ ভাবই দেখা যাইবে। আমার গুরুদেবের সম্মুখে যিনি যেরূপ ভাবে উপস্থিত হন, তাঁহাকে তিনি সেইরূপ ভাবেই দেখিয়া থাকেন। তিনি সকল ভাবে থাকিয়াও স্বয়ং ভাবাতীত।"

অতঃপর আপনাকে এই রজ্জু বন্ধনের প্রকৃত তাৎপর্য্য কহিতেছি– "মহারাজ! আপনি যেমন অধুনা রজ্জুদ্বারা বদ্ধ আছেন, জীবমাত্রেই এই প্রকারে মায়া রূপ রজ্জুদ্বারা সংসাররূপ বৃক্ষে আসক্তির সহিত বদ্ধ আছে। মায়ার কোন রূপ নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, আসক্তি পূর্ব্বক মোহিত হইয়া তাহার অস্তিত্ব বোধ করার নাম "মায়া"। কোন বিষয়ে আসক্তি না থাকিলে মায়া থাকে না। যাহার আসক্তি আছে, তাহার নিকট মায়াও আছে। ইহা দ্বারা দেখা যাইতেছে যে, মায়া কাহারও নিকট আছে, কাহারও নিকট নাই। যাঁহার আসক্তির নাশ হইয়াছে, তাঁহার নিকট আসক্তি বা মায়া থাকিয়াও নাই। মহারাজ! আপনাকে কৌশলটি দেখাইয়া দিলে, আপনি অনায়াসে বন্ধন খুলিতে পারিবেন; কিন্তু মহারাজ, যদি কৌশলটি জানিয়াও, বদ্ধাবস্থাকে ভাল মনে করিয়া বন্ধন না খুলেন, তাহা হইলে তাহাতে আমার গুরুদেবের কোনও দোষ নাই। কারণ, তিনি আপনাকে বন্ধন খুলিবার উপায় দেখাইয়া দিলেও যদি আপনি তাহা না খুলেন, তাহা হইলে সে দোষ কাহার? অনেককেই প্রায় এরূপ দেখা যায় যে, তাঁহারা গুরুপদেশে বন্ধন খুলিবার উপায় জানিয়াও সংসারে অত্যন্ত আসক্তি বশতঃ বন্ধন খুলিবার চেষ্টাও করেন না; তাঁহাদের বন্ধন খুলিবার ইচ্ছা মুখে আছে,– কিন্তু কাজে নাই; সুতরাং তাঁহারা শান্তির অভাবে অশান্তিই ভোগ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের শান্তি লাভ হয় না। এক্ষণে মহারাজকে গ্রন্থি খুলিবার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

"মহারাজ! আপনার চরণে কোন বন্ধন নাই– ইহা আপনি দেখিতেছেন। এই চরণের সাহায্যে গ্রন্থি মোচন করিতে হইবে। পায়ের দ্বারা চলা যায় বলিয়া, উহাকে "চরণ" বলে; ইহা বাহিরের চরণ। এইরূপ আর একটি চরণ ভিতরে রহিয়াছে, তাহাই

ভগবচ্চরণ; তাহা জীবমাত্রেই শ্বাসরূপ হইয়াছে। জীবমাত্রেই তাহা দ্বারা চালিত হয় বলিয়া, তাহাকেও "চরণ" বলা যায়। গুরুর উপদেশ অনুসারে এই আভ্যন্তরিক চরণের সাহায্যে তিন গ্রন্থি মোচন করিতে হইবে।

"আপনার কণ্ঠদেশের বাহিরে যেরূপ গ্রন্থি আছে, উহার ভিতরেও তদ্রূপ জিহ্বারূপ গ্রন্থি আছে। গুরুপদেশে সেই জিহ্বারূপ গ্রন্থি ভেদ করিয়া জিহ্বাকে যথাস্থানে রাখিতে হইবে।

"পরে আপনার হৃদয়ের বহির্দ্দেশে যে গ্রন্থি আছে, তাহার ভিতরেও ঐরূপ গ্রন্থি আছে; শান্তি লাভ করিতে হইলে, এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদকরা একান্ত আবশ্যক। গুরুপদেশে অন্য প্রকার কার্য্যের দ্বারা হৃদয়ের বামভাগস্থিত পাপপুরুষকে নষ্ট করিয়া, হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিতে হইবে। নারদের উপদেশে মন্ত্ররূপ চরণের সাহায্যে ভক্তপ্রবর ধ্রুব এই হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়াছিলেন।

"পরে গুহ্যদেশের বাহিরে যেমন একটি গ্রন্থি আছে, উহার ভিতরে তেমনি মূলাধার গ্রন্থি আছে। গুরুপদেশে ঐ চরণের সাহায্যে ঐ গ্রন্থির ভেদ করিতে হইবে।

"যে মায়ারূপ রজ্জু ফাঁসের দ্বারা জীবকে সংসারে জড়াইয়া রাখে, এই তিন গ্রন্থি ভেদ করিতে পারিলেই, তাহা আপনিই খুলিয়া যায়, অর্থাৎ গ্রন্থিভেদ হইয়া গেলেই সহজাবস্থার প্রকাশ হয়। সহজাবস্থা স্থায়ী হইলেই আর মায়া থাকে না; তখনই জীবের "মুক্তাবস্থা"। এই অবস্থায় পরম শান্তি লাভ হয়। আমি আপনাকে ভববন্ধনরজ্জু খুলিবার উপায় বলিলাম। অতঃপর আমার গুরুদেবের নিকট হইতে কার্য্যগ্রহণ করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এইরূপ সঙ্কল্পারূঢ় হইয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ম্ম করিয়া গেলেই আপনার শান্তি লাভ হইবে।"

এই বলিয়া গুরুপুত্র মহারাজের বন্ধনরজ্জু খুলিয়া দিলেন।

অনন্তর রাজা গুরুদেব ও গুরুপুত্রকে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। পরে রাজার গুরুদেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"বৎস! গাত্রোত্থান কর।" রাজা তদ্বাক্য শ্রবণে গাত্রোত্থান করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দন্ডায়মান হইলে, গুরুপুত্র রাজাকে ও নিজ পিতাকে বলিলেন,—"অদ্য রাত্রি অধিক হইয়াছে; চলুন, গৃহে প্রতিগমন করা যাউক; যদি কোন দৈব প্রতিবন্ধক না ঘটে, তবে কল্য প্রভাতে উঠিয়া গুরুদেবের বাটী যাইব।"

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তিনি কোথায় থাকেন?"

গুরুপুত্র কহিলেন,—"তিনি কোন তীর্থস্থানে বাস করেন।"

রাজা বলিলেন,—"তাঁহার কি পুত্রদারাদি আছে?"

গুরুপুত্র কহিলেন,—"হাঁ আছে।"

রাজা বলিলেন,—"তাহা হইলে, যদি আপনি অনুমতি করেন, তবে আমি রাজ্ঞীকেও ত সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি?"

গুরুপুত্র কহিলেন,—"অনায়াসে লইয়া যাইতে পারেন।"

অনন্তর সকলেই তথা হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। রাজা গৃহে আগমন করিয়া রাজ্ঞীকে সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বলিয়া কহিলেন,—"কল্য প্রাতঃকালে গুরুপুত্রের গুরুদেবের নিকট যাইতে হইবে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, যাইতে পার।"

রাজ্ঞী রাজার মুখে গুরুপুত্রের আশ্চর্য্য কৌশলের বিষয় শুনিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, রাজার হৃদয়দেশে নিজ মস্তক স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন,—"নাথ! আমার অদৃষ্টে কি গুরুপুত্রের গুরুদেবের শ্রীচরণ দর্শন লাভ হইবে?" এই কথা বলিতে বলিতে রাজ্ঞীর নয়নযুগল হইতে আনন্দাশ্রুধারা প্রবাহিত হইয়া রাজার হৃদয়দেশ প্লাবিত করিল।

রাজা রাজ্ঞীকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন,—"গুরুপুত্র যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, আমাদের অদৃষ্টে তাঁহার গুরুদেবের চরণ দর্শন লাভ হইতে পারে।"

এদিকে ব্রাহ্মণ পুত্রের সহিত গৃহে উপস্থিত হইয়া, ব্রাহ্মণীকে শত সহস্র আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,—" তোমারই পুণ্যে এবং পুত্রের কল্যাণে এ যাত্রা রক্ষা পাইলাম। তুমি রত্নগর্ভা;তুমি যে পুত্ররত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছ, সেই পুত্রের গুণেই আমাদের তিনকুলের উদ্ধার হইবে! ব্রাহ্মণী! তুমিই ধন্যা! অনেক পুণ্যফলে, আমি তোমার ন্যায় স্ত্রীরত্ন লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি।"

অনন্তর তিনি ব্রাহ্মণীকে পুত্রের পরমাদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় সমস্ত জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন,—"কল্য প্রভাতে আমাদের উভয়কে গোপালের গুরুদেবের নিকট যাইয়া উপদেশ গ্রহণ করিতে হইবে; অতএব অদ্য সকাল সকাল বিশ্রাম করা যাউক।"

অনন্তর ব্রাহ্মণ শয়ন করিলে ব্রাহ্মণী পুত্রের নিকট আসিয়া, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, তাহার মুখচুম্বন করিতে করিতে বলিলেন,—"বাবা গোপাল! তুমি ত আমাকে ও তোমার জনককে তোমার গুরুদেবের নিকট লইয়া যাইবে; কিন্তু বাবা! বৌমাকে কি লইয়া যাওয়া হইবে না? আমরা সকলেই উপদেশ পাইব,আর বৌমাকি উপদেশ পাইবে না?"

পুত্র বলিলেন,—"মা! বৌ উপদেশ পাইয়াছে এবং উপদেশ পাইয়া অনেক উন্নতিও লাভ করিয়াছে।"

এই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী বৌমাকে ডাকিলে, তদীয় পুত্রবধূ আসিয়া শ্বশ্রূদেবী এবং নিজ স্বামীকে প্রণাম করিয়া শ্বশ্রূদেবীকে বলিলেন,—"মা! দাসীকে কেন ডাকিয়াছেন?"

ব্রাহ্মণী বলিলেন,—"মা ! তুমি আমার দাসী নও মা! তুমি আমার লক্ষ্মী। এস মা,

তুমি আমার বাম ক্রোড়ে ব'স।''

পুত্রবধূকে নিজ বাম ক্রোড়ে বসাইয়া ব্রাহ্মণী পুত্রকে বলিলেন,—''বাবা গোপাল! কি পুণ্যে যে তোমাদিগকে লাভ করিয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। বাবা! আজ আমার কি শুভদিন। আজ আমি যেন বৃন্দাবনের গোপালকে কোলে করিয়া আমার কোল পবিত্র করিতেছি।'' বাবা, আমি ধন্যা; আমি গোপালের মা; কিন্তু বাবা দেখিস্,—বৃন্দাবনের গোপাল যেমন ছলনা করিয়া যশোদার নিকট হইতে পলাইয়া গিয়াছিল, তুই যেন আমায় সেইরূপে কষ্ট দিস্ না। বাবা, তুই আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর যে, তুই আমায় কখনও পরিত্যাগ করিবি না।''

পুত্র দেখিলেন যে, বড় বেগতিক! মা মায়ার বশীভূত হইয়া স্নেহবশতঃ এইরূপ বলিতেছেন। তখন তিনি মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—''মা! আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে,—এখন শয়ন করা যাউক। মা! আমি কিছু জানি না,—গুরুদেব সব ঠিক করিয়া দিবেন।''

মা মনে করিলেন, গোপালের ঘুম পাইয়াছে; তাই গোপাল শয়নের কথা বলিতেছে। কিন্তু গোপাল যে ঘুমকে ঘুম পাড়াইয়াছে, তাহা ত আর মা জানেন না; তাই বলিলেন—''বাবা! তবে আজ শয়ন কর,—রাত্রি অনেক হইয়াছে। বিশেষতঃ পরিশ্রমও অত্যন্ত হইয়াছে; আজ আর কোন কথায় কাজ নাই, আমিও শয়ন করিতে যাই।''

এই কথা বলিয়া মাতা উভয়ের মুখচুম্বন করিলে পর, পুত্র ও পুত্রবধূ কোল হইতে উঠিয়া, মাকে প্রণাম করিয়া, শয়ন গৃহে যাইলেন। মাতাও আপনার প্রকোষ্ঠে যাইয়া শয়ন করিলেন।

এদিকে গোপাল মনে করিলেন,—গুরুদেবকে না বলিয়া একেবারে ইঁহাদিগকে লইয়া যাওয়া কি ভাল ? না — বোধ হয় তাহা ভাল নহে। একবার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া —তাহার পর তিনি যেরূপ বলিবেন, সেইরূপ করা উচিত। গোপাল যোগবলে সমস্ত ঘটনা গুরুদেবকে জ্ঞাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,— ''কল্য কি ইঁহাদিগকে লইয়া আপনার সমীপে যাত্রা করিব ?'' তাহাতে এই উত্তর হইল,-''না,তুমি বলিয়া রাখিও যে, আমি কল্য প্রাতঃকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিব; তাঁহাদের আসিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু আমি অতি গোপনভাবে যাইব; তাঁহারাও যেন কোন গোল না করেন।''

গোপাল গুরুদেবের আদেশ শ্রবণ করিয়া, তাহা শিরোধার্য্য করিয়া, তাঁহার চরণে দন্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক সস্ত্রীক নিজ সাধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, গোপাল, পিতাকে গুরুদেবের আদেশ জ্ঞাপন

করিয়া বলিলেন,–"আপনি এই সংবাদ রাজাকে বলিয়া আসুন। ব্রাহ্মণ পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাজাকে গুরুদেবের আদেশ জ্ঞাপন করিতে গেলেন –এমন সময়ে গুরুদেব যোগবলে গোপালের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল গুরুদেবকে সম্মুখে দেখিয়া দন্ডবৎ প্রণাম পূর্ব্বক ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেব গাত্রোত্থান করিতে আদেশ করিলে,গোপাল উত্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে আসিয়া দন্ডায়মান রহিলেন। গুরুদেব গোপালকে নিকটে বসাইয়া তাঁহার সহিত সাধনসম্বন্ধীয় কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

এদিকে ব্রাহ্মণী ও পুত্রবধূ গুরুদেবের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উভয়েই তথায় আসিয়া তাঁহার চরণে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া ভূতলে পড়িয়া রহিলেন। গুরুদেব উভয়কে গাত্রোত্থান করিতে বলিলেন ও উভয়ের কুশলবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুত্রবধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন,– "মা! তোমার সাধনের কুশল ত?"

পুত্রবধূ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন–"ঠাকুর! আপনিত সকলই জানিতেছেন; আমি পতির আজ্ঞা মত যথাসাধ্য উপদেশানুসারে কর্ম্ম করিয়া যাইতেছি। ভালমন্দ আপনিই জানেন। তবে আমি নিত্য অপার আনন্দ লাভ করিতেছি এবং তাহাও আপনার কৃপাবলেই হইতেছে।"

এই সময়ে গোপালের পিতা বাটীতে আসিলেন এবং শুনিলেন যে, গুরুদেব তথায় আসিয়াছেন। পুত্র পিতাকে আসিতে দেখিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া গুরুদেবের নিকট আনয়ন পূর্ব্বক পরিচয় করাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ গুরুদেবকেদর্শন করিয়া একান্ত ভক্তিভরে তদীয় চরণে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক দন্ডবৎ ভূমিতে পড়িয়া রহিলেন।

গুরুদেব ব্রাহ্মণের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিকটে বসাইলেন। ব্রাহ্মণ নিকটে বসিয়া গুরুদেবকে দেখিতে লাগিলেন ও তাঁহার শরীরে শিবমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুত্রকে বলিলেন,– "আমি যাহা দেখিতেছি, তাহা অতীব আশ্চর্য্যজনক। বাবা! আমার অদৃষ্টে যে এরূপ দর্শন হইবে, তাহা স্বপ্নেরও অগোচর। বাবা! ইহা কেবল তোমার ও ব্রাহ্মণীর কল্যাণে হইল। ব্রাহ্মণী তোমায় গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই আমার আজ শিবদর্শন লাভ হইল।"

ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া, অনিমিষ-লোচনে গুরুদেবের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; মুখে আর কথা সরিতেছে না – যেন বাক্‌রোধ হইয়া গিয়াছে; সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া যেন কি এক রকম হইয়া গিয়াছে। শরীর যেন আর তাঁহার নহে; কোথায় যে রহিয়াছেন, তাহা ঠিক বোধ করিতে পারিতেছেন না। এই ভাবে কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, এমন সময় গুরুদেব আদেশ করিলেন যে,– "রাজাকে সংবাদ দাও এবং তাঁহাকে এই স্থানে আসিতে বল; আমি সকলকেই এই স্থানে উপদেশ দিব।"

এইবার ব্রাহ্মণ বলিলেন,—"বাবা গোপাল! তুমি রাজাকে সংবাদ দাও,—আমি গুরুদেবের নিকট হইতে আর কোথাও যাইব না।"

পুত্র পিতার আজ্ঞানুসারে গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া রাজবাটী অভিমুখে গমন করিলেন এবং রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া, রাজার নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। দৌবারিক রাজাকে গুরুপুত্রের আগমন—বার্ত্তা জ্ঞাপন করিল। রাজা শশব্যস্তে গুরুপুত্রের নিকট আসিয়া দন্ডবৎ প্রণাম করিলে, গুরুপুত্র তাঁহাকে বলিলেন,—"মহারাজ! গাত্রোত্থান করুন।"

রাজা গুরুপুত্রের বাক্যে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

গুরুপুত্র বলিলেন,—"মহারাজ, গুরুদেব আপনাদের উপদেশ দিবার জন্য পিতৃদেবের বাটীতে আসিয়াছেন; আপনি রাজ্ঞীকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় যাইতে পারেন। আমি গুরুদেবের আজ্ঞানুসারে তাঁহার আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছি।"

রাজা গুরুপুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"প্রভো! আমি আপনার সঙ্গেই যাইব; রাজ্ঞীর যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি।"

অনন্তর রাজা মন্ত্রীকে আহ্বান করাইয়া বলিলেন,—" আমি গুরুদেবের বাটীতে চলিলাম, তথায় আমার কিছু প্রয়োজন আছে। রাজ্ঞীও তথায় যাইবেন; আপনি তাঁহার যাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিউন। কেবল মাত্র দশ পনের জন পদাতিক সৈন্য ও দুইজন দাসীর অধিক অনুচর তাঁহার সঙ্গে প্রেরণ করিবেন না। যেন অধিক গোলমাল না হয়।"

অতঃপর রাজা গুরুপুত্রের অনুমতি লইয়া স্বয়ং রাজ্ঞীকে এই সংবাদ দিতে গমন করিলেন। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজা রাজ্ঞীকে বলিলেন,—"আমি গুরুপুত্রের সহিত চলিলাম; তুমিও আমার পশ্চাৎ গুরুদেবের বাটীতে এস। মন্ত্রীকে আমি তোমার গমনের বন্দোবস্ত করিতে বলিয়াছি; অধিক বিলম্ব করিও না। গুরুপুত্রের নিকট শুনিলাম যে, আমাদের উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার গুরুদেব তথায় আসিয়াছেন; অতএব আমি অগ্রে চলিলাম।"

রাজ্ঞী রাজাকে প্রণাম পূর্ব্বক আনন্দচিত্তে বলিলেন,—"নাথ! দাসীও আপনার অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু নাথ! দেখিবেন, দাসী যেন বঞ্চিত না হয়; দাসীর বল বুদ্ধি ভরসা সমস্তই আপনি।"

এই কথা বলিয়া রাজ্ঞী রাজাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর রাজা রাজ্ঞীর নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া গুরুপুত্রের সঙ্গে পদব্রজে চলিলেন।

ওদিকে মন্ত্রীও রাজাজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র যানাদি প্রস্তুত করাইয়া দাসীমুখে রাজ্ঞীকে সংবাদ

পাঠাইয়া দিলেন। রাজ্ঞী প্রস্তুতই ছিলেন, সংবাদ পাইবামাত্র দুই জন দাসী সঙ্গে লইয়া যানারোহণ পূর্ব্বক গুরুদেবের বাটীতে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজা পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই রাজ্ঞীর শিবিকা গুরুদেবের বাটীর দ্বারে আসিয়া পৌছিল। রাজাও সেই সময় আসিয়া পৌঁছিলেন। রাজ্ঞীর সঙ্গে যে সকল লোক আসিয়াছিল, রাজা তাহাদিগকে একটু দূরে অবস্থিতি করিতে বলিলেন। রাজা রাজ্ঞীকে নিজে সঙ্গে করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাজ্ঞীর সহিত অগ্রে নিজ গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। পরে গুরুদেব রাজাকে ও রাজ্ঞীকে পুত্রের গুরুদেবের সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। রাজা ও রাজমহিষী উভয়ে তাঁহার পদতলে প্রকৃষ্টরূপে দন্ডবৎ পড়িয়া রহিলেন।

গুরুপুত্রের গুরুদেব রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! গাত্রোত্থান কর, এবং আত্মকর্ম্ম লাভ করিয়া, সেই কর্ম্মের সাহায্যে মুক্তিলাভ কর। আমি তোমার কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আসিতেছি। তোমার কার্য্য দেখিয়া, তোমাকে কর্ম্মের উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে, আমি বহুদূর হইতে এখানে উপস্থিত হইয়াছি।"

তৎপরে রাজ্ঞীকে বলিলেন,—"মা! তুমিও গাত্রোত্থান কর এবং আমার নিকট হইতে পতির সহিত আত্মকর্ম্মের উপদেশ গ্রহণ কর।"

গুরুদেবের অনুমতি পাইয়া রাজ্ঞী উঠিয়া অবনতমস্তকে রাজার বামপার্শ্বে বসিয়া রহিলেন।

তাহার পর গুরুদেব রাজা ও রাজ্ঞীকে আপনার নিকট বসাইলেন এবং উভয়ের অঙ্গ প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, রাজাকে আত্মজ্যোতিঃ দর্শন করাইয়া দিলেন। রাজা স্বশরীরস্থ আত্মজ্যোতিঃ দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া, সেই রূপেরই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন,—"তুমি এই যে রূপ দর্শন করিলে, তাহা রাজা পরীক্ষিৎও শুকদেবের নিকট হইতে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তিনি এইরূপে তন্ময় হইয়া রূপাতীত অবস্থা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু একটি বিষয় তোমায় বলিয়া রাখি— 'শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি;' এই আত্মকর্ম্মই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; কিন্তু ইহাতে অনেক বিঘ্ন আছে; সেইগুলি তোমাকে কাটাইয়া চলিতে হইবে। তোমার নিজেরই মন তোমায় ফাঁকি দিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিবে এবং নানা প্রকার প্রলোভন ও সন্দেহ আনিয়া দিবে; কিন্তু তুমি এই যে অবলম্বন প্রাপ্ত হইলে, তাহা কণ্ঠাগত প্রাণ হইলেও কিছুতেই পরিত্যাগ করিও না। পাষন্ড মন তোমাতে নানা প্রকার কৌশলে বুঝাইতে চেষ্টা করিবে যে, যে জ্যোতিঃ তোমার দর্শন হইল, তাহা আত্মজ্যোতিঃ নহে। তুমি দৃঢ়তা সহকারে বলিও— ইহা যদিই আত্মজ্যোতিঃ না হয়, ইহা ত আমার শরীরাভ্যন্তরস্থ জ্যোতিঃ।

"মনকে বাহ্য বিষয়ে অবলম্বন দিলে, সে কিছুতেই স্থির হইবে না; একটার পর

একটা — এইরূপ নানা বিষয়ে মত্ত হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ নিজ মনকে বর্হিবিষয় হইতে যত অর্ন্তবিষয়ে রাখিতে পারিবে, ততই শান্তির নিকট যাইবে। অর্ন্তবিষয়ে আসক্ত হইতে না পারিলে, বর্হিবিষয়ে অনাসক্ত হইতে পারিবে না। বর্হিবিষয়ে অনাসক্ত হইলেই বর্হিজগতে শান্তিলাভ করিবে। তাহার পর অর্ন্তবিষয়ে উপরিউক্ত আত্মজ্যোতিতে থাকিতে থাকিতে যখন জ্যোতির অতীত অবস্থায় যাইবে, তখনই রূপাতীত অবস্থা লাভ করিবে। এ অবস্থায় অর্ন্তর্ব্বহিঃ নাই,অর্থাৎ তখন অন্তর্ব্বহিঃ সমান হইয়া যায়। সে অবস্থায় সকল বিষয়েরই অতীত অবস্থা লাভ করা যায় — তাহাই পরম শান্তির অবস্থা।

"এইবার তোমায় আত্মকর্ম্ম এই প্রাণায়াম দিতেছি — ইহার দ্বারা তোমার মনের দৃঢ়তা হইবে এবং ইহার অবলম্বনে তুমি ভবসমুদ্র পার হইতে পারিবে। ভবসমুদ্র পার হইবার ইহাই একমাত্র তরণী। ইহাই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম; ইহা ব্যতীত আর সাত্ত্বিক কর্ম্ম নাই! ইহা আপনা আপনিই হইতেছে; ইহাতে কোন কামনা নাই, — সঙ্গেরও ইচ্ছা নাই, দ্বেষ বা প্রীতিও নাই। তুমিও যদি ইহার সহবাসে থাকিতে পার, তাহা হইলে, তুমিও সঙ্গরহিত ও সাত্ত্বিকভাবাপন্ন হইবে — "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।" ভরত রাজা যেমন হরিণ শিশুর সহবাসে থাকিতে থাকিতে তাহাতেই তন্ময় হইয়া হরিণযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তেমনি যিনি যাঁহার সহবাসে থাকেন, তিনিও তদ্‌ভাবাপন্ন হইয়া যান। অতএব এই সহজ প্রাণায়ামের সহবাসে থাকিতে থাকিতে আপনিও ইহাতে তন্ময় হইয়া সহজাবস্থা,— গুণাতীত অবস্থা,— কৈবল্য অবস্থা, লাভ করিতে পারিবেন। এইগুলি একই অবস্থার নামান্তর মাত্র।"

পরে গুরুদেব রাজাকে একটি কর্ম্ম করাইয়া একটি অবস্থা দেখাইয়া দিলেন। রাজা তাহাতে নিজে এক অপূর্ব্ব স্থির আনন্দ অনুভব করিলেন। গুরুদেব রাজাকে বলিয়া দিলেন, —" আপনি এই অবস্থা স্মরণে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। কর্ম্মের দ্বারা ইহা আপনিই হইবে। এই আত্মকর্ম্মের সহিত আপনাকে সমস্ত উপদেশ বলিলাম। এক্ষণে আপনি কর্ম্মের দ্বারা শান্তিলাভ করুন। এই কর্ম্মের দ্বারা দেবগণ, সাধুগণ, ঋষিগণ সকলেই সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করিয়াছেন। আপনিও সংশয়রহিত হইয়া কার্য্য করিলে, ইহার দ্বারা সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারিবেন। মুক্তাবস্থাই পরম শান্তির অবস্থা। এক্ষণে আপনার যদি কোন বিষয়ে সন্দেহ বা সংশয় থাকে, তাহা আমাকে বলুন, আমি তাহা ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছি।"

রাজা গুরুদেবকে বলিলেন -" নাথ! আমার কোন বিষয়ে সন্দেহ বা সংশয় হইতেছে না, কারণ, আপনি ত আমাকে সমস্ত প্রত্যক্ষই করাইয়া দিলেন। যাহা কখনও কর্ণেও শ্রবণ করি নাই, তাহা আপনি প্রত্যক্ষ অনুভব করাইয়া দিলেন। যাহাদের নিজের

কিছু করিবার ইচ্ছা নাই; অথবা যাহাদের মোক্ষলাভের বা শান্তিলাভের ইচ্ছা নাই, তাহারাই নিজের দলপুষ্টির মানসে নানা প্রকার অসার কূটতর্কের অবতারণা করিয়া, বালকের ন্যায় ইহাতে সংশয় বা সন্দেহ করিয়া ও জন্মাইয়া লোকসংগ্রহ করিয়া থাকে। নাথ! আমার আর কোন বিষয়েই সংশয় বা সন্দেহ নাই; বরং অপার আনন্দই লাভ করিয়াছি — ঈদৃশ আনন্দ এ পর্য্যন্ত কোন কর্ম্মেই প্রাপ্ত হই নাই। আমি নিজে অনেক যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই আমার তৃপ্তিলাভ হয় নাই। কিন্তু আপনি যে রূপ দর্শন করাইয়া দিলেন ও যে কর্ম্মের উপদেশ দিলেন, তাহা অল্পকাল মাত্র করিয়াই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি। সেই কর্ম্ম দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া করিলে যে নিশ্চয় শান্তিলাভ করিব, তাহাতে আর আমার অণুমাত্র সন্দেহ নাই।''

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন,—''আপনি যাহা বলিলেন, তাহা ঠিক। আপনি যে ভাবে উপদেশ পাইয়াছেন, তাহাতে এইরূপই সম্ভব। আপনার নিজের গুণে তাহা হইয়াছে; উপদেশকালে উপদেশদাতা ও উপদেশ-গ্রহীতা যেরূপ ভাবে থাকেন, তাহার ফলও তদ্রূপ হইয়া থাকে। গ্রহীতা যদি রাজসিক বা তামসিক ভাবে থাকেন, তাহা হইলে, তাহার ফলও তদনুরূপ হইয়া থাকে। এই কারণে বর্ত্তমান সময়ে দীক্ষাদি সব রাজসিক ও তামসিক হইয়া থাকে; সুতরাং তাহার ফলও তদনুরূপ হয়। পূর্ব্বকর্ম্মফলে উপদেশকালে পার্থিব বিষয়ে আপনার মন ছিল না; সুতরাং আপনার ফলও উত্তম হইয়াছে।''

রাজা বলিলেন, ''নাথ! পূর্ব্ব হইতে আপনি 'আমার সহিত 'তুমি' 'তুমি' বলিয়া কথা কহিতেছিলেন; এক্ষণে আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন কেন? আমি আপনার দাসানুদাস; আমাকে 'আপনি' বলায় ত আমার অমঙ্গল হইতে পারে?''

গুরুদেব বলিলেন,—''আমার দ্বারা আপনার কোন বিষয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনা নাই; বরং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহাই আমার দ্বারা হইবে। পূর্ব্বে যতক্ষণ আপনি উপদেশ প্রাপ্ত হন নাই, ততক্ষণ আপনার নিকট আমার প্রার্থনাও ছিল এবং আপনি আমাকে (বা আত্মাতে) অজ্ঞাত ছিলেন। অজ্ঞাত থাকায় আমা হইতে পর অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয়ে ছিলেন। এইরূপ পর থাকায় 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলাম; কিন্তু যখন আপনি উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন, তখন আপনি আমাকে বা আত্মাকে জ্ঞাত হওয়ার পর হইতে আপনি আপনার বা আত্মার হইয়া গেলেন। সুতরাং এক্ষণে আর 'তুমি' নাই— সব আপনার হইয়া গিয়াছে। এইরূপে যখন আপনি সাধন দ্বারা আমাকে অভেদ দেখিবেন, তখন বুঝিতে পারিবেন, সেখানে 'তুমি'ও নাই — 'আমি'ও নাই। সাধনদ্বারা যখন আপনার এই 'তুমি' 'আমি' যাইবে, তখন আপনার গতির পর পরমগতি অর্থাৎ পরম শান্তি লাভ হইবে।''

রাজা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—''নাথ! আমি পূর্ব্ব হইতে সন্ধ্যা আহ্নিক

প্রভৃতি যাহা যাহা করিয়া আসিতেছি, এক্ষণে কি তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিব ?''

গুরুদেব বলিলেন–''না'', ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আমি ত আপনাকে কোন বিষয় পরিত্যাগ করিতে বলি নাই; কারণ, ইচ্ছাত্যাগ না হইলে, পরিত্যাগ হয় না – ইচ্ছাকেই ত্যাগ করা উচিত। সেই ইচ্ছাত্যাগও ইচ্ছা করিয়া করা উচিত নহে; কারণ, তাহাও ইচ্ছা। আর ইচ্ছা করিলেই যে ইচ্ছা ত্যাগ হইবে, তাহাও নহে। তবে আপনি বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করিয়া, সাধারণকে দেখাইতে পারেন ও বলিতে পারেন যে, আমি বৈরাগী বা ত্যাগী; কিন্তু উহা মিথ্যাচার মাত্র। এই আত্মকর্ম্মের দ্বারা যখন স্বতঃ ইচ্ছারহিত অবস্থা লাভ হয়, তখনই যথার্থ বৈরাগ্য বা ত্যাগের অবস্থা। নচেৎ ইচ্ছা থাকিতে বৈরাগ্য বা ত্যাগ হইতে পারে না।

''ইচ্ছাই বন্ধের কারণ। সদ্ভাবেই হউক বা অসদ্ভাবেই হউক, জীবের দেহে এই ইচ্ছা যতকাল বর্ত্তমান থাকিবে ততকাল তাহার অশান্তির নাশ হইবে না। ইচ্ছার নাশ হইলেই অশান্তির নাশ হইবে। আপ্ত ব্যক্তির কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই; কেননা তিনি কর্ম্মের অতীত অবস্থায় থাকায়, তাঁহার প্রাপ্তব্য আর কিছুই নাই, সুতরাং তাঁহার ইচ্ছা অনিচ্ছা কিছুই নাই। যাঁহারা আপ্ত,তাঁহারাও এই আত্মকর্ম্মের দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, প্রাপ্তির ইচ্ছার অতীতাবস্থায় যাইয়া আপ্ত হইয়াছেন। কারণ প্রাপ্তি হইলে আর প্রাপ্তির ইচ্ছা থাকে না। তাঁহারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, তদ্ভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছেন। আত্মার কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই এবং আত্মার ইচ্ছা বা অনিচ্ছা না থাকায়, আপ্তেরও ইচ্ছা বা অনিচ্ছা নাই। আপনিও এক্ষণে আত্মকর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন; আপনি তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া চলুন। আপনার যেরূপ প্রকৃতিতে জন্ম হইয়াছে, তাহাতে আপনি আপনার বংশের প্রকৃতি অনুযায়ী যে সকল বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান পূর্ব্ব হইতে করিয়া আসিতেছেন, ঐ সকল একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া, করিয়া চলুন। তাহার পর ঐ সকল যখন বাহ্য কর্ম্ম বলিয়া আপনার নিজবোধ হইবে, তখন ঐ গুলি আপনা হইতেই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে,– ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে না।

''সন্ধ্যার উপাসনাও যোগক্রিয়া। যাঁহাদের যোগক্রিয়া লাভ হয় নাই, তাঁহাদিগের জন্যই এই বাহ্য সন্ধ্যা রহিয়াছে। সাধক গুরুপদেশে এই বাহ্য সন্ধ্যার স্থলে যোগক্রিয়ার দ্বারা অন্তঃসন্ধ্যা করিয়া থাকেন। অন্তঃসন্ধ্যাকে সাধন দ্বারা বন্ধ্যা করিয়া স্থিতি লাভ করিতে পারিলে, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু বাহ্য সন্ধ্যায় তাহা হয় না। ত্রিকালীন সন্ধ্যার উপাসনা করিবার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু কোন কোন বৈদান্তিক পন্ডিতেরা বাহ্যদৃষ্টিতে বলিয়া থাকেন, সন্ধ্যা দুইবার করা উচিত; কারণ মধ্যাহ্নে সন্ধ্যা নাই। তাঁহারা আরও বলিয়া থাকেন যে, যদি মধ্যাহ্ন সময়ে বিধি থাকে, তাহা হইলে মধ্য রাত্রিতে সন্ধ্যা না

করা হয় কেন? তাহা হইলে ত্রিসন্ধ্যার স্থলে চতুঃসন্ধ্যা হয়। এই যুক্তি দেখাইয়া, তাঁহারা বলেন যে, সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঊষাকালে এক সন্ধ্যা, আর সূর্য্যাস্তের সময় গোধূলি এক সন্ধ্যা। এই উভয় সন্ধিক্ষণে কালের যে মিলন বা লয়, তাহাই উভয় সন্ধ্যা। এই যুক্তি দেখাইয়া, তাঁহারা প্রাতঃ ও সায়াহ্ন এই উভয় সময়ে সন্ধ্যার উপাসনা করিতে বলেন।

"বাস্তবিক বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না এবং যুক্তিবিরুদ্ধও নহে। কিন্তু যাঁহাদের অর্ন্তদৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহারা এই যুক্তিকে ভুল বলিয়া থাকেন। ত্রিকালীন সন্ধ্যোপাসনার যে বিধি আছে, তাহাই ঠিক। কারণ, কাল অনন্ত; সেই কাল ঘটস্থ হওয়ায় তাহার সংখ্যা হইতেছে। সেই সংখ্যা হইতেই সাংখ্য। সেই কাল ত্রিভাগ হওয়ায় ত্রিকাল অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ –ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুন্না। ইহাতে তিনটি সন্ধিস্থল বা মিলনস্থল রহিয়াছে। ঘটস্থ কালরূপী প্রাণ ইড়া অর্থাৎ চন্দ্রনারী হইতে যখন পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্য নাড়ীতে যায় তখন, অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ী ছাড়িয়াছে অথচ সূর্য্য নাড়ীতে পৌঁছে নাই, এই সন্ধিক্ষণই এক সন্ধ্যা। ইহা সুষুন্নার বা সত্ত্বগুণের অবস্থা। এই অবস্থার স্থিতি লাভ করিতে না পারায় সূর্য্য নাড়ীতে প্রাণের গতি হইল। আবার পিঙ্গলা অর্থাৎ সূর্য্যনাড়ী হইতে ইড়া অর্থাৎ চন্দ্রনাড়ীতে যাইবার সময় প্রাণ যখন মধ্যাবস্থায় আইসে, তখন' এক সন্ধ্যা; কারণ, তখন সূর্য্যনাড়ীতেও প্রাণের গতি হইতেছে না এবং চন্দ্রনারী ইড়াতেও গতির আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং সন্ধ্যা উভয়বিধ হইল, – প্রাতঃ ও সায়াহ্ন সন্ধ্যা।

"এইবার মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার কথা বলিব। ইহা যোগীব্যতীত অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহা কল্পনা করিলে হইবে না,– কার্য্যে পরিণত করা উচিত। একমাত্র ব্রাহ্মণই প্রকৃত সন্ধ্যা করিতে সমর্থ। যোগীই ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য। তৎপুত্রও ব্রাহ্মণ নহেন,–ব্রাহ্মণপুত্র মাত্র। ব্রাহ্মণ বিরল হওয়ায় অন্তঃসন্ধ্যা প্রায় লোপ পাইতে বসিয়াছে। সাধক এই উভয়বিধ সন্ধ্যার উপাসনা বা সেবায় রত থাকিতে থাকিতে, যখন মধ্যাবস্থা সুষুন্না অর্থাৎ সত্ত্বগুণে স্থিতিলাভ করেন, তখন তিনি এই সত্ত্বগুণে বা সুষুন্নায়ও একটি সন্ধ্যা দেখেন। তাহা সত্ত্বগুণ হইতে গুণাতীত অবস্থায় যাওয়া অর্থাৎ সত্ত্বগুণেও নাই, গুণাতীত অবস্থাতেও স্থিতিলাভ করিতে পারেন নাই, – একবার সত্ত্বগুণে আবার সত্ত্বগুণ বা সুষুন্না ছাড়িয়া গুণাতীত অবস্থায় আসা। এই সত্ত্বগুণ অর্থাৎ সুষুন্না এবং গুণাতীত অবস্থা এই দুয়ের মধ্যেও এক সন্ধি আছে। ইহাই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা। যোগী এই মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার উপাসনা করিয়া, ক্রমে গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে পারেন।

"প্রকৃত পক্ষে এই ত্রিসন্ধ্যা। এই সকল সন্ধি স্থলে অণুস্বরূপে সূক্ষ্মভাবে স্থিরকাল রহিয়াছে। ইহাই সন্ধিক্ষণ বা মাহেন্দ্রক্ষণ। যোগী ব্যতীত অপরে এই কালকে অবগত

নহে। যোগী সহজ প্রাণায়ামের অভ্যাসে মাহেন্দ্রক্ষণের বিস্তার করিয়া, সেই অবস্থায় সর্ব্বদা থাকেন। বায়ু রোধ করিয়া যে প্রাণায়াম করা হয়, তাহার দ্বারা এ অবস্থা লাভ দুঃসাধ্য। সহজরূপ অর্ন্তমুখ প্রাণায়ামব্যতীত ইহা আর কিছুতেই লাভ হইবার নহে। এইরূপ অন্তঃসন্ধ্যার উপাসনায় সাধক সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারেন। তবে যিনি অর্ন্তবিষয়ক আত্মযোগের উপদেশ পাইয়া বাহ্য সন্ধ্যায় মগ্ন হইয়া থাকেন, তাঁহার বিড়ম্বনা মাত্র। পাছে কেহ আত্মযোগের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য যজ্ঞে মগ্ন হইয়া পড়েন, এই আশঙ্কায় স্বয়ং মহাদেব ও ঋষিগণ বাহ্য যাগযজ্ঞকে ধর্ম্মরূপ যোগবিঘ্ন বলিয়াছেন। অতএব আপনি আত্মকর্ম্মে মগ্ন হইয়া, অনাসক্ত ভাবে বাহ্যকর্ম্ম করিয়া চলুন। ইহাতে কিঞ্চিৎ উপকারও আছে; সেই উপকার এই – যে সকল অজ্ঞ ব্যক্তি সাত্ত্বিক কর্ম্ম করিতে চাহে না, তাহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য বাহ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া আটকাইয়া রাখা। অনন্তর তাহারা যখন বুঝিবে যে, বাহ্য কর্ম্মে সুখ নাই, তখন তাহারা আপনা আপনিই সাত্ত্বিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।

অতএব আপনি যে সকল বাহ্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, আত্মকর্ম্মে মগ্ন হইয়া সে সকল করিয়া চলুন। কিছুই ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিবেন না। তবে আত্মকর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই মগ্ন হইবেন না। আত্মকর্ম্মে মগ্ন হইতে পারিলেই আপনা আপনিই বাহ্য কর্ম্মে অনাসক্ত হইয়া যাইবেন, আপনাকে ইচ্ছা করিয়া কিছুই পরিত্যাগ করিতে হইবে না– সে সকল আপনিই পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। জোর করিয়া কোন বিষয় পরিত্যাগ করিলেই অশান্তি হইবে। তাহা করিবেন না। তবে যে সকল কর্ম্ম সমাজে নিতান্ত ঘৃণিত, সেগুলি অন্তরে পরিত্যাগ করা না হইলেও, অর্থাৎ মনে মনে করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, কার্য্যে পরিণত করা উচিত নহে; কারণ সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা সমাজের অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

"যে সকল কর্ম্মের দ্বারা সাধারণের অনিষ্ট বা কুশিক্ষা হয়, সে সকল করা উচিত নহে। অন্তরের অসদিচ্ছা সকল গোপন না করিয়া, উপদেষ্টার নিকট প্রকাশ করিবেন। তিনি তাহার উপায় বলিয়া দিবেন। উপদেষ্টার উপদেশ মত চলিলে, অন্তরে কোন কুপ্রবৃত্তি থাকে না। কিন্তু উপদেশ অনুসারে না চলিলে, অনিষ্টই হইতে পারে। উপদেশ মত ঠিক চলিলে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়েরই নাশ হইয়া যাইবে।"

রাজা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,–"নাথ! শাস্ত্রাদি কি কি পাঠ করিতে হইবে? বিশেষতঃ যখন কোন কাজ কর্ম্ম থাকিবে না, তখন চুপ করিয়া বা বৃথা আমোদ আহ্লাদে সময় না কাটাইয়া, সাধুসঙ্গরূপ শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা ত অনেক উপকার হইতে পারে?"

গুরুদেব বসিলেন,–"শাস্ত্রাদির মধ্যে একমাত্র গীতা পাঠ করিতে পারেন।

অপরাপর শাস্ত্রের দ্বারা আপনার কিছুই লাভ হইবে না;বরং অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রের মীমাংসা করিতে না পারায়, ঘোর সংশয়ে পতিত হইয়া, 'আমি জ্ঞানী হইয়াছি' এই অভিমানে, কর্ম্মে অনাস্থা হওয়ায় ঘোর বিপদে পড়িবেন। তবে যদি কোন সংযমী পুরুষের নিকট শাস্ত্র পাঠ করেন, তাহা হইলে তাহাতে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাই। কারণ, শাস্ত্র সকলও সংযমী পুরুষের দ্বারা রচিত হইয়াছে। সংযমীর ভাব সংযমীই অবগত হইতে পারেন। কিন্তু সংযমী পুরষের ভাব অসংযমী পুরুষ কিরূপে বুঝিতে সমর্থ হইবে? শাস্ত্রের সূক্ষ্মভাব অবগত না হইয়া, যদি জড়ভাব অবগত হওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাতে অমঙ্গল ব্যতীত কিছুমাত্র মঙ্গলের আশা নাই। তাহা আপনাতেও ঘটিয়াছে – আপনি শাস্ত্রের জড়ভাবের অর্থমত কার্য্য করিয়া কি কিছু শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? আপনিও পুরাণাদি শ্রবণ করিয়াছিলেন; তাহা দ্বারা আপনার কি লাভ হইয়াছিল? বরং অশান্তির জ্বালায় জ্বালাতন হইয়া আপনাকে কঠোর দন্ড প্রচার করিতে হইয়াছিল। আপনার দন্ড প্রচারের ক্ষমতা ছিল, তাই দন্ড প্রচার করিয়া পূর্ব্ব সুকৃতি বলে আত্মকর্ম্ম লাভ করিলেন। যদি আপনার পূর্ব্ব সুকৃতি না থাকিত, তাহা হইলে, হয়ত, আপনার মতিঅন্যরূপ হইয়া, বহুতর নরহত্যাও হইতে পারিত; কারণ আপনার সে ক্ষমতাও আছে। যাহাদিগের দন্ড দিবার কোন ক্ষমতা নাই, তাহারা পড়িয়া মার খায়।

"মনে করুন্, পুরাণের লীলাখন্ডের দ্বারায় কাহার কি লাভ হইতে পারে? লীলাখন্ডে আত্মযোগের বিভূতি বর্ণন আছে। উক্ত বিভূতি সকল আত্মযোগের অন্তর্গত। আত্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া, যদি বিভূতির (যোগৈশ্বর্য্য বিশেষের) উপাসনা করা যায়, তাহাতে না হয় ঐশ্বর্য্যই লাভ হল। কিন্তু ঐশ্বর্য্যে শান্তি কোথায়? এই জগৎ যাহা দেখিতেছেন, ইহাই পুরাণ। ইহার মধ্যেই আত্মা রহিয়াছেন। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি জগতের রূপে মোহিত না হইয়া, আত্মাকেই দেখেন। যাঁহারা আত্মাকে জানেন না, তাঁহারা আত্মাকে না দেখিয়া আত্মার বিভূতি এই মায়ারূপ জগৎ দেখিয়া থাকেন। এই মায়ারূপ জগতে ভালমন্দ দুইই আছে। যাঁহারা জগৎ-পুরাণের আত্মাকে অবগত নহেন, তাঁহারাই এই মায়িক ভালমন্দের জন্য অশান্তি ভোগ করেন। এই জগৎরূপ পুরাণ অবলম্বন করিয়াই পুরাণগ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।

"আত্মনারায়ণের বিভূতিই এই দৃশ্যমান জগৎ। দৃশ্যমান পদার্থ মাত্রই মায়া। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যিনি আত্মাকে দেখেন, তিনিই আত্মা-নারায়ণের মায়ারূপ লীলা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কারণ, আত্মাতে তাঁহাদের লক্ষ্য থাকায় তাঁহারা আত্মময় জগৎই দেখেন, অর্থাৎ সাধারণে যে রূপ ভাবে জগৎ দেখিয়া থাকেন, এরূপ ভাবে নহে। তাঁহাদের ভাবে অভাব বা জ্বালা নাই। এ অবস্থা নিজবোধরূপ। সে

অবস্থা যিনি পাইয়াছেন, তিনিই অবগত হইয়াছেন। সে অবস্থাটি বলিয়া বুঝাইবার নহে, আত্মকর্ম্ম করিয়া বুঝিতে হয়; নচেৎ বুঝিবার উপায় নাই। কর্ম্ম না করায় যাঁহারা এই সূক্ষ্মভাব অবগত নহেন, তাঁহারা পুরাণোক্ত আত্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল মাত্র আত্মার বিভূতি রূপ লীলা পাঠ করিয়া কোন শান্তি লাভ করিতেছেন না। জীব মাত্রেই যেমন আত্মানারায়ণের বিভূতিরূপ জগতে আসক্ত হইয়া কষ্ট পাইতেছে, তদ্রূপ তাঁহারা পুরাণগ্রন্থস্থিত আত্মযোগ অবগত না হওয়ায়, কেবল পুরাণোক্ত বিভূতিরূপ লীলা খন্ডে আসক্ত হইয়া শান্তির অভাবে অশান্তি ভোগ করিতেছেন। তবে যিনি মায়ার বশীভূত হইয়া,স্বর্ণের শিকলে বদ্ধ থাকিয়া, আপনাকে সুখী মনে করেন, তাঁহাকে ভ্রান্ত ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? নিজে অসংযত অবস্থায় থাকিলে কিংবা অসংযমীর নিকট শাস্ত্র পাঠ করিলে, সাধুসঙ্গ হয় না, কারণ আত্মাই একমাত্র সাধু। সেই আত্মবিষয়ের জ্ঞান না থাকিলে, শাস্ত্রপাঠ অবিদ্যায় পরিণত হইবে। সুতরাং সাধুসঙ্গ না হইয়া অসাধু সঙ্গ হইবে; তাহাতে লাভ কি? অতএব আপনি শাস্ত্রপাঠ নিজে করিবেন না, তবে যদি ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে আপনার গুরুপুত্র গোপালের নিকট শাস্ত্র পাঠ করিবেন।"

রাজা গুরুদেবকে বলিলেন, –"নাথ! আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন, তাহা সমস্ত সত্য, কারণ, আমি ইতঃপূর্ব্বে গুরু পুরোহিতের নিকট হইতে শাস্ত্রাদি অনেক শুনিয়াছি এবং তাঁহাদের সাহায্যে শাস্ত্রপাঠও করিয়াছি; কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তিরূপ শান্তি লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু আপনার নিকট যাহা যাহা শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার পূর্ব্বে যে সংশয় ছিল,তৎসমস্তের খন্ডন হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে আর আমার নিজে শাস্ত্রপাঠ করিবার ইচ্ছা নাই। তবে যদি আত্মকর্ম্মের অভ্যাসীদের শাস্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে আমি উহা করিতে বাধ্য। তাহা যখন নহে, তখন আমার শাস্ত্রপাঠে আবশ্যক নাই, তবে যদি কখনও শাস্ত্রপাঠের আবশ্যক হয়, তাহা হইলে, আপনার আজ্ঞানুসারে গুরুপুত্রের নিকট হইতে শাস্ত্রপাঠ শ্রবণ করিব। শাস্ত্রের এমন উৎকৃষ্ট তাৎপর্য্য থাকিতেও প্রকৃত আচার্য্যের অভাবে শাস্ত্রপাঠে সংশয় দূর না হইয়া বরং অনেকেরই সংশয় বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়। এককালে আমারই এরূপ সংশয় হইয়াছিল। এক্ষণে আপনার কৃপায় আমার সকল সংশয় দূর হইয়াছে। নাথ! আপনি যে আমায় গীতা পাঠ করিতে অনুমতি করিতেছেন; কিন্তু গীতা ত আমি বুঝি না, তাহারই বা কি করিব? আর গীতার মধ্যে কোন্ গীতাই বা আমায় পাঠ করিতে হইবে, তাহা আমাকে অনুগ্রহ করিয়া বলিয়া দিউন।"

গুরুদেব বলিলেন– "আপনি গীতার মধ্যে শ্রীমদ্ভগবদগীতা পাঠ করিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সর্ব্বশাস্ত্রের সার। ইহা যোগী, ঋষি ও দেবগণের হৃদয়সর্ব্বস্বধন। ইহার

মূল শ্লোক আত্মকর্ম্মের অন্তে নিত্য পাঠ করিবেন। তাহা হইলে, আত্মকর্ম্মে যেমন যেমন উন্নতি লাভ করিবেন, ইহারও ভাব তদনুরূপ বুঝিতে পারিবেন। যোগীব্যতীত এই গীতার ভাব কেহই অবগত নহেন। আত্মকর্ম্মের দ্বারা আপনিও ক্রমশঃ এই গীতা বুঝিতে সমর্থ হইবেন। এই শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শরীরবিজ্ঞান, কর্ম্মবিজ্ঞান, সত্ত্বঃ রজঃ মতঃ গুণভেদে কর্ম্ম,জ্ঞান,বিজ্ঞান, ভক্তি, শ্রদ্ধা, ইত্যাদি বিষয়গুলি যেরূপ ভাবে লিপিবদ্ধ আছে, তদ্রূপ আর কুত্রাপি – কোন শাস্ত্রেই – নাই। ষড়দর্শন, বেদ, পুরাণ,তন্ত্র,– যে কোন শাস্ত্র আছে, তৎসমুদায়ের তাৎপর্য্য ইহার মধ্যেই আছে। ইহাতে আত্মকর্ম্মের বিষয় বিশদরূপে বিবৃত আছে। জীবভাবাপন্ন ব্যক্তি হইতে মুক্তভাবাপন্ন শিবস্বরূপ ব্যক্তি পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা নিত্য পাঠ্যপুস্তক। এই সকল কারণে আপনাকে নিত্য গীতা পাঠ করিতে বলিয়াছি। বিশেষতঃ নিজের দোষ নিজে কেহ দেখিতে পায় না। কিন্তু একটু শ্রদ্ধার সহিত গীতা পাঠ করিলেই আমাতে কি কি দোষ আছে বা আমি কিরূপ ভক্ত, কিরূপ শ্রদ্ধাবান্, কিরূপ কর্ম্মী, কিরূপ জ্ঞানী, অর্থাৎ আমি তামসিক ভাবাপন্ন, কি রাজসিক ভাবাপন্ন, কি সাত্ত্বিকভাবাপন্ন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যে ব্যক্তি আমার দোষ দেখাইয়া দেয়, লৌকিক দৃষ্টিতে সে আমার প্রিয় কি প্রকারে হইতে পারে? এই কারণে গীতা অনেকেরই প্রিয় হইতে পারে না।

"এই সকল কারণে অনেকে বলিয়া থাকেন যে, আরও অনেক শাস্ত্রাদি আছে, তৎসমুদায় গীতা অপেক্ষা ভাল বৈ মন্দ নহে। ইহার কারণ এই যে, হয় ত আমি যে সকল কর্ম্ম করিতেছি বা যে সকল শুষ্ক জ্ঞান বৈরাগ্য, ভক্তি, বা সন্ন্যাস ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, ভগবান্ গীতাতে তাহাকে মিথ্যাচার বা তামসিক কর্ম্ম বলিয়াছেন। সুতরাং তাহা আমার প্রাণে কিছুতেই সহ্য হয় না। তাই বলিয়া থাকি, গীতা অপেক্ষা আরও অনেক ভাল ভাল শাস্ত্র আছে, ঐ সকল পাঠ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং গীতা ছাড়িয়া ষড়দর্শন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, যোগবাশিষ্ট প্রভৃতি অপরাপর শাস্ত্র সকলে চর্চ্চা করিয়া থাকি। কিন্তু গীতোক্ত কর্ম্ম সকল না করিলে, দর্শনে যে অদর্শন হইবে, সে বোধ আমার নাই। তাহা থাকিলে, গীতাকে কণ্ঠে মালার ন্যায় ধারণ করিয়া,গুরুপদেশে গীতোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতাম। কিন্তু যিনি একবার অহংমদে মত্ত হইয়া রাজসিক বা তামসিক কর্ত্তা হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ছোট হওয়া বড় কঠিন। অতএব আপনি আপনাকে অণুজ্ঞান করিয়া অর্থাৎ জীবমাত্রেই আপনার গুরু,–আপনি অণু অপেক্ষাও অণু। ইহা সর্ব্বদা অন্তরে রাখিয়া, গীতাকে কণ্ঠে ধারণ করিয়া গীতোক্ত আত্মকর্ম্ম যাহা পাইলেন, তাহা করিয়া চলুন। আর গীতার শ্লোক ও ভাবার্থগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া, আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখুন– ইহাই আমার উপদেশ। এক্ষণে আপনার

যদি আর কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা আপনি জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

রাজা কহিলেন—"নাথ! আপনার নিকট হইতে যে সকল কথা শ্রবণ করিলাম, গুরুপুত্রও আমাকে এ সকল বাক্যের কতক কতক বলিয়াছিলেন, তাহাও দেখিতেছি আপনারই কথা। সেইগুলি পুনর্ব্বার আপনার শ্রীমুখ হইতে শ্রবণ করায় আরও দৃঢ় হইয়া গেল। এক্ষণে আমার মনে আর একটি বিষয়ে আন্দোলন হইতেছে; কিন্তু তাহার মীমাংসা করিতে পারিতেছি না। নাথ! আপনি স্বয়ং বা গুরুপুত্র ইহার মীমাংসা করিয়া না দিলে, আমি নিজে ইহার মীমাংসা করিতে পারিব না। বিশেষতঃ আপনার শ্রীমুখ হইতে ইহার মীমাংসা শুনিবার জন্য আমার মন একান্ত ব্যগ্র হইতেছে। আপনার অনুমতি পাইলে, আমি তাহা প্রকাশ করিতে পারি।"

গুরুদেব বলিলেন—" আপনার যে সকল বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে, সে সকল অশঙ্কিত ভাবে—অসঙ্কোচে আমাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন এবং জিজ্ঞাসা করিতে মনে কিছু দ্বিধা বোধ করিবেন না; আপনি অনায়াসে বলিতে পারেন।"

রাজা বলিলেন,—"নাথ! যখন যোগক্রিয়া ব্যতীত কাহারও শান্তি লাভ হইবে না, তখন দেবদেবীর পূজার ব্যবস্থা করিবার তাৎপর্য্য কি? বিশেষতঃ মহাভারতে অনেক রাজার অনেক বৃত্তান্ত লিখিত আছে এবং তাঁহারা যে সকল যাগযজ্ঞাদি করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই ঐ গ্রন্থে লিখিত আছে। কিন্তু নাথ! দুর্গাপূজা, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতি পূজা সকল কোন রাজা যে করিয়াছিলেন, তাহা ত কই দেখা যায় না। উক্ত পূর্ব্বতন রাজগণের কেহই যখন ঐ সকল পূজাদি করেন নাই, তখন এক্ষণে ঐগুলি করা হয় কেন?"

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন,—"ঐ সকল পূজার মহৎ উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্য পূজাবিধি সকল প্রচারিত হইয়াছিল। সাধুগণ সময়ে সময়ে প্রকাশিত হন, আবার মধ্যে মধ্যে অপ্রকাশ হন। তাঁহাদের অপ্রকাশ অবস্থায় নানা প্রকার অধর্ম্মরূপ আসুরিক সম্প্রদায় প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মরূপ কর্ম্মলোপ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। সেই কর্ম্মশূন্য অধর্ম্মরূপী সম্প্রদায়ের দ্বারা দেশে সাত্ত্বিক কর্ম্মের বিলোপ সম্ভাবনা দর্শন করিয়া সাধুগণ মানবকে অন্তঃকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য পূজাদির প্রচার করিয়াছিলেন।

"দেবদেবীর পূজা ঔষধের অনুপান স্বরূপ। বিকারগ্রস্ত রোগী যখন কিছুতেই ঔষধ খাইতে চাহে না, তখন যিনি সুচিকিৎসক, তিনি কেবল সুমিষ্ট ও আশুসুখকর অনুপান দিয়া তাহাকে ঔষধ খাওয়াইয়া থাকেন; কেননা, ঔষধ না খাইলে সে আরোগ্য লাভ করিতে পারে না। তদ্রূপ যাঁহারা ভবব্যাধির চিকিৎসক, তাঁহারা আশুমনোহরদৃশ্য ও প্রবৃত্তির অনুযায়ী আচাররূপ অনুপানকে সম্মুখে দিয়া ভূতশুদ্ধি, অঙ্গন্যাস, করন্যাস,

বাহ্যমাতৃকান্যাস, সংহার মাতৃকান্যাস, মাতৃকান্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ইত্যাদি ঔষধরূপ যোগক্রিয়া অর্থাৎ স্থির প্রাণের ক্রিয়া সকল তাহার মধ্যে রাখিলেন এবং তাঁহারা নিজে সেই সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। যোগী ব্যতীত ঐ সকল কার্য্য অপরের সাধ্যায়ত্ত নহে; কারণ, ঐগুলির মধ্যে যে সকল বায়ুক্রিয়াদি সন্নিবেশিত আছে, তৎসমুদায় কল্পনা করিলে হয় না,—কার্য্যে পরিণত করা আবশ্যক। ঐগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে, অগ্রে যোগক্রিয়া সকল নিজে অনুষ্ঠান করিয়া সিদ্ধ হইতে হইবে। সিদ্ধ হইতে না পারিলে, উক্ত কর্ম্মসকল কিছুতেই সফল হইবে না। আত্মকর্ম্ম জ্ঞানহীন সাধারণের দ্বারা ঐ সকল কার্য্য সমাধা হইতে পারে না বলিয়া, ব্রাহ্মণের হস্তে ঐ গুলি ন্যস্ত হইয়াছে।

"প্রকৃত ব্রাহ্মণ যখন প্রকাশিত ছিলেন, তখন ঐ সকল কার্য্য ঠিক ভাবে হইত; কারণ, তাঁহাকে কিছুই কল্পনা করিতে হইত না —এমন কি দেবদেবীর মূর্ত্তিও তাঁহাকে কল্পনা করিতে হইত না। তবে সাধারণের অন্তর্লক্ষ্য না থাকায়, পাছে তাহারা আত্মকর্ম্মে তাচ্ছল্য করে, এই আশঙ্কায় তাহাদিগকে আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য শিলা বা দারুনির্ম্মিত বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি গঠন করাইতেন। ঐ সকল মূর্ত্তি মূলে মৃৎ শিলা বা দারু নহে। যোগী আত্মকর্ম্ম কালে যে সকল রূপ দর্শন করেন, ঐ সকল মূর্ত্তিও সেই সেই রূপের অন্তর্গত। সুতরাং মূলে ঐ মূর্ত্তিগুলি কল্পনা বা মিথ্যা নহে। একারণ, ঐ সকলকে মিথ্যা বলা উচিত নহে। তবে উপস্থিত কালে ঐ গুলি মিথ্যায় পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বিরল হওয়ায় এবং লোকে কর্ম্মশূন্য হওয়ায়, ঐগুলি তামসিক ভাবে দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং এখন আর পূজা হয় না; কেবল বাহ্য আচার লইয়াই টানাটানি পড়িয়াছে। কর্ম্মের দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, কেবল বাহ্য আড়ম্বরেই দৃষ্টি। যদ্দ্বারা পূজাকার্য্য সমাধা হইবে, সেই মন্ত্রবিধির লোপ হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

"ইহাতে যদি আপনি বলেন যে, ব্রাহ্মণ পূজা করিতে না জানিলে, তিনিই পতিত হইবেন; কর্ত্তার আর তাহাতে কি দোষ হইতে পারে? কর্ত্তা যখন নিজে ভক্তিপূর্ব্বক বহুকষ্টে পূজার দ্রব্যাদির আয়োজন করিলেন, তখন তাহা কি সব বৃথা যাইবে? সাধারণতঃ এইরূপ মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাও অজ্ঞানের কথা; কারণ, কাহার জিনিস কে কাহারে দেয়? বিশেষতঃ শাস্ত্রে যখন ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা করাইবার বিধি আছে, তখন যাঁহার জ্ঞান আছে, এমন ব্যক্তির দ্বারা কর্ম্ম করানোই কর্ত্তার উচিত। কর্ত্তা যদি শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থামত কার্য্য না করান, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য ত পণ্ড হইবেই। উপস্থিত কালে সাত্ত্বিক কর্ত্তার অভাব হওয়ায়, সাত্ত্বিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায় না। কর্ত্তাও যেমন রাজসিক বা তামসিক, তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তিও তেমনি রাজসিক বা তামসিক। সুতরাং কর্ম্মও রাজসিক বা তামসিক হইয়া থাকে এবং ঐ কর্ম্মের ফল স্বরূপ শান্তিও তদ্রূপ

হইয়া থাকে অর্থাৎ শান্তির স্থলে অশান্তি ইত্যাদি দেখা যায়।

"শাস্ত্রে সাত্ত্বিক কর্ত্তার যে লক্ষণ উক্ত আছে, তাহা আর প্রায় দেখা যায় না। সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইবারও কাহারও চেষ্টা নাই। সাত্ত্বিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকিলে, সাত্ত্বিক কর্ত্তাই বা হইবে কোথা হইতে? সুতরাং অধুনা রাজসিক বা তামসিক কর্ত্তাই প্রায় লক্ষিত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিক কর্ত্তা হইতে হইলে, আসক্তিশূন্য, অহঙ্কার ও অভিমান শূন্য, ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে বিকার রহিত হইতে হইবে। কিন্তু আজকাল এরূপ কর্ত্তা প্রায় দেখা যায় না। রাজসিক ও তামসিক কর্ত্তাই অধিক দেখা যায়। বিষয়ানুরাগ, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা, লোভ, হিংসা, অশুচি, লাভালাভে আনন্দ ও বিষাদ এই সকল ভাব যাঁহাদের হৃদয়ে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে, তাঁহারাই রাজসিক কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হন। আর ইন্দ্রিয়াসক্তি, বিবেকহীনতা, ঔদ্ধত্য, শঠতা, পরাপমানকারিতা, অলসতা, অবসাদ, দীর্ঘসূত্রতা, এই সকল ভাব তামসিক কর্ত্তার লক্ষণ।

"পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যদি কেহ ভক্তি পূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন, তাঁহার কি সব বৃথা হইবে? তৎসম্বন্ধে কথা এই যে, সাধারণতঃ লোকে যাহাকে ভক্তি বলে, তাহা বাস্তবিক প্রকৃত ভক্তি নহে। ভগবান্ আত্মানারায়ণে তন্ময় হইলে যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থার নাম ভক্তি বা প্রেম। ইহা সাধন ব্যতীত হইতে পারে না। আমি যাঁহাকে প্রেম বা ভক্তি করিব, তাঁহার সহবাসে আমি যদি না থাকি তাহা হইলে আমার ভক্তি বা প্রেম কি প্রকারে হইতে পারে?

"মনে করুন, একটি বালিকা যদি চিরকুমারী অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে, পতিসহবাসের অভাবে তাহার যেমন পতিভক্তি হওয়া অসম্ভব, তদ্রূপ আমারও পতির অবর্ত্তমান হেতু তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া অসম্ভব। ইহাতেও যদি বলা যায় যে, আমি পতির রূপ চিন্তায় মগ্ন হইয়া, পতি-সহবাস-সুখ অনুভব করিব, তাহা হইলে পতির অদর্শন হেতু আমাকে পতির রূপ কল্পনা করিতে হইবে। কল্পনা সত্যও হইতে পারে, মিথ্যাও হইতে পারে। কল্পিত রূপের চিন্তা করিলে যে মগ্নাবস্থা হয়, তাহাও কাল্পনিক মগ্নাবস্থা। বিশেষতঃ কল্পিত বিষয়ের চিন্তার দ্বারা কথঞ্চিৎ সহবাস সুখ হইলেও সে সহবাসে কোনও ফললাভ হয় না। স্বপ্নবিকারে যেমন সহবাসসুখ ইত্যাদি সবই হইয়া থাকে, কিন্তু ফলস্বরূপ পুত্র লাভ হয় না; বরং দিন দিন শরীর অবসন্ন ও ক্ষীণ হওয়ায় অশান্তি ও ব্যাধিগ্রস্ত হয় এবং আমাদিগকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়, কাল্পনিক সহবাস সুখের পরিণামেও তদ্রূপ ফলস্বরূপ প্রবোধরূপ পুত্র লাভ না হওয়ায় অশান্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইতে হয়। সুতরাং উহা কোন কাজেরই হয় না।

" কর্ত্তা সাত্ত্বিকভাবাপন্ন না হইয়া রাজসিক বা তামসিকভাবাপন্ন হইলে, তাঁহার

কার্য্যের ফলও রাজসিক বা তামসিক হইয়া থাকে! সুতরাং ঐ ফল পরিণামে সুখকর না হইয়া তদ্বিপরীতই হইয়া থাকে অর্থাৎ উহা পরিণামে বিষতুল্য হয়, এবং কর্ত্তাকেও নিরন্তর সেই বিষের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে হয়।

"পূজাপদ্ধতির মধ্যে যে সকল বায়ুক্রিয়া নিহিত আছে,বিনা অবরোধে যাঁহার বায়ু স্থির হইয়াছে, তিনি ব্যতীত অপর কাহারও দ্বারা ঐগুলি অনুষ্ঠিত হইতে পারে ন'। একারণ গুরুপদেশে অগ্রে প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের দ্বারা চঞ্চল প্রাণকে স্থির প্রাণে পরিণত করিলে, তবে ভূতশুদ্ধি ও অপরাপর কার্য্যগুলি করিতে সমর্থ হওয়া যায় – নচেৎ নহে। যোগাভ্যাস ব্যতীত পূজা করিতে গেলে, যজমান ও পুরোহিত উভয়েরই পতন নিশ্চয়। একজন অন্ধ যেমন আর একজন অন্ধের পরামর্শে চলিলে, উভয়েরই পতন হইবার সম্ভাবনা, ইহাও তদ্রূপ।

"যে মহৎ উদ্দেশ্যে দেবদেবীর পূজা প্রচারিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহা ব্যবসায়ে পরিণত হইয়া এবং আমোদ আহ্লাদে মিলিয়া কিম্ভুত কিমাকার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাহ্য বিষয় কিছু সম্মুখে দিয়া জীবকে আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত করানই পূজার উদ্দেশ্য। কিন্তু এক্ষণে তাহা বিপরীত আকার ধারণ করিয়াছে এবং অকার্য্য না হইলেও অকার্য্যে পরিণত হইয়াছে। অতএব আপনি অন্ততঃ আপনার অধিকারস্থ ব্রাহ্মণপুত্রগণকেও যদি আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে পারেন, তাহা হইলে, আপনার রাজ্যের ভবিষ্যৎ মঙ্গল হইবে এবং জীবেরও উপকার করা হইবে। রাজার কর্ত্তব্য, প্রজার ধর্ম্ম রক্ষা করা; কর্ম্ম ব্যতীত ধর্ম্ম রক্ষা হয় না। রাজা বা সমাজপতি ব্যতীত সেই কর্ম্ম রক্ষা হয় না। অতএব লোকে যাহাতে আত্মকর্মের অনুষ্ঠান করে, আপনার প্রাণপণে বিধিমতে তাহারই চেষ্টা করা উচিত। এক আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ব্যতীত পূজা,যাগ, যজ্ঞ, ব্রত, দান ও আশ্রমধর্ম্ম সমস্তই পন্ড হইয়া যাইতেছে। আত্মকর্ম্মের অভাবে ঐ সমস্তই রাজসিক বা তামসিক কর্ম্মে পরিণত হইতেছে এবং দেশে অনাচার অশান্তি প্রভৃতি যে কিছু অমঙ্গল দেখা যায়, তৎসমুদায়ই এক আত্মকর্ম্মের অভাবেই হইয়া থাকে। কথার ছড়াছড়িতে কিছুতেই ঐ সকল অমঙ্গলের নাশ হইবে না।

"সকলে নিজে নিজে আত্মকর্ম্মে অনুষ্ঠান করিলে, তবে মঙ্গল হইতে পারে; নচেৎ কেবল তৎকথার আলোচনায় কিছুই হইবে না। পঞ্চম বর্ষের বালক হইতে অতি বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলেই এই আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ। তবে বৃদ্ধাবস্থায় আরম্ভ করিলে, সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হওয়া কষ্টসাধ্য। কেননা, শরীরের অধিকাংশ সারভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় বৃদ্ধ প্রায় জ্বরাগ্রস্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং তাঁহার শরীরের বল, মনের বল কিছুই থাকে না। বরং দেহ মল-পূর্ণ থাকায় মনও অশান্তিপূর্ণ থাকে। এ অবস্থায় আত্মকর্ম্ম

অর্থাৎ প্রাণায়ামরূপ লাঙ্গলের দ্বারা দেহ কর্ষণ করিতে কিছু বেশী সময় লাগে। ক্ষেত্রকর্ষণ করা না হইলে, বীজবপন হয় না। একবার এই ব্রহ্মবীজ বপণ করা হইলে, কিছুতেই আর তাহার নাশ হয় না। সময়াভাব বশতঃ যদি ইহজন্মেই সিদ্ধাবস্থা লাভ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ পূর্ব্বজন্মের সেই বীজ পরজন্মে অঙ্কুরিত ও ক্রমে তাহা বৃক্ষে পরিণত হইয়া পরে ফলদান করিয়া থাকে। তবে জ্বরাগ্রস্ত অতিবৃদ্ধ যদি গুরুবাক্যমত চলিতে পারেন, তবে তিনি ইহজন্মেই জ্বরাদি হইতে মুক্ত হইতে পারেন।

"কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আজকাল প্রায় অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, বাল্যকালে আবার ধর্ম্ম কর্ম্ম কি!!! ধর্ম্মকর্ম্মের সময় বাল্যকাল নহে!! কিন্তু ইহা নিতান্ত ভ্রম ধারণা; কারণ, ধর্ম্মহীন শিক্ষায় ভবিষ্যতে বালকগণের পরিণাম ভয়ানক ও শোচনীয় হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ধর্ম্ম ব্যতীত বালকগণের শারীরিক ও মানসিক বল হইতেই পারে না। সুতরাং চিররুগ্ন হইয়া তাহাদিগকে অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতে হয়। ধর্ম্মকর্ম্মহীন বালকগণের দ্বারা দেশের কোন উপকার সাধিত হয় না। তবে তাহারা অল্প যে কয়েকদিন জীবিত থাকে, সেই কয়েকদিনের জন্য মাতাপিতার কিঞ্চিৎ অর্থের উপকারে আসিতে পারে, এই মাত্র। পরন্তু এই ধর্ম্মহীন শিক্ষার ফলে মাতাপিতাকেও আবার বৃদ্ধবয়সে অনেক স্থলে অতি দীনভাবে পুত্রের গলগ্রহ হইয়া কালযাপন করিতে দেখা যায়।

"বালকদিগকে এইরূপ কুশিক্ষা দিবার দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পুত্রের নিকট মাতাপিতার স্বার্থ প্রত্যাশা — পুত্র বড় হইয়া চাকরি অথবা অন্য কোন উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলে, তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবন সুখে কাটাইতে পারিবেন। দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মোপদেষ্টার স্বার্থ ও শিক্ষাদানের দোষ। যাঁহারা ধর্ম্মোপদেশ দেন, তাঁহাদের শিক্ষাদানের দোষেই যত কিছু অনিষ্ট ঘটিতেছে। শাস্ত্রাদিপাঠদ্বারা তাঁহারা বাহ্যজ্ঞান, বাহ্য ভক্তি বা বাহ্য বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া থাকেন। পুত্র মোহমুদ্গর, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি গ্রন্থে শুষ্ক বৈরাগ্যের বিষয় পাঠ করিয়া দেখিলেন যে, সংসার অনিত্য — পিতাই বা কে, মাতাই বা কে — সংসারে কোন সুখ নাই, সংসার বন্ধেরই কারণ; সুতরাং ইহা ত্যাগ করা উচিত — এই ভাবিয়া অন্তরে শুষ্ক পুরাণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া পাষণ্ডের ন্যায় পিতা মাতাকে কাঁদাইয়া বনে চলিলেন। এমত অবস্থায় কে বালকগণকে ধর্ম্ম কর্ম্ম শিক্ষা দিতে চাহিবে? সুতরাং মাতা পিতাও ধর্ম্মকর্ম্মকে কুশিক্ষা মনে করিয়া, পুত্রকে তাহার দিকেও যাইতে দেন না। ইহাতে পিতামাতার দোষ কি?

"যাঁহারা ধর্ম্মশিক্ষা দেন, তাঁহাদের দোষেই মাতাপিতা পুত্রকে ধর্ম্মকর্ম্মের শিক্ষা দিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা যদি জানিতেন যে, পুত্রকে ধর্ম্ম কর্ম্ম

শিক্ষা দিলে, তাঁহাদের স্বার্থে কোন বাধা পড়িবে না, তাহা হইলে তাঁহারা পুত্রকে ধর্ম্মকর্ম্ম শিক্ষা দিতে বিরত হইবেন কেন? তাঁহারা যদি জানিতেন যে, ধর্ম্মকর্ম্মের দ্বারা পুত্র জিতেন্দ্রিয় হইয়া তাঁহাদের ও দেশের গৌরবের বিষয় হইয়া তাঁহাদিগকে ও স্ত্রীপুত্রাদি পরিজনবর্গকে পরিত্যাগ না করিয়া বরং রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, তাহা হইলে বোধ হয়, কেহই বালকগণকে ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিতেন না।

"শাস্ত্রাদি পাঠের দ্বারা যে বাহ্য জ্ঞান, বাহ্য ভক্তি বা বাহ্য বৈরাগ্য হয়, তৎসমুদায়ই দেশের অমঙ্গলের হেতু। কেননা, এই সকলের দ্বারাই শান্তি লাভ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া লোকে আর কেহই আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু এই সকলের দ্বারা ত কাহারও শান্তি লাভ হইতেছে না? শান্তি লাভ হইবেই বা কিরূপে? বাহ্যজ্ঞান, বাহ্যবৈরাগ্য বা বাহ্যভক্তির সহিত যাগ যজ্ঞ পূজাদি করিলে, তাহা হইতে কি কখন শান্তি লাভ হইতে পারে? এক আত্মকর্ম্মের অভাবে সব নষ্ট হইতেছে। আত্মকর্ম্মই একমাত্র পরাবিদ্যা, তদ্ব্যতীত সবই অবিদ্যা।

"বালককাল হইতে গুরুপদেশানুসারে এই আত্মকর্ম্মরূপ পরাবিদ্যা অভ্যাস করিলে, নিশ্চয়ই যে সিদ্ধাবস্থা হইতে মুক্তাবস্থা পর্য্যন্ত লাভ করা যায়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তবে যদি কেহ মোহবশতঃ গুরুপদেশ মত ঠিক চলিতে না পারেন, তাহা হইলে ইহজন্মে তাঁহার সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তাবস্থা লাভ হয় না বটে, কিন্তু তিনি সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা শারীরিক ও মানসিক বলে শ্রেষ্ঠ হইয়া ঐশ্বর্য্যভোগ করিয়াও কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়া থাকেন। পরে দেহত্যাগ হইলে পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলের দ্বারা সুকৃতিশালী লোকের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় পূর্ব্বাভ্যস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তাবস্থা লাভ করেন।

"অতএব ধর্ম্মকর্ম্ম বাল্যকাল হইতেই আরম্ভ করা নিতান্ত আবশ্যক। তবে যদি কোন দৈবকারণে বাল্যকাল অতীত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে কোন কালে হউক, শ্রবণ মাত্রেই আত্মকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। এ অবস্থায় আর কালাকাল দেখা উচিত নহে। গুরুপদেশে আত্মকর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেই, গুরুপদেশ মত কার্য্য করা আবশ্যক। আত্মকর্ম্ম করিতে হইলে, পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, গৃহরত্নাদি কিছুই পরিত্যাগ করিতে হয় না। পিতা মাতাদি বন্ধনের কারণ নহেন — আসক্তিই বন্ধনের হেতু। ইচ্ছা করিয়া পরিত্যাগ করিলে, আসক্তির নাশ হয় না, বরং অন্তরে আরও অশান্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইচ্ছা বা জোরের সহিত অথবা লোকলজ্জা ভয়ে বা পুত্রকলত্র নাশে যে কর্ম্মত্যাগ করা হয়, তাহা রাজসিক বা তামসিক ত্যাগ — প্রকৃত ত্যাগ নহে। আর যে সকল আমার নাই বা জুটে না, অথবা যাহা বহু কষ্টেও সংগ্রহ করা কঠিন, এরূপ বিষয়ের যে ত্যাগ, তাহাও তামসিক।

এইরূপ ত্যাগে না ইহকালে, না পরকালে, কোন সুখ নাই – চতুর্দ্দিকেই অশান্তি। যাহার দ্বারা আসক্তির নাশ হয়, তাহা না করিয়া ভ্রমবশতঃ অজ্ঞানীর পরামর্শে শত্রুবোধে মিত্রগণকে জোর করিয়া, পরিত্যাগ করা হইয়াছে, অথচ যাহারা প্রকৃত শত্রু, ক্ষমতাভাবে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি নাই, কেবল লোক দেখান বৈরাগ্যের এবং ভক্তির চিহ্ন ধারণ করিয়াছি মাত্র; ইহাতে দেশের এবং নিজের অমঙ্গল ব্যতীত ইষ্টের সম্ভাবনা নাই।

পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে যে, আত্মকর্ম্মই একমাত্র সাত্ত্বিক কর্ম্ম। সেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকায় সাত্ত্বিক কর্ত্তার অভাববশতঃ সাত্ত্বিক ত্যাগও দৃষ্টি গোচর হয় না। সাত্ত্বিক কর্ত্তার বহুরূপীর ন্যায় সাজগোজের আবশ্যক নাই। তাঁহারা বহুরূপীর দলে আসিলেইবা তাঁহাদের কথা শুনে কে? সুতরাং তাঁহারা যিনি যেখানে আছেন, সেইখানেই থাকেন, কাহাকেও ডাকিতে যান না, কেহ তাঁহাদের নিকট গেলে, তাঁহারা তাহাকে অগ্রাহ্যও করেন না। এইরূপ সাত্ত্বিক কর্ত্তার উপদেশ প্রাপ্ত না হইলে, কালক্রমে দেশ কর্ম্মশূন্য ত্যাগীতে পরিপূর্ণ হইবে।

"অতএব পূজা যাগ যজ্ঞাদির যে সকল বাহ্য অনুষ্ঠান আছে, সে সকল যাহাতে রাজসিক বা তামসিক ভাবে পরিণত না হয়, তাহার চেষ্টা করা নিতান্ত আবশ্যক। সেগুলি সাত্ত্বিকভাবে পরিণত করিতে হইলে, অগ্রে গুরুপদেশে সাত্ত্বিক কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক; নচেৎ ঐ গুলি রাজসিক ও তামসিক ভাবে পরিণত হইবে। চিরকালই যদি রাজসিক ও তামসিক ভাবকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহাতেই পড়িয়া থাকা যায়, তাহা হইলে আর কি হইল?

"কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন, তাঁহারাও প্রায় সকলেই মোহবশতঃ মন্ত্রহীন রাজসিক ও তামসিক পূজাদিতে মাতিয়া থাকেন, উদ্ধারের চেষ্টাও করেন না। ব্রাহ্মণপুত্রগণ বিষয়মদে মত্ত হইয়া দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যপ্রায় হওয়ায় মন্ত্রবিধি পরিত্যক্ত হইয়া যাইতেছে। কাহারও তাহাতে লক্ষ্য নাই; সাত্ত্বিক ভাবের পূজাও আর দেখা যায় না এবং সাত্ত্বিক ভাবে পূজা করিবার উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক আত্মকর্ম্মের অভাবে সব নষ্ট প্রায় হইতেছে। সাধনমার্গে প্রায় কাহারও দৃষ্টি নাই; যাহা কিছু আছে, তাহাও লোক দেখান মাত্র,—কার্য্যতঃ কিছুই নাই। এ কথা আপনাকে বুঝাইতে কষ্ট পাইতে হইবে না; কারণ আপনি ভুক্তভোগী। এই আপনাকে দেবদেবীর পূজার সহিত সাত্ত্বিক কর্ত্তা, সাত্ত্বিক ভক্তি, সাত্ত্বিক ত্যাগ ও সাত্ত্বিক কর্ম্মের বিষয় সমস্তই বলিলাম ও বুঝাইলাম। এখন যদি আপনার কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকে, তাহা হইলে আপনি আমায় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

রাজা বলিলেন,—"নাথ! যাহা আপনি বলিলেন, আমার বিবেচনায় তাহা যুক্তিসঙ্গত; সুতরাং তদ্বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ বা প্রশ্ন নাই। তবে আপনি যে বলিলেন. এই আত্মকর্ম্মের অভ্যাসীদের পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্রাদি কিছুই ছাড়িতে হয় না; তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে নাথ! গুরুপুত্র কেন পিতা মাতা প্রমুখ সকলকে প্রকারান্তরে একরকম পরিত্যাগ করিয়া, পাগলবেশে রহিয়াছেন? ইহার তাৎপর্য্য কি?

গুরুদেব বলিলেন—" আপনার গুরুপুত্র গোপাল যে পাগলবেশ ধারণ করিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, গোপালের পিতা গোপালের প্রতি পীড়ন করায়, তিনি অনিচ্ছার সহিত পাগলের বেশ ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তাঁহার পিতা তাঁহাকে শাস্ত্রাদি পাঠ করাইবার জন্য অত্যন্ত পীড়ন করিতেন এবং ব্যবসা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে নানাপ্রকার মিথ্যা আড়ম্বরের শিক্ষা দিতেন। এইগুলি সাধনমার্গের অনুপযোগী। আরও এক কারণ এই যে, গোপাল সাধন ভজন করিয়া থাকেন, এই কথা তাঁহার পিতা জানিতে পারিলে, পিতার নিকট হইতে তাঁহার অনেক বিঘ্ন বাধা হইবার সম্ভাবনা। এই সকল আশঙ্কায় গোপালকে পাগলের বেশ ধারণ করিতে হইয়াছিল। এক্ষণে গোপালের পিতা গোপালের পরিচয় পাইয়াছেন এবং নিজেও সাধনমার্গ অবলম্বন করিতেছেন; এখন মাতাপিতার নিকট হইতে গোপালের আর কোন বাধা পাইবার আশঙ্কা নাই। সুতরাং এখন আর তাঁহার পাগলবেশ থাকিবে না। এখন হইতে গোপাল তাঁহার বংশোচিত প্রকৃতির অনুযায়ী সাধারণ ভাবেই থাকিবেন; তাঁহাকে আর পাগলবেশে থাকিতে হইবে না। এই সকল কারণ ব্যতীত তাঁহার পাগল বেশে থাকিবার অন্য কোন কারণ নাই।"

রাজা গুরুদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, — "নাথ! আমার আরও কিছু জিজ্ঞাস্য আছে। আপনার অনুমতি পাইলেই তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পারি।"

গুরুদেব বলিলেন, —"আপনার যাহা কিছু জিজ্ঞাস্য থাকে, তাহা আপনি অনায়াসে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন।"

রাজা গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া বলিলেন,—"নাথ! যাহা যাহা আমার উপযুক্ত, আপনি তৎসমস্তই আমাকে বলিয়াছেন এবং আমিও তাহাতে অপার তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। কিন্তু নাথ! আহার, নিদ্রা ও স্ত্রী সম্বন্ধে কিরূপ নিষেধ বিধি আছে, তাহা আমি অবগত নহি; দাসের প্রতি কৃপা করিয়া যদি তদ্বিষয়ের কিছু উপদেশ দেন, তাহা হইলে কৃতার্থ হই।"

গুরুদেব বলিলেন, "আহার ও স্ত্রী সম্বন্ধে যেরূপ আচরণ করা উচিত, তাহা বলিতেছি শ্রবণ করুন—

"আহারের পূর্ব্বে স্নান করা উচিত; আহার করিয়া স্নান করা উচিত নহে। স্রোতস্বতী

নদীতে অবগাহন স্নানই বিধেয়। যদি অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে নদী থাকে, তাহা হইলেও নদীতে যাইয়া স্নান করা উচিত। নদীর অভাবে বৃহৎ তড়াগাদি বা পুষ্করিণীতে স্নান বিধেয়। যদি ইহারও অভাব হয়, তাহা হইলে কূপাদির জল কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া, সেই জল ঠান্ডা হইলে, তাহাতে স্নান করা উচিত। যে স্থানে নদী নাই, অথচ সংক্রামক পীড়া হইতেছে, সে স্থান পরিত্যাগ করিতে না পারিলে, স্রোতস্বতী নদী ব্যতীত অন্য যে কোন জল হউক না কেন, তাহা উষ্ণ করিয়া পরে শীতল হইলে, সেই ঠান্ডা জলে স্নান করা উচিত। কিন্তু যে সকল স্থানে মহামারী, দুর্ভিক্ষ বা সংক্রামক পীড়া উপস্থিত হয়, সাধকের সে সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে গমন করাই উচিত।

"স্নানান্তে অন্তঃপূজাদি অন্তঃকর্ম্ম সমাপন করিয়া, কিঞ্চিৎ গন্ধদ্রব্য চন্দনাদি অঙ্গে লেপন করা মন্দ নহে। তৎপরে যুক্তভাবে আচমন করিয়া, আহার করা উচিত অর্থাৎ আত্মাতে লক্ষ্য রাখিয়া, আমি স্বয়ং আহার করিতেছি না — আত্মানারায়ণের ভোগ দিতেছি, এরূপ ভাবে আত্মাতেমনোনিবেশ করিয়া, স্নান আহার প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্য করা উচিত।

"শাস্ত্রে যে সকল বস্তু অখাদ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমুদায় আহার করা উচিত নহে। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল দ্রব্য আহার করা উচিত নহে। অধিক তিক্ত, অম্ল, কষায়, কটু বা রসশূন্য দ্রব্য অধিক পরিমাণে ভোজন করা উচিত নহে। দধি হইতে জাত যে সকল দ্রব্য তৎসমস্তই ভোজন করিতে পারেন; কিন্তু দধি উত্তম খাদ্য নহে। অল্প পরিমাণে খাইবার আবশ্যক হইলে, তক্র খাইতে পারেন। লেবু ও পুরাতন পাকা তেঁতুল খাইতে পারেন। কাঁচা তেতুঁল, কামরাঙ্গা, চালতা, করমচা ও আমড়া বর্জ্জনীয়। মৎস্য মাংস না খাওয়াই ভাল; তবে যাঁহাদের পুরুষানুক্রমে মৎস্য মাংস অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে, তাঁহাদের একেবারে হঠাৎ উহা পরিত্যাগ করা উচিত নহে। আত্মকর্ম্মের দ্বারা যখন আপনা আপনি খাইবার ইচ্ছা যাইবে, তখন ঐ সকল আপনিই পরিত্যক্ত হইবে। মাংস বৃদ্ধির জন্য প্রাণিবধ করিয়া মাংসাদি ভোজন করা উচিত নহে। ঘৃত বা দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন দ্রব্য সকল, আহারের মধ্যে উৎকৃষ্ট। শাকাদি অধিক পরিমাণে খাওয়া উচিত নহে। ফলমাত্রই অধিক পরিমাণে খাওয়া ভাল নহে। তবে অল্প পরিমাণে খাইলে অনুপকার হয় না। কিন্তু যে সকল ফলে অধিক বীজ থাকে, সে সকল অগ্নিপক্ক করিয়া খাওয়াই ভাল। সূর্য্যপক্কফল অল্পমাত্র খাওয়াই উচিত। বহুবীজের ফলের মধ্যে বেল ও দাড়িম্ব উৎকৃষ্ট। তরকারীর মধ্যে পাঁচ তরকারী মিলাইয়া এক তরকারী করা উত্তম নহে। যে ঋতুতে যে ফল বা শাক জন্মে, তাহার প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে অগ্নি দ্বারা পাক করিয়া তরকারী প্রস্তুত করিয়া, অল্প পরিমাণে আহার করা উত্তম। চাউলের মধ্যে আতপ চাউলই উত্তম। গোধূম হইতে জাত আটা ময়দা সুজি উত্তম। ডালের মধ্যে খেঁসারি (খঞ্জকরী)

এবং মসূর পরিত্যাজ্য। যে সকল দ্রব্য বা তৈল বা রসশূন্য অথবা বাসি বা দুর্গন্ধ, সে সকল পরিত্যাগ করাই উচিত অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য হইতে তৈল বা রস বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, সে সকল দ্রব্য পরিত্যাজ্য। আতপ চাউলের অন্ন, ঘৃতসৈন্ধবের পাকের নিরামিষ তরকারী এবং চরু সর্ব্বোৎকৃষ্ট আহার। আহারের শেষে সুমিষ্ট পায়স ও মিষ্ট দ্রব্য অল্প পরিমাণে মন্দ নহে; কিন্তু অধিক পরিমাণে আহার করা উচিত নহে। ঘৃতশূন্য অন্ন ব্যঞ্জন আহার করা উচিত নহে। ঘৃতের মধ্যে গব্য ঘৃত উত্তম,— মহিষ ঘৃত মধ্যম। দুগ্ধের মধ্যেও গরুর দুগ্ধ উত্তম,— মহিষের দুগ্ধ মধ্যম।

আহারান্তে তাম্বুল বা হরিতকী অল্প পরিমাণে উত্তম। কিন্তু গৃহীর পক্ষে হরিতকী অল্প বা বেশী পরিমাণে নিত্য ভাল নহে। আহারান্তে ধূমপান মন্দ নহে, কিন্তু সর্ব্বদা ভাল নহে।

"এক্ষণে আহারের কাল ও পরিমাণ বলিব। দিবাভাগে এক প্রহরের মধ্যে আহার করা উচিত নহে। এক প্রহরের পর আড়াই প্রহরের মধ্যে আহারের উত্তম কাল। ইহার পরে বা পূর্ব্বে অপ্রশস্ত কাল। এই অপ্রশস্ত কালে আহার করিলে, শরীর রুগ্ন হইতে পারে। রাত্রিকালে এক প্রহরের মধ্যে আহার করাই উচিত। এক প্রহর অতীত হইলে, আহার না করাই উচিত।

"এইবার আহারের পরিমাণ বলিতেছি— অপরিমিত আহার করা উচিত নহে। পরিমিত ভাবে আহার করাই সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এরূপ ভাবে আহার করা উচিত, যাহাতে বায়ু চলাচলের বিঘ্ন বা ব্যাঘাত না ঘটে এবং আহার করিয়া আই ঢাই করিতে না হয়। এক সের পরিমাণ দ্রব্য খাইলে, যাঁহার যথেষ্ট হইতে পারে, তাঁহার কর্ত্তব্য — আহারীয় দ্রব্যে এবং জলে তিন পোয়া খাওয়া। ইহারই নাম অপরিমিত আহার। সুস্থদেহে বৃথা উপবাস করাও উচিত নহে।

"আহারান্তে পরিশ্রম করা উচিত নহে; অন্ততঃ তিন ঘন্টা কাল পরে পরিশ্রমাদি করা উচিত। দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া উচিত নহে। রাত্রিতে আহারান্তে তাম্বুলাদি সেবনের পর মুখ হাত পা ধৌত করিয়া শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা ঐ সকল মুছিয়া শয্যায় যাওয়া উচিত।

বিছানায় যাইয়া উত্তরাস্য হইয়া বসিয়া, প্রথমে তিনটি প্রাণায়াম করিবেন; পরে গুরুপদিষ্টমতে নারায়ণকে স্মরণ করিয়া, গুরু এবং নারায়ণকে তুল্যজ্ঞানে প্রণাম পূর্ব্বক দক্ষিণ দিকে শিয়র করিয়া শয়ন করিবেন। প্রথমে চিৎ হইয়া গুরুপদেশমতে দ্বাদশটি প্রাণায়াম করিয়া, প্রাণায়াম শেষ হইলে, দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ন করিবেন। ক্ষণকাল এইভাবে থাকিয়া যখন দেখিবেন, নিদ্রার আবেশ আসিয়াছে, তখন বাম পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইবেন। কিন্তু এই নিদ্রাও অধিক কাল ভাল নহে। বৃথা আমোদাদিতে রাত্রিজাগরণও

নিষিদ্ধ। যাঁহাদের সাধনে প্রথমাবস্থা, তাঁহাদের দুই প্রকার কাল নিদ্রা হইলেই যথেষ্ট।

ঊষাকালে গাত্রোত্থান করা উচিত এবং গাত্রোত্থান সময়ে গুরুপদিষ্টমতে গুরু এবং নারায়ণকে অভেদজ্ঞানে প্রণাম করিয়া, শয্যার বাহিরে যাওয়া উচিত। তাহার পর মুখ হাত পা ধুইয়া রাত্রিবাস বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, এক প্রহর কাল আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। স্নানান্তে পুনর্ব্বার যথাসাধ্য আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা উচিত। পুনরায় গোধূলি সময়ে বা তাহার পরে এক প্রহর কাল আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

প্রথমাবস্থায় এইরূপ নিয়মে আহারাদি করিয়া গুরুপদেশমত ত্রিকালীন কার্য্য করিলে, রোগ শোক বিনষ্ট হইয়া সাধকের এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অবস্থা হয়। এইরূপ করিতে করিতে সাধকের নিদ্রা যখন কমিয়া যায়, তখন তিনি মধ্যরাত্রে এক প্রহর কাল গুরুপদেশ মত আত্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবেন। তবে যদি ইহাতে কেহ অশক্ত হন, আহারাদিতে বোধ হয় কেহই অশক্ত হইবেন না। কর্ম্মে অশক্ত না হইলেও 'সময় নাই' ইত্যাদি অনেক ওজর থাকিতে পারে। যাঁহারা এই কারণে অশক্ত, তাঁহারা ঊষাকালে চারি দন্ড, স্নানের পর যথাসাধ্য, এবং সায়াহ্নে চারি দন্ড এইরূপ করিতে পারেন। যদি কেহ ইহাতেও অশক্ত হন, তাহা হইলে ঊষাকালে এক দন্ড, স্নানের পর যথাসাধ্য, এবং সায়াহ্নে এক দন্ড এইরূপ অল্প মাত্র কাল আত্মকর্ম্ম করিলেও অনেক মঙ্গল। কিন্তু ইহাতে এক জন্মে সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তাবস্থা লাভের আশা করা দুরাশামাত্র। তবে আত্মকর্ম্ম অল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও শারীরিক স্বচ্ছন্দতা লাভ হইয়া থাকে। এই কর্ম্ম করিতে যে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না, তাহা আপনি জানিয়াছেন; সুতরাং ইহা কেবল করিবার ইচ্ছার উপরেই নির্ভর করে। যিনি শেষোক্ত ভাবেও আত্মকর্ম্ম করিতে অশক্ত, তাঁহার করিবার ইচ্ছা নাই মনে করিতে হইবে। করিবার ইচ্ছা নাই বলাও লজ্জাকর, তাই বলিতে হয় অশক্ত; নচেৎ অশক্ত কেহই নহেন।

"এক্ষণে আপনাকে স্ত্রী সম্বন্ধে নিয়ম বলিতেছি, শ্রবণ করুন। ঋতুকালে স্ত্রীর অনুরোধে ঋতুরক্ষার্থ স্ত্রীতে গমন করা বিধেয়; নচেৎ নিজে চেষ্টা করিয়া কাম-চরিতার্থ করিবার জন্য বীর্যক্ষয় করা উচিত নহে। কিংবা নিতান্ত আবশ্যক হইলেও গমন করা উচিত; কেননা সে অবস্থায় বন্ধ রাখিলে, বীর্য তরল হইয়া অপরিমিত ক্ষয় হইতে পারে। তাহাতে নানা প্রকার ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা। তবে যাহাতে অযথা বীর্যপাত না হয়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। স্ত্রীর প্রতি পশুভাবের আচরণ করা উচিত নহে। স্ত্রী যাহাতে কামপত্নীতে পরিণত না হইয়া ধর্ম্মপত্নী হন, বিধিমতে তাহার চেষ্টা করা উচিত; অর্থাৎ স্ত্রী যাহাতে সর্ব্বদা গৃহকার্য্যের সহিত আত্মকর্ম্মে লিপ্ত হন, তাহারই চেষ্টা করা আবশ্যক। স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী না হইলে, সংসারে কোন প্রকার সুখ শান্তি লাভ করা কষ্টকর।"

রাজা গুরুদেবের এই সকল কথা শুনিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,– "নাথ! আমার আর কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন নাই। আমি আপনার নিকট হইতে সারগর্ভ যে সকল উপদেশ শ্রবণ করিলাম, তাহাতে আমার অপার আনন্দই লাভ হইতেছে। এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন যে, আমি এই আত্মকর্ম্ম যাহা পাইলাম, তাহা হইতে যেন আমাকে ভ্রষ্ট হইতে না হয়–আমার অপর কোন প্রার্থনা নাই।"

গুরুদেব রাজাকে বলিলেন,–"আপনি এই আত্মকর্ম্ম করিয়া চলুন; উহাই আপনাকে আশীর্ব্বাদ করিবে এবং আপনাকে ভববন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দিবে। আপনি অন্ধের যষ্টির ন্যায় আত্মকর্ম্মকে ধরিয়া তাহাতে মন লাগাইয়া রাখুন; তাহা হইলে, আর আপনার কোন প্রার্থনা থাকিবে না; কারণ, শান্তি প্রাপ্ত হইলে আর কোন প্রার্থনা থাকে না। অতএব সন্দেহরহিত হইয়া, আনন্দের সহিত আত্মকর্ম্মের অভ্যাসে লাগিয়া থাকুন। তাহা হইলেই ইচ্ছারহিত হইয়া পরম শান্তি লাভ করিতে পারিবেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই–ইহা নিশ্চয় জানিবেন।"

রাজা গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া আনন্দাশ্রুলোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুদেবের সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।

তদনন্তর গুরুদেব রাজ্ঞীকে ও গোপালের মাতাপিতাকে পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ রাজাকে যেরূপ ভাবে দীক্ষা দিয়াছেন, তদ্রূপ ভাবে উপদেশ দিয়া সমস্ত বুঝাইয়া দিলেন। সকলেই উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিয়া রহিলেন।

গোপাল অশ্রুবিগলিত নেত্রে কৃতাঞ্জলিপুটে গুরুদেবকে বলিলেন,–"নাথ! যাঁহাদিগের হইতে আমি এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছি, আজ আপনি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের মুক্তির উপায় উপদেশ দিয়া তাঁহাদিগকে এবং আমাকে কৃতার্থ করিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী–ইহারাও অন্নদাতা, ইঁহাদের নিকট হইতেও আমাকে ঋণমুক্ত করিলেন। নাথ! আজ আমার এককালে পিতৃঋণ ও মাতৃঋণ এই উভয় ঋণ হইতেই মুক্ত করিলেন। নাথ! মাতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার আর কোন উপায় নাই। একমাত্র আত্মকর্ম্মের উপদেশ দান ব্যতীত অপর কিছুতেই এই ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারা যায় না। নাথ! আজ আপনি আমায় সমস্ত ঋণ হইতেই মুক্ত করিলেন। যদিও আত্মকর্ম্মের উপদেশ দান করিয়া পূর্ব্ব হইতেই আমাকে সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত করিয়াছেন, তথাপি মাতাপিতাকে উপদেশ দিয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহা করিয়া আমায় কৃতার্থ করিলেন। নাথ! আমার বলিবার কিছু নাই,–আপনি লোক শিক্ষার জন্য আমার মুখ দিয়া যাহা বলাইবেন, তাহা বলিলাম।" এই বলিয়া গুরুদেবের চরণে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গুরুদেব গোপালকে বলিলেন–"যাহা কিছু হইবার, তাহা হইয়া গেল; তজ্জন্য

আনন্দ নিষ্প্রয়োজন। আপনার কর্ম্ম আপনি করিয়া চলুন; যাহা হইবার তাহা হউক।''

তাহার পর গুরুদেব রাজাকে বলিলেন,– আপনাকে যেমন যেমন উপদেশ করিয়াছি, আপনি সেইমত কার্য্য করিয়া চলুন; আর যদি কোন বিষয় জানিবার আবশ্যক হয়, আপনারা গুরুপুত্রের নিকট সব জানিতে পারিবেন। যদি আমার নিকট যাইতে ইচ্ছা হয়, যাইতেও পারেন। কিন্তু যাইবার আবশ্যক নাই – যে কর্ম্ম দিলাম, যদি ঠিক উপদেশমত চলেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারাই সব জানিতে পারিবেন। রাজ্ঞীকে ও গোপালের মাতাপিতাকে বলিলেন,–আপনারাও যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা করিয়া চলুন; যাহা জানিবার, তাহা ঐ কর্ম্মের দ্বারাই জানিতে পারিবেন। অধিকন্তু গোপালের নিকট হইতেও জানিতে পারেন। গোপালের স্ত্রীকে বলিলেন,– মা: আপনি পতির সহিত যেরূপ ভাবে আত্মকর্ম্মের অভ্যাস করিতেছেন, তদ্রূপভাবেই করিয়া চলুন। তাহাতে যাহা হইবে, তাহা ভালই হইবে।

গুরুদেব এই সকল কথা বলিয়া সকলকে বলিলেন–''তবে এক্ষণে আমি চলিলাম।'' এই কথা বলা শেষ হইতে না হইতেই গুরুদেবের শরীর অদৃশ্য হইয়া গেল।

এই অলৌকিক ঘটনা দর্শন করিয়া, গোপাল ব্যতীত সকলেই ক্ষণকালের নিমিত্ত স্তম্ভিতের ন্যায় হইয়া রহিলেন। কাহারও মুখে আর কথা নাই, পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। গুরুদেবের বিচ্ছেদে সকলকেই অত্যন্ত কাতর বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু গোপাল কিছু মাত্র কাতর হন নাই; তাঁহার বরং আনন্দের বৃদ্ধিই হইয়াছিল। কেননা, তিনি দেখিলেন এবং বুঝিলেন, যে গুরুদেবের বিচ্ছেদে ইঁহাদের যে কাতরতা হইয়াছে, গুরুদেবের প্রতি প্রেম বা নিশ্চয় ভালবাসা না জন্মিলে, তাঁহা কখনই হয় না।

সাধকের গুরুর প্রতি প্রেম বা ভালবাসা নিতান্ত আবশ্যক। যে সাধকের গুরুর প্রতি অন্তরের সহিত প্রেম বা ভালবাসা জন্মে এবং যিনি তাঁহার অদর্শনে বিচ্ছেদ যন্ত্রণাও অনুভব করেন, তাঁহার শান্তির পথ অতি নিকট হইয়াছে বুঝিতে হইবে। গুরুদেবের অদর্শনে ইঁহাদের বিচ্ছেদযন্ত্রণা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, ইহা ভাবী মঙ্গলজনক বুঝিয়া গোপাল আনন্দ মনে বলিলেন,–'' আপনারা যাঁহার অদর্শন বোধ করিয়া কাতর হইতেছেন, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছেন, কারণ, তিনি মুক্তাত্মা। যাঁহার জ্ঞানরূপ চক্ষু উন্মীলিত হইয়াছে; তিনিই ইহা অবগত আছেন, অপরে নহেন। গুরুদেব আপনাদেরও উক্ত জ্ঞানরূপ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এখন আপনারা আত্মকর্ম্মের দ্বারা সেই জ্ঞানরূপ চক্ষুর উন্মীলিত অবস্থাকে স্থায়ী করুন অর্থাৎ চক্ষুঃস্বরূপ যে জ্যোতির্ম্ময় রূপ দেখিয়াছেন এবং যে আত্মকর্ম্ম পাইয়াছেন, তাঁহাকে জড় না ভাবিয়া,

সেই আত্মকর্ম্মে তন্ময় হইলেই তাহার অতীত অবস্থা আসিবে। সেই অতীত অবস্থা স্থায়ী হইলেই জ্ঞানরূপ চক্ষুর উন্মীলিত অবস্থা স্থায়ী হইবে। তখনই অন্ধ মন চক্ষুষ্মান হইবে – নচেৎ নহে- এবং তখনই বুঝিতে পারিবেন যে, গুরুদেব সর্ব্বত্রই আছেন। অতএব "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" এই মহাবাক্যকে দৃঢ় করিয়া গুরুবাক্যমত কর্ম্ম করিয়া চলুন। তাহা হইলে অচিরেই চক্ষুষ্মান্ অবস্থা লাভ হইবে। এ অবস্থায় দেখিবার কিছু থাকে না, জানিবারও কিছু থাকে না। অর্থাৎ ইচ্ছারহিত অবস্থা হয়। এই অবস্থায়ই পরম শান্তির অবস্থা এবং ইহা দেবতাগণের বাঞ্ছনীয়।

"আপনারা আলস্য বা সন্দেহ না করিয়া "আপনার" কর্ম্ম করিয়া চলুন। আলস্য ও সন্দেহ এই দুইটি সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের পরম শত্রু। ভাগ্যবলে সাধনের প্রথম অবস্থায় যাঁহাদের এই দুই শত্রু না থাকে, তাঁহারা অচিরে শান্তি লাভ করিয়া থাকেন। অতএব আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিয়া চলুন।"

রাজা গুরুপুত্রকে বলিলেন,–"নাথ! আপনার কৃপায় আমার এই অমূল্যরত্ন আত্মকর্ম্ম এবং শিবদর্শন উভয়ই লাভ হইল; এক্ষণে আশীর্ব্বাদ করুন, যাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারি।"

গুরুপুত্র উত্তর করিলেন,–"কর্ম্ম করিয়া গেলেই কেনই বা কৃতকার্য্য হইতে না পারিবেন ? অচিরেই গুরুকৃপায় শান্তির অবস্থা যাহা পাইয়াছেন, তাহা স্থায়ী হইবে– ইহাতে আর সন্দেহ নাই।"

তাহার পর রাজা নিজে গুরুদেবকে বলিলেন,–"নাথ! আমি আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি–আমার জন্য আপনাকে অনেক ক্লেশ পাইতে হইয়াছে। অন্তরে না থাকিলেও আমি মুখে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তজ্জন্য আমি আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি। নাথ! আমার সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন"– এই কথা বলিয়া রাজা গুরুদেবের চরণে পড়িয়া রহিলেন।

গুরুদেব রাজার হস্তধারণ করিয়া তাঁহাকে নিজ ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া বলিলেন,- –"মহারাজ! আপনি কোন বিষয়ে আমার নিকট অপরাধী নহেন, বরং আমিই আপনার নিকট অপরাধী হইয়াছি; গুরুর যাহা কার্য্য, তাহা আমি নিজে জানিতাম না, অথচ লোভের বশীভূত হইয়া আমি আপনার নিকট প্রকৃত কথা গোপন করিয়া, সব কাজ জানি বলিয়া, নিজের পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতাম। হা ধিক্! ইহাই কি গুরুর কার্য্য!! মহারাজ! আপনি আমাকে ওসব কথা আর বলিবেন না। আপনি আমার নিকট কোন বিষয়েই অপরাধী নহেন। মহারাজ! আপনারই কল্যাণে আজ আমি যাহা প্রাপ্ত হইলাম, ইহাতে আমার বোধ হইতেছে যে, আমি আপনার গুরু নহি,– আপনিই আমার গুরুতুল্য। মহারাজ!

আপনি যদি কঠোর দন্ডাজ্ঞা না দিতেন; তাহা হইলে ত আমি ভববন্ধন ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায় এই যোগরত্ন লাভ করিতে পারিতাম না। মহারাজ! আপনি দন্ডাজ্ঞা করিয়াছিলেন বলিয়া, পুত্র গোপালও প্রকাশিত হইল, এবং তাহা না করিলে বোধ হয়, গোপালও প্রকাশিত হইত না। সুতরাং আমাদেরও নরকভোগ যাইত না। মহারাজ! আপনারই কল্যাণে আমার ও ব্রাহ্মণীর ভবসাগরের তরণীরূপ এই অপূর্ব্ব যোগকৌশল লাভ হইল। অতএব আপনিই ধন্য!! গুরুদেব আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন্"–এই কথা বলিয়া ব্রাহ্মণ নিস্তব্ধ হইলেন।

রাজা গুরুদেবের কোল হইতে উঠিয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া, রাজ্ঞীর সহিত গুরুপত্নীকে ও গুরুর পুত্রবধূকে প্রণাম করিলেন। তাহার পর তিনি গুরুদেব ও গুরুপুত্রের আজ্ঞা লইয়া, রাজ্ঞীকে অগ্রে শিবিকারোহণ করাইয়া রাজবাটীতে পাঠাইয়া দিলেন। পরে নিজের যাইবার জন্য অপর একখানি শিবিকা আনয়ন করাইলেন এবং গুরুদেবকে ও গুরুপুত্রকে দন্ডবৎ প্রণাম করিয়া, উভয়ের অনুমতি লইয়া রাজবাটী গমন করিলেন।

এদিকে গোপালের মাতাপিতা দিন দিন কর্ম্মের উন্নতি করিয়া বেশ শান্তি পাইতে লাগিলেন। রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই গুরুপুত্রের উপদেশ মত আত্মকর্ম্মের দ্বারা অপার শান্তি লাভ করিয়া, পরমানন্দের অবস্থা লাভ করিলেন। গোপালের এখন আর পাগল বেশ নাই। তিনি গুরুদেবের আগমন কাল হইতে পূর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, নিজের উন্নতির সহিত দেশেরও উন্নতির চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য অবগত হইতে না পারিলে, দেশেরও নিজের উন্নতি কিছুতেই হইবে না। কর্ম্ম করিতে হইলে সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন কর্ম্মীর উপদেশমত চলা উচিত। নচেৎ রাজসিক বা তামসিক ভাবাপন্ন কর্ম্মীর নিকট শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমাদেরও তাহাই ঘটিয়াছে। কেননা, যাঁহারা আমাদিগকে উপদেশ দীক্ষাদি দিয়া থাকেন,তাঁহারা প্রায় রাজসিক ও তামসিক ভাবাপন্ন; সুতরাং আমাদেরও গতি রজস্তমোগুণে হইতেছে। তাঁহাদের নিকট হইতে বেদপুরাণাদি যাহা কিছু শ্রবণ করিয়া থাকি, তাহার কিছুতেই মনের তৃপ্তি হইতেছে না। তৃপ্তি হইবে কোথা হইতে ? পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট হইতে পুরাণ শ্রবণ করিলেন, এবং শুকদেব তাঁহাকে প্রাণায়াম যোগাভ্যাসের উপদেশ দিয়া, ভগবান্ আত্মানারায়ণের রূপ দর্শন করাইয়া দিলেন। কিন্তু আজকালের পুরাণ পাঠ ও পুরাণশ্রবণ অন্যরূপ। আমি পুরাণ শ্রবণ করিলাম এবং তাহাতে চারি পাঁচ হাজার টাকাও খরচ করিলাম; অথচ গল্পের মতন বাহ্যবিষয় শ্রবণ করিলাম মাত্র। আবার যিনি পুরাণ শ্রবণ করাইলেন তিনি একবার মুখেও আনিলেন না যে, প্রাণায়াম যোগাভ্যাসে রত না হইলে আমার পুরাণ শ্রবণ করা না করা দুইই তুল্য।

একথা যদি আমি শুনিতাম, তাহা হইলেও না হয় জানিতাম যে পুরাণ কেবলমাত্র শ্রবণ করিলে আমার কিছুই হইবে না। জানিলে প্রকৃত কার্য্যের চেষ্টাও করিতে পারিতাম। এখন কেবল কথার ছড়াছড়ি ও গানের ছড়াছড়ি!! ঐ সকলে শান্তি কোথায়? ঐ সকলে যদি শান্তি হয়, তাহা হইলে যাত্রা শুনিলে শান্তি হয় না কেন?

সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন সংযমী ব্যতীত অপরের নিকট বেদপুরাণতন্ত্রাদি শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া শান্তি পাইতে গেলে, যাত্রা শ্রবণের ন্যায় কেবল সং দেখা ও গান শুনা হইবে মাত্র; শান্তিলাভ হইবে না। শান্তিলাভ করিতে হইলে, পরীক্ষিতের ন্যায় আত্মকর্ম্মের অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা না করিলে কেবল বাহ্যভাবে বা বাহ্যজ্ঞান-ভক্তিতে কিছুই শান্তিলাভ হইবে না। আত্মকর্ম্ম প্রাণায়াম যোগাভ্যাস ব্যতীত কিছুতে কখনও কাহারও শান্তিলাভ হয় নাই এবং কখন হইবেও না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সেই আত্মকর্ম্ম দেশে লুপ্তপ্রায়। উহার অভাবে দেশে কাহারও শান্তি নাই। দেশের সর্ব্বত্রই অশান্তিরূপ ব্যাধিতে পরিপূর্ণ—না আছে কাহারও শারীরিক বল, না আছে কাহারও মনের বল এবং না আছে শারীরিক সুস্থতা। সকলেই প্রায় একটা না একটা ব্যাধিতে আক্রান্ত। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত কাহারও প্রায় সর্ব্বদা আনন্দবদন দেখা যায় না। অন্তরে যেন কত অভাব, কত জ্বালা বিরাজ করিতেছে। অন্তরের ভাব মুখে প্রকাশিত হইয়া সর্ব্বদাই বিষণ্ণ বদন করিয়া রাখিয়াছে। কেহ কাহারও ভাল দেখিতে পারে না। পরস্পর পরস্পরে শত্রুতা। সহোদর ভ্রাতার মধ্যেও পরস্পরে মিল নাই। স্ত্রীপুরুষে, পিতাপুত্রে, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠে, পরস্পর পৃথক ভাব। এক আত্মকর্ম্মের অভাবে সকল বিষয়েরই অভাব হইয়া পড়িয়াছে।

এক সময়ে এই আত্মকর্ম্মের প্রভাবে যাঁহারা প্রভুশ্রেণীভুক্ত ছিলেন, আজ তাঁহাদেরই বংশধরেরা আত্মকর্ম্মে তাচ্ছিল্য করিয়া দাসেরও যোগ্য হইতেছে না। হায়! হায়! কি শোচনীয় পরিণাম!! ধর্ম্মজীবন লাভ ব্যতীত মানব মাত্রেরই কোন বিষয়ের উন্নতি হয় না। যদিও দৈব আনুকূল্যে পার্থিব বিষয়ের উন্নতিকখন কখন দেখা যায় বটে, কিন্তু ধর্ম্ম জীবন না হইলে, তাহা রক্ষিত হয় না। এই কারণে উপস্থিত কালে পার্থিব বিষয়েও দুই এক পুরুষের বেশী স্থায়ী হইতে প্রায় দেখা যায় না। আত্মকর্ম্মের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। এই আত্মকর্ম্মের অভাবে পুরুষানুক্রমে ইন্দ্রিয়বৃত্তি এবং পাশবিক ও আসুরিক ভাব সকল প্রবল হইয়া এক্ষণে এরূপ সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এই সকলের দ্বারা মোহবশতঃ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মকে অধর্ম্মবোধ, কর্ম্মকে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মকে কর্ম্মবোধ, অনাত্মাতে আত্মাবোধ এবং আত্মাতে অনাত্মাবোধ, সত্যকে অসত্য এবং অসত্যকে সত্যবোধ, আসুরিক ও পাশবিক ভাবকে দেবভাববোধ, জ্ঞানকে অজ্ঞান, অজ্ঞানকে জ্ঞান, বিদ্যাকে অবিদ্যা, অবিদ্যাকে বিদ্যা, অন্তঃকর্ম্মকে বাহ্যকর্ম্ম, বাহ্যকে

অন্তঃকর্ম্মবোধ আমাদের সংস্কারগত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমার নিকট সত্য অগ্রাহ্য, ধর্ম্মও অগ্রাহ্য, আত্মাও অগ্রাহ্য, কর্ম্মও অগ্রাহ্য – প্রকৃত বিষয়মাত্রেই প্রায় অগ্রাহ্যের মধ্যে পড়িয়াছে। নিজে ত কিছু গ্রাহ্য করিব না তাহার উপর আবার যদি কেহ প্রকৃত বিষয় প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাকেও নিজের দলে আনিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া তাহা হইতে ফিরাইয়া আনিব।

এই সকল নানা কারণে আত্মধর্ম্ম ক্রমশঃ সাধারণের নিকট হইতে অপ্রকাশ হইতেছে। এই আত্মধর্ম্মের প্রকাশ করিতে হইলে এবং দেশের শ্রীবৃদ্ধি ও যাগ-যজ্ঞ পূজাদি সাত্ত্বিক ভাবে করিতে হইলে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতায় আত্মকর্ম্মের যে সকল অনুষ্ঠান এবং সাত্ত্বিক কর্ম্মের ও অপরাপর সাত্ত্বিক বিষয়ের যে সকল উপদেশ বলিয়া গিয়াছেন, তৎসমুদায় পুরুষানুক্রমে অভ্যাস করিতে হইবে। তাহা হইলে দুই চারি পুরুষের মধ্যে পূর্ব্ব গৌরব আবার প্রকাশিত হইতে পারে,– নচেৎ নহে। অতএব গীতোক্ত উপদেশ সকল কণ্ঠস্থ করিয়া ঐ সকলকে কণ্ঠমালার ন্যায় কণ্ঠদেশে ধারণ করা উচিত। গুরুপদেশে গীতোক্ত কর্ম্ম সকলে বিশ্বাস করিয়া "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপাতন" এই মহাবাক্যে লক্ষ্য করিয়া গীতোক্ত আত্মযোগের সাধন করিলে, একদিন আবার নিজের ও দেশের মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে– নচেৎ কিছুতেই মঙ্গল হইবে না; নিশ্চয় বলিবার কারণ এই যে ব্রহ্মাদি দেবগণ , নারদাদি ঋষিগণ, এবং সাধুগণও নিজে আত্মযোগের অনুষ্ঠান করিয়া সকলের করিবার জন্য শাস্ত্রে তাহার উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহারা যদি সত্য হন এবং তাঁহাদের বাক্য ও কার্য্য যদি সত্য হয়, তাহা হইলে উপরে যাহা বলা হইল, তাহাও নিশ্চয় সত্য – কখনই মিথ্যা নহে। আর যদি আমি অনার্য্যবৎ বলি যে ইহা মিথ্যা, তাহা হইলেও ইহা মিথ্যা নহে, কেননা শাস্ত্রবাক্য বা ঋষিবাক্য ছাড়িয়া যুক্তি দ্বারা বুঝিতে গেলেও সাধনমার্গের প্রাণায়ামরূপ আত্মযোগ উপাসকশ্রেণীর উপাসনার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখ্য উপায়। ইহা ব্যতীত যে সকল উপায় আছে তৎসমুদায়ই ভগ্ন বা জীর্ণতরীবৎ গৌণ উপায়। অনার্য্য বলিবার কারণ এই যে, দেবগণের, ঋষিগণের ও সাধুগণের বাক্যে যাঁহার বিশ্বাস নাই, তাঁহাকে অনার্য্য ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ?

প্রাণায়ামরূপ আত্মযোগ জীবমাত্রেরই মহাধর্ম্ম; কারণ প্রাণই জীবের একমাত্র জীবন – জীবের একমাত্র অবলম্বন। প্রাণের ত্যাগে যেমন দেহলীলা সংবরণ করিতে হয়, তদ্রূপ প্রাণকে ছাড়িয়া কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতে গেলে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ লাভ না হইয়া চির অশান্তিসাগরে মগ্ন হইতে হয়। কারণ , প্রাণের সংযম না হইলে, ইন্দ্রিয় ও রিপুগণ কিছুতেই স্থায়িরূপে সংযত হয় না। তবে রাজভয়ে বা লোকলজ্জা ভয়ে বা যশঃ

প্রত্যাশায় কিংবা অজ্ঞানবশতঃ পুরাণ-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া লোককে রাজবৈরাগ্য বা ভক্তির ভাব দেখান কঠিন নহে। কিন্তু তাহাতে নিজের অন্তরে সর্ব্বদাই অশান্তি থাকে। হায়! কি দুঃখের বিষয় যে তাহা আমি বুঝিয়াও বুঝিতে পারি না – সর্ব্বদাই মোহমদে আচ্ছন্ন থাকায় প্রণিধান করিয়াও বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারি না। আরও বিশেষ, যাহাতে জোর করিয়া সংযত করিতে যাইতেছি; আমা অপেক্ষা সে যে কোটি কোটি মত্ত হস্তীর বল ধারণ করে, তাহা আমার জানা নাই।

এক সময়ে রতি ভীত হইয়া কামদেবকে বলিয়াছিল –"নাথ! আমি শুনিয়াছি যে আমাদের বংশ লোপ করিবার জন্য আমাদের কুলে বিদ্যা নাম্নী কন্যা জন্ম গ্রহণ করিবে। ইহা শুনিয়া আমার শরীর ভয়ে ও শোকে কম্পিত হইতেছে"। তদুত্তরে কাম রতিকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়াছিল –"প্রিয়ে! আমি শরে হরের ধ্যান ভঙ্গ করিয়াছিলাম। যদি একবারে পঞ্চবাণ ক্ষেপণ করি, তবে হরিহর ব্রহ্মারও ধ্যানভঙ্গ করিতে পারি। অতএব তোমার চিন্তা কি"? কামের ন্যায় প্রবল রিপুকুলকে ও ইন্দ্রিয়গণকে শুষ্ক পুরাণ-বৈরাগ্য বা শ্মশান-বৈরাগ্য ও লৌকিক রাজসিক বা তামসিক ভক্তির দ্বারা জয় করিতে যাওয়া কি আমার দুরাশা নহে? ইহাও যে আমার আত্মকর্ম্ম হইতে বিরত করাইবার সেই কামের এক প্রকার অস্ত্র, তাহা আমার জানা নাই!! কাম ধর্ম্মের ভাণে জীবকে স্বর্গাদির কামনায় আসক্ত করাইয়া প্রকারান্তরে রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মে বদ্ধ করিয়া রাখে। এই কারণে শাস্ত্রে ইহাকে আত্মযোগের ধর্ম্মরূপ বিঘ্ন বলিয়াছে।

সাধারণতঃ জীবমাত্রেরই মনে একটু আধটু ভক্তি প্রায় দেখা যায়। এমন কি ডাকাইতেরাও সময়ে সময়ে ভক্তিপূর্ব্বক কালীপূজাদি করিয়া ডাকাইতি করিতে যায়। ইহাও ত ভক্তি। এরূপ ভক্তির দ্বারা কি আমার শান্তিলাভ হইবে? ভয়ে শোকে বা অভাবে কিংবা পুত্রকন্যাদি আত্মীয় স্বজনের নিধন হেতু অথবা কোন না কোন পার্থিব বিষয়ের অপ্রাপ্তি জন্য যে বৈরাগ্যের উদয় হয়, তাহা জীবভাবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। এইরূপ বৈরাগ্যের দ্বারা যদি ভগবৎপ্রাপ্তি বা মোক্ষ প্রাপ্তি হইত, তাহা হইলে আর সাধনের আবশ্যক কি? সাধনের দ্বারা প্রাণের সংযত অবস্থা না হইলে, ইচ্ছা রহিত অবস্থা হয় না এবং ইচ্ছা রহিত অবস্থা না হইলেও প্রকৃত সাত্ত্বিক বৈরাগ্য বা ভক্তি কিছুতেই হইতে পারে না নচেৎ পূর্ব্বোক্ত ভক্তি বা বৈরাগ্য যদি ভগবৎপ্রাপ্তি হইত তাহা হইলে সংসার এতদিনে জীবশূন্য হইয়া যাইত। কই এখনও ত তাহা হয় নাই – জীব বর্ত্তমান রহিয়াছে। জীবের মুখেও শুনা যায় –"আরে মহাশয় সবই অনিত্য; একদিন সকলকেই যাইতে হইবে; এসব যাহা কিছু দেখিতেছেন; তাহা কিছুই নহে; তিনিই একমাত্র সত্য"। এইরূপ ত অনেকেরই মুখে শুনা যায়, কিন্তু কাহারও কি শান্তি আছে? কথায় শান্তি নাই।

আমি ভ্রান্ত বলিয়া কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। মুখে সব বলিয়া থাকি, কিন্তু শাস্ত্রাদি পাঠজনিত যে জ্ঞান ভক্তি বা বৈরাগ্যের উদয় হয় সে গুলি আত্মকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করাইবার ক্ষেত্রে কাম যে এক প্রকার অস্ত্র, তাহা আমি জানি না। কাম যে এইরূপ শুষ্ক জ্ঞান ভক্তি বা বৈরাগ্যের দ্বারা আমায় ভুলাইয়া সাধনমার্গে যাইতে দিতেছে না, কামের বাণে মোহিত হইয়া আমি তাহা বুঝিতে পারি না। এইজন্য শাস্ত্রেও এই গুলিতে আত্মযোগের অভ্যাসিগণের জ্ঞানরূপ যোগবিঘ্ন বলিয়াছেন। এই জন্যই সাধক গুরুপদেশমত আত্মকর্ম্মে রত হইয়া ঐরূপ শুষ্ক ভক্তি বৈরাগ্য বা জ্ঞানের চর্চ্চায় রত হন না। কারণ, ঐগুলি বিঘ্নস্বরূপ। আত্মকর্ম্মের দ্বারা যাহা লাভ হইবে এবং আত্মকর্ম্ম ব্যতীত যাহা কিছুতেই লাভ হইবার নহে, তাহা লইয়া বুদ্ধিমান লোকে কেবল কথার আলোচনায় বা তর্কে কেন সময় নষ্ট করিবেন? তাঁহারা তাহা করেন না, আত্মকর্ম্মেই রত হন। অতএব কথার ছড়াছড়ি না করিয়া, গীতোক্ত ভগবদ্বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক গীতোক্ত কর্ম্মে নির্ভর করিয়া যাওয়া আমাদেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা হইলেই আমরা ভগবান আত্মানারায়ণ শ্রীকৃষ্ণে ক্রমশঃ তন্ময় হইয়া অপার শান্তিলাভ করিতে পারিব। তিনিই যে ভবসাগরের একমাত্র কান্ডারী ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

গ্রন্থবাহুল্যভয়ে এইখানেই পাঠক ও পাঠিকাগণকে অভিবাদন পূর্ব্বক ভগবান আত্মানারায়ণকে স্মরণ করিয়া গ্রন্থ সমাপন করিলাম।

অলমতি-বিস্তরেণ।

—

পরিশিষ্ট

সাধকের ও সাধারণের কর্ত্তব্য।

১। আর্য্য ঋষিদিগের ধর্ম্মে প্রাণ উৎসর্গ করা।

২। হিন্দুকুলে জন্মিয়া হিন্দুধর্ম্মে জীবন উৎসর্গ করা।

৩। আত্মবিদ্যালাভের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করা।

৪। সদ্‌গুরুলাভের চেষ্টা করা।

৫। শাস্ত্র ও গুরুবাক্য বিশ্বাস করা।

৬। সদাচার ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হওয়া।

৭। পরধর্ম্মে বিরত থাকা।

৮। শাস্ত্রের বিধি নিষেধ মানিয়া চলা।

৯। শাস্ত্রীয় কার্য্যদ্বারা নিজের উন্নতি সাধনে যত্নবান হওয়া।

১০। আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা করা।

১১। আপনার স্বরূপ উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করা।

১২। নিত্যানিত্য বিচার করা।

১৩। দুর্লভ মানব জন্ম পাইয়া তদুপযুক্ত কার্য্য করা।

১৪। যাহাতে পুনরায় মানব-দেহ পাওয়া যায়, এমন কার্য্য করা।

১৫। অহঙ্কার ত্যাগ করা।

১৬। পুণ্যকর্ম্ম শীঘ্র করা।

১৭। পাপকর্ম্ম কদাচ না করা।

১৮। সর্ব্বদা আপনাকে অণু হইতেও অণু মনে করা।

১৯। কাহাকেও আপন অপেক্ষা ছোট জ্ঞান না করা।

২০। দেহের পরিণাম চিন্তা করা ও আত্মকর্ম্মে রত থাকা।

২১। কোন দেবদেবীকে উপহাস না করা।

২২। আচার্য্য, সিদ্ধ ব্রাহ্মণ ও দেবতার প্রতি ভক্তি করা।

২৩। গুরু বা ভগবানে "আমি" "আমার" বিষয় অর্পণ করা।

২৪। ভগবানের নিকট কিছু প্রার্থনা না করা।

২৫। নিত্য গুরুপদিষ্ট মতে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা।

২৬। যে সকল বৃক্ষের পূজা হয়, সে সকল বৃক্ষ, দেবমন্দিরের ধ্বজা, মন্দির, গুরু, এবং পূজ্য ব্যক্তির ছায়া লঙ্ঘন না করা।

২৭। কাহারও মনে অযথা ক্লেশ না দেওয়া।

২৮। কাহারও অপমান না করা।

২৯। কাহারও নিন্দা না করা।

৩০। উচ্চহাস্যপরিহাসাদি না করা।

৩১। জীবের উপর ক্রোধ না করিয়া ক্রোধের উপর ক্রোধ করা।

৩২। ক্রোধিত ব্যক্তির প্রতি ক্রোধিত না হওয়া।

৩৩। ক্রোধের উদয় হইলে, আপনাকে আপনি অণু মনে করা।

৩৪। ছয় রিপু দমন করিবার চেষ্টা করা।

৩৫। সর্ব্বদা কাম রিপুকে জয় করিবার চেষ্টা করা।

৩৬। কামের বা কামনার উদয় হইলে, গুরু, আত্মা, নারায়ণ, ভগবান্‌কে স্মরণ করা।

৩৭। কোন প্রাণীর হিংসা না করা।

৩৮। কোন প্রাণীকে নিজের আমোদের জন্য ক্লেশ না দেওয়া।

৩৯। মানবগণের প্রতি বন্ধুভাব স্থাপনের চেষ্টা করা।

৪০। কোন জাতিবিশেষকে অন্তরে ঘৃণা না করা।

৪১। নীচ জাতির পীড়ন না করা।

৪২। নীচ জাতির সহবাস না করা।

৪৩। নীচ জাতিকে সদুপদেশ দেওয়া।

৪৪। সত্য বাক্য বলা।

৪৫। প্রিয় বাক্য বলা।

৪৬। অপ্রিয় বাক্য না বলা।

৪৭। সদা আপনাতে আপনি থাকিয়া মৌনী হওয়া।

৪৮। বৃথা বাক্য অধিক না বলা।

৪৯। কাহারও সহিত বিতন্ডা না করা।

৫০। কাহারও সহিত ঝগড়া না করা।

৫১। না জানিয়া তর্ক না করা।

৫২। নিজকৃত পাপ গোপন করিয়া গুরুর নিকট প্রকাশ করা।

৫৩। গুরুর নিকট লজ্জা না করা।

৫৪। গুরুর নিকট বসিয়া কাহারও সহিত রহস্যাদি বৃথা আলাপ না করা।

৫৫। গুরুর নিকট হইতে সম্মান প্রার্থনা না করা।

৫৬। গুরুর নিকট সর্ব্বদা নত থাকা।

৫৭। কোন বিষয়ে আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে না করা।

৫৮। সর্ব্বদা ভাল দেখাইবার জন্য বেশভূষা না করা।

৫৯। সর্ব্বদা অপরিষ্কৃত না থাকা।

৬০। অপরিষ্কৃত দুর্গন্ধময় বস্ত্রাদি ব্যবহার না করা।

৬১। দুর্গন্ধময় স্থানে বাস না করা।

৬২। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে স্নান না করা।

৬৩। স্রোতস্বতী নদীতে স্নান বা গাত্র ধৌত করা।

৬৪। তীব্র স্রোতস্বতী নদীতে অবগাহন না করা।

৬৫। ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে তৈল মর্দ্দন বা স্নান না করা।

৬৬। স্নানান্তে অধিক কাল ভিজা কাপড়ে না থাকা।

৬৭। স্নানান্তে মস্তকে ভিজা কাপড় না রাখা।

৬৮। শ্রান্তি দূর না করিয়া, মুখ না ধুইয়া, উলঙ্গ হইয়া স্নান না করা।

৬৯। অধিক কাল জল মগ্ন না থাকা।

৭০। স্নানান্তে চন্দনাদি কিঞ্চিৎ গন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করা।

৭১। পরিমিত আহার করা।

৭২। অপরিমিত আহার না করা।

৭৩। যাহাতে সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে এরূপ আহার করা।

৭৪। বিনা পাত্রে, অপবিত্র পাত্রে, কুৎসিত স্থানে আহার না করা।

৭৫। কাহারও উচ্ছিষ্ট ভোজন না করা।

৭৬। আহারের অগ্রভাগ পঞ্চপ্রাণকেনা দিয়া আহার না করা।

৭৭। প্রথমে জলগ্রহণ না করিয়া আহার না করা।

৭৮। আহারের সময় কথা না কহা।

৭৯। অস্বাস্থ্যকর দ্রব্য ভোজন না করা।

৮০। মধ্যাহ্ন সময়ে আহার করা।

৮১। সন্ধ্যাকালে আহার না করা।

৮২। রাত্রি এক প্রহরের মধ্যে আহার করা।

৮৩। অধিক উষ্ণ বা অধিক শীতল দ্রব্য আহার না করা।

৮৪। বাসি বা দুর্গন্ধ দ্রব্য আহার না করা।

৮৫। তাম্বুলাদি অধিক পরিমাণে সেবন না করা।

৮৬। তাম্বুলাদি অল্প পরিমাণে সেবন করা।

৮৭। সর্ব্বদা ধূমপান না করা।

৮৮। আবশ্যক হইলে আহারান্তে ধূমপান করা।

৮৯। কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন না করা।

৯০। মলমূত্রের বেগধারণ না করা।

৯১। মলমূত্রের দ্বার পরিষ্কৃত রাখা।

৯২। অগ্নি সেবন না করা।

৯৩। গৃহদাহ সময়ে গৃহের মধ্যে প্রবেশ না করা।

৯৪। রৌদ্র সেবন না করা।

৯৫। অগ্রবাত, আতপ, শিশির, ঝড় – এই সকল সেবন না করা।

৯৬। অধিক পর্য্যটন না করা।

৯৭। অতি দ্রুত না চলা।

৯৮। অধিক পরিশ্রম না করা।

৯৯। একাকী শূন্য গৃহে শয়ন না করা।

১০০। বৃক্ষমূলে শয়ন না করা।

১০১। অনাবৃত স্থানে শয়ন না করা।

১০২। উচ্চ নীচ স্থানে শয়ন না করা।

১০৩। অতি কোমল শয্যায় শয়ন না করা।

১০৪। অতি কঠিন শয্যায় শয়ন না করা।

১০৫। ভূমিতে শয়ন না করা।

১০৬। সমতলস্থানে যথাযোগ্য শয্যায় শয়ন করা।

১০৭। শয্যায় পুষ্প বা পাতা না রাখা।

১০৮। বালিশ-হীন শয্যায় শয়ন না করা।

১০৯। বিনামা ধারণ করা।

১১০। সচ্চরিত্র ও নম্র হওয়া।

১১১। শান্ত ও ধীর হওয়া।

১১২। ক্ষমাবান্ হওয়া।

১১৩। ধার্ম্মিক হওয়া।

১১৪। সাধু হইবার চেষ্টা করা।

১১৫। পথে চলিবার সময় সম্মুখে চারি হস্ত পরিমাণ মৃত্তিকায় দৃষ্টি রাখিয়া চলা।

১১৬। সকল জীবকে সমানভাবে দেখা।

১১৭। কাহারও ভয় উৎপাদন না করা।

১১৮। ভীত ব্যক্তিকে আশ্বাস প্রদান কর।

১১৯। কাহাকেও কটু কথা না বলা।

১২০। পরের কর্কশ বাক্য সহ্য করা।

১২১। সর্ব্বদা পরের উপকার করা।

১২২। কাহারও অনিষ্ট না করা।

১২৩। পরের ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করা।

১২৪। পরৈশ্বর্য্যে কাতর না হওয়া।

১২৫। পরের ধন অপহরণ করিবার চেষ্টা না করা।

১২৬। সর্ব্বদা লোভ ত্যাগ করা।

১২৭। অর্থের সদ্ব্যয় করা।

১২৮। পরস্ত্রী মাত্রকেই মাতৃবৎ জ্ঞান করা।

১২৯। অপরের স্ত্রীতে দৃষ্টি না করা।

১৩০। স্ত্রীজাতির নিন্দা না করা।

১৩১। গোপনীয় বিষয় স্ত্রীলোকের নিকট প্রকাশ না করা।

১৩২। গুপ্তভাবে অন্যা স্ত্রীর সহিত গুহ্যভাষণ না করা।

১৩৩। স্ত্রীকণ্ঠের গীত শ্রবণ না করা।

১৩৪। স্ত্রীলোকের নৃত্য দর্শন না করা।

১৩৫। স্ত্রীর রূপের বিষয় মনে মনে চিন্তা না করা।

১৩৬। স্ত্রীজাতিকে অধিক বিশ্বাস না করা।

১৩৭। পতিব্রতা স্ত্রীলোকের পূজা করা।

১৩৮। বিধবা স্ত্রীগণকে মাতার ন্যায় মান্য করা।

১৩৯। কাহারও সহিত শত্রুতা না করা।

১৪০। শত্রুকে শত্রুবোধ না করা।

১৪১। কাহারও দোষ না দেখা।

১৪২। সর্ব্বদা নিজের দোষানুসন্ধান করা।

১৪৩। কাহারও গোপনীয় বিষয় চেষ্টা করিয়া না জানা।

১৪৪। যিনি পাপ কার্য্য করেন তাঁহার সঙ্গ না করা।

১৪৫। জীর্ণ যানে আরোহণ না করা।

১৪৬। পর্ব্বতের মস্তকদেশে বিষম স্থানে ভ্রমণ না করা।

১৪৭। বৃক্ষারোহণ না করা।

১৪৮। জলাশয়তীরস্থ বৃক্ষছায়ায় উপবেশন না করা।

১৪৯। অসংযত ভাবে হাই হাঁচি হাস্য প্রভৃতি না করা।

১৫০। শব্দবান্ বায়ু নিঃসারণ না করা।

১৫১। নখের দ্বারা নাসিকা না খোঁটা।

১৫২। দাঁতের দ্বারা নখ না কামড়ান।

১৫৩। দাঁত কিড়মিড় না করা।

১৫৪। নখের দ্বারা নখ না বাজান।

১৫৫। নখের দ্বারা ভূমি খনন না করা।

১৫৬। উরু কম্পন না করা।

১৫৭। চুলের অগ্রভাগ না টানা।

১৫৮। অপবিত্র ও অমঙ্গল বস্তু সর্ব্বদা দর্শন না করা।

১৫৯। বন অটবী প্রভৃতি স্থানে গমন না করা।

১৬০। পাপাসক্ত, স্ত্রীমিত্র, ভৃত্য ইহাদের ভজনা না করা।

১৬১। উত্তমের সহিত বিরোধ না করা।

১৬২। নীচের উপাসনা না করা।

১৬৩। নিজে সরল হইবার চেষ্টা করা।

১৬৪। কপটতা ত্যাগ করা।

১৬৫। কাহারও সহিত কপট বা কুটিল ব্যবহার না করা।

১৬৬। অমান্য ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ না করা।

১৬৭। ভন্ডবেশধারী লোভী সাধুর আশ্রয় গ্রহণ না করা।

১৬৮। অতি নিদ্রা না যাওয়া।

১৬৯। অতি জাগরণ না করা।

১৭০। দীর্ঘ জানু হইয়া (জানু লম্বা করিয়া) দীর্ঘকাল না থাকা।

১৭১। সর্পের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন না করা।

১৭২। দ্রংষ্ট্রী বা শৃঙ্গধারী জন্তুর অতি নিকট গমন বা তাহাদের অনুগমন না করা।

১৭৩। জলে বা অগ্নিতে প্রস্রাব ত্যাগ না করা।

১৭৪। প্রত্যূষে শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করা।

১৭৫। প্রাতঃকালে নিদ্রা বা স্ত্রীসম্ভোগ না করা।

১৭৬। সন্ধ্যাকালে নিদ্রা বা স্ত্রীসম্ভোগ না করা।

১৭৭। কোন কর্ম্মকে অগ্রাহ্য না করা।

১৭৮। দীর্ঘসূত্রতা না করা।

১৭৯। কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য না করা।

১৮০। কর্ম্ম থাকিতে কুড়েমি না করা।

১৮১। কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কথা ব্যতীত বাজে বা বৃথা কথায় বা আমোদে সময় নষ্ট না করা।

১৮২। সময়কে বেশী মূল্যবান মনে করা।

১৮৩। সর্ব্বদা সময়ের উপর লক্ষ্য করা।

১৮৪। যাহাতে বৃথা সময় নষ্ট না হয়, তাহার চেষ্টা করা।

১৮৫। জীবনের মধ্যে কি কি সৎ বা অসৎ কার্য্য করিয়াছি তাহা অনুচিন্তন ও বিচার করা।

১৮৬। মনের গতির উপর লক্ষ্য করা।

১৮৭। কিছুতেই মুগ্ধ না হওয়া।

১৮৮। সর্ব্বদা মনকে কুকার্য্য হইতে ফিরাইয়া আনিয়া, আত্মকর্ম্মে ব্যাপৃত রাখিবার জন্য গুরুপদেশ মত চেষ্টা করা।

১৮৯। সাংসারিক কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ না করিয়া, আত্মাতে লক্ষ্য রাখিয়া সকল কর্ম্ম করা।

১৯০। কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ করা।

১৯১। মনের বেগ ধারণ করা।

১৯২। যে কার্য্যে মনে সর্ব্বদা অক্ষয় সুখ ও আনন্দ থাকে, তাহাই করা।

১৯৩। মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখা।

১৯৪। আসক্তির সহিত বিষয় চিন্তা না করা।

১৯৫। মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে না যাইতে দিয়া আত্মাতে রাখিবার চেষ্টা করা।

১৯৬। অতিথির পূজা করা।

১৯৭। অতিথিকে গৃহাভ্যন্তরে শয়নের স্থান না দিয়া, বাটীর বর্হিভাগে কোন গৃহে স্থান দেওয়া।

১৯৮। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তিকে স্থান না দেওয়া।

১৯৯। বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণের অভ্যাস করা।

২০০। যাহাতে তাহাতে সন্তুষ্ট থাকা।

২০১। অসৎ বিষয়ে আশা না করা।

২০২। সৎ অর্থাৎ ভগবৎপ্রাপ্তি বিষয়ে আশা করা।

২০৩। অনাবশ্যক বিষয়ের ইচ্ছা না করা।

২০৪। প্রতিগ্রহ না করা।

২০৫। ভিক্ষা না করা।

২০৬। দেশ কাল পাত্র বিবেচনায় অর্থাদি দান করা।

২০৭। প্রকাশ্যভাবে, অহংকারের সহিত দান না করা।

২০৮। নিষ্কাম ও গুপ্তভাবে অর্থাদি দান করা।

২০৯। যশঃপ্রত্যাশায় দান না করা।

২১০। সম্মান প্রাপ্তির জন্য দান না করা।

২১১। যে কয়দিন আয়ু আছে,সৎকার্য্যে রত থাকা।

২১২। নিজের এবং পরিবারবর্গের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী কৃষি, গোরক্ষা বা বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করা।

২১৩। দেশের উপকারের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অর্থের সদ্ব্যয় করা।

২১৪। সর্ব্ব দেশীয় লোকের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করা।

২১৫। প্রতিবেশীর সহিত বিরোধ না করা।

২১৬। খলের সহবাস না করা।

২১৭। অধার্ম্মিকের ও রাজশত্রুর সঙ্গ না করা।

২১৮। উন্মত্ত, পতিত, ভ্রূণহত্যাকারী এবং নীচকুলোদ্ভব বা দুষ্টব্যক্তির সহবাস না করা।

২১৯। দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার করা।

২২০। অসৎ সঙ্গ না করা।

২২১। জীবের প্রতি দয়া করা।

২২২। জীবকে সদুপদেশ দান করা।

২২৩। মাতাপিতাকে ভক্তি করা।

২২৪। মাতাপিতার ছায়া উল্লঙ্ঘন না করা।

২২৫। মাতাপিতার আদেশ পালন করা।

২২৬। মাতাপিতার বাক্যের উপর বিতন্ডা না করা।

২২৭। মাতাপিতার সেবা করা।

২২৮। মাতাপিতার নিকট মনোভাব গোপন না করিয়া উহা প্রকাশ করা।

২২৯। প্রাতঃকালে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে মাতাপিতাকে দেবতার ন্যায় ভক্তিভাবে প্রণাম করা।

২৩০। পুত্র কন্যা বিক্রয় না করা।

২৩১। পুত্র কন্যার বিবাহে অর্থ গ্রহণ না করা।

২৩২। পুত্র কন্যাকে সদুপদেশ প্রদান করা।

২৩৩। পুত্রকে গুরুগৃহে প্রেরণ করা।

২৩৪। পুত্রের প্রতি স্বার্থ না রাখা।

২৩৫। অনাসক্ত ভাবে পুত্র কন্যার মঙ্গল চেষ্টা করা।

২৩৬। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকে তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা করা ও সদুপদেশ দান করা।

২৩৭। পুত্র ধর্ম্মকর্ম্মে রত হইলে তাহাতে বাধা না দেওয়া এবং প্রোৎসাহিত করা।

২৩৮। পুত্র যাহাতে আত্মকর্ম্মে রত হয়, তাহার চেষ্টা করা।

২৩৯। পুত্রকে বা তৎসমক্ষে অন্য কাহাকেও অশ্লীল বা কটু বাক্য না বলা।

২৪০। পুত্রের সম্মুখে মিথ্যা না বলা এবং ক্রীড়াদি না করা।

২৪১। গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিলে পুত্রের বিবাহ দেওয়া।

২৪২। সৎপাত্রে কন্যাদান করা অর্থাৎ সংযতচিত্ত জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিতে কন্যা দান করা।

২৪৩। বিধবা কন্যাকে আত্মকর্ম্মে নিযুক্ত করা।

২৪৪। বিধবা কন্যাকে দাসীর ন্যায় মনে না করা।

২৪৫। দাস দাসীকে কটু কথা না বলা।

২৪৬। কনিষ্ঠ ভাই ভগিনীকে স্নেহ করা।

২৪৭। পরান্ন ভোজন না করা।

২৪৮। রাজার প্রতি ভক্তি করা।

২৪৯। রাজাজ্ঞা পালন করা।

২৫০। রাজার বিরুদ্ধে কোন কথা না বলা।

২৫১। রাজার গুপ্ত বিষয় জানিলেও প্রকাশ না করা।

উপদেশমালা।

১। ভগবানের জন্য প্রাণ কাঁদিলেই সদ্‌গুরুলাভ হয়।

২। গুরুসেবা পরমধর্ম্ম।

৩। ধর্ম্মই প্রকৃত বন্ধু।

৪। জীবহিংসা মহাপাপ।

৫। অহিংসা পরম ধর্ম্ম।

৬। হিংসকের সকলেই হিংসা করে।

৭। হিংসা না থাকিলে (চিত্তে অহিংসা প্রতিষ্ঠিত হইলে) কোন প্রাণীই হিংসা করিবে না।

৮। সাধন ব্যতীত হিংসাবৃত্তি একেবারে যায় না।

৯। যাহাতে নিজের চিত্তশুদ্ধি হয়, এমত পবিত্র এবং শুদ্ধাচারে থাকিয়া আত্মকর্ম্ম করিবে।

১০। যাঁহার অন্তরে লক্ষ্য,— বাহিরে দৃষ্টি মাত্র তিনিই সাধু।

১১। ঋষিরা যেরূপ জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, তুমিও তদ্রূপ হইতে চেষ্টা কর।

১২। তুমি কালের অধীন, কাল তোমার অধীন নহে।

১৩। কালকে ধর,— বৃথা যাইতে দিও না।

১৪। সময় গেলে ফিরে না।

১৫। উপস্থিত সময়কে ধরিলে ভবিষ্যৎ তোমার আয়ত্ত হইবে।

১৬। উপস্থিত কাল তোমার,— ভবিষ্যতে কি হয় জান না।

১৭। মনের অসুখে শরীরক্ষয় ও আয়ুঃক্ষয় হয়।

১৮। মনে সুখ না থাকিলে বাহিরের কিছু ভাল লাগে না।

১৯। জন্ম মৃত্যু জরা অপেক্ষা মহাদুঃখ আর নাই।

২০। তুমি যাকে যেমন দেখিবে সেও তোমাকে তেমনি দেখিবে।

২১। কর্ম্মের ফলাফল অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

২২। শুভ কর্ম্মের শুভ ফল, অশুভ কর্ম্মের অশুভ ফল।

২৩। যাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয়, তাহাই সৎকার্য্য।

২৪। চিত্তশুদ্ধি হইলেই ঈশ্বরনিষ্ঠা হয়।

২৫। চিত্তশুদ্ধি হইলেই সকল ভূতে সমান জ্ঞান হয়।

২৬। আসক্তিই বন্ধনের কারণ, অনাসক্তিই মুক্তির হেতু।

২৭। সাধনের দ্বারা কর্ম্মের আসক্তি ত্যাগ হয়।

২৮। ধার্ম্মিকের অন্তরে সুখ।

২৯। অধার্ম্মিকের বাহিরে সুখ, অন্তরে দাহ।

৩০। যাহার শান্তি নাই, তাহার সুখ কোথায়।

৩১। সুখ মনে,– ধনে বা অন্য কিছুতে নহে।

৩২। অন্তরের সুখই প্রকৃত সুখ।

৩৩। সাধন বিনা লোভ-জয় হয় না।

৩৪। লোভ পরম শত্রু।

৩৫। লোভীর শান্তি নাই।

৩৬। লোভীর ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই।

৩৭। লোভীর অকার্য্য কিছুই নাই।

৩৮। লোভান্ধ আপনাকেও হত্যা করিতে পারে।

৩৯। লোভান্ধের ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।

৪০। লোভ না থাকিলে, পরদ্রব্যে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান হয়।

৪১। নির্লোভের পরশ্রীকাতরতা নাই।

৪২। সন্তুষ্টের লোভও নাই, ক্ষোভও নাই,– সদা শান্তি।

৪৩। সন্তোষ অমূল্য ধন।

৪৪। ধার্ম্মিকের সকল অবস্থায় সন্তোষ।

৪৫। লক্ষ্য স্থির না হইলে, বুদ্ধি স্থির হয় না।

৪৬। রিপুর বশে থাকিলে, স্বভাব নষ্ট হয়।

৪৭। যত দিন রিপুর অধীন, তত দিন কেহই "স্বা"ধীন নহে।

৪৮। সদ্‌গুরুর কৃপা বিনা রিপুজয় হয় না।

৪৯। ছয় রিপুর মধ্যে কামরিপুই প্রধান।

৫০। রিপু দমন হইলে, মন পবিত্র ও নির্ম্মল হয়।

৫১। মহাসমুদ্রে কোন "দল" নাই।

৫২। মন নির্ম্মল হইলে, জ্ঞানও নির্ম্মল হয়।

৫৩। যাঁহার মন বশীভূত, তিনিই সুখী।

৫৪। তোমার "আমি" মরিলে ভাল হইবে।

৫৫। যখন যে অবস্থায় থাকিবে, তখন সেই অবস্থায় আনন্দে থাকিবে।

৫৬। জ্ঞানই মনুষ্যের ভূষণ।

৫৭। জ্ঞান লাভ হইলেই মনুষ্যজন্ম সফল হয়।

৫৮। জ্ঞানহীন মনুষ্য পশুর সমান।

৫৯। পশুর সহিত অজ্ঞানীর ভেদ নাই।

৬০। আত্মজ্ঞানই জ্ঞান, তদ্ব্যতীত সমস্তই অজ্ঞান।

৬১। আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ভগবানকে পাওয়া যায়।

৬২। মানবদেহ ব্যতীত অন্যদেহে আত্মজ্ঞানলাভ হয় না।

৬৩। কেবল আহার নিদ্রা প্রভৃতি পশুবৎ কার্য্যের জন্য মানব দেহ পাও নাই।

৬৪। ধর্ম্মজীবনের তুল্য জীবন নাই।

৬৫। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইলে, জগতের পূজ্য হইবে।

৬৬। যাহা আপাততঃ চিত্তমোহকর, তাহা পরিণামে ক্লেশদায়ক।

৬৭। যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনিই বীর।

৬৮। ধর্ম্মে স্বর্গলাভ হয়।

৬৯। অধর্ম্মে নরকভোগ হয়।

৭০। পাপ করিলেই ভুগিতে হয়।

৭১। মাতাপিতার তুল্য বন্ধু নাই।

৭২। মনের অগোচরে পাপ নাই।

৭৩। "ভাব" না থাকিলেই অভাব বোধ হয়।

৭৪। দাঁড়াইয়া মলমূত্র ত্যাগ করিলে স্বাস্থ্যহানি সম্ভাবনা।

৭৫। ধর্ম্ম ব্যতীত, আর কিছুতেই অক্ষয় সুখ হয় না।

৭৬। না মরিলে কর্ম্মত্যাগ হয় না।

৭৭। সত্ত্বগুণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৭৮। সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি পাইলে, ভগবৎপ্রাপ্তি হয়।

৭৯। ইচ্ছারহিত না হইলে, ত্যাগ হয় না।

৮০। যাহার যেমন মন, তাহার তেমনি ধন।

৮১। আপন কাজে মন দাও, ভবিষ্যতে ভাল হইবে।

৮২। শাস্ত্রানুযায়ী কর্ম্ম করিলে, ভববন্ধন থাকে না।

৮৩। ভগবান আমাতেও আছেন, তোমাতেও আছেন।

৮৪। বিদ্যাধন চোরে অপহরণ করিতে পারে না।

৮৫। কর্ত্তব্যকার্য্য অবহেলা করিলে, আপনিই কষ্ট পাইবে।

৮৬। বিদ্বান নির্ধন হইলেও সর্ব্বত্র পূজিত।

৮৭। অপব্যয় করিও না, অভাব হইবে না।

রোগ ও ঔষধের ব্যবস্থা

পালা ও ম্যালেরিয়া জ্বর

অর্থাৎ যে জ্বর কম্প দিয়া বা শীত করিয়া হয়, তাহার সম্পূর্ণ বিজ্বর অবস্থায় এক নং ম্যালেরিয়া পিল ২/৩ ঘন্টা অন্তর ব্যবস্থা। এক দিনে তিন বা চারি বড়ির অধিক সেবন বিধি নহে। জ্বরের সময় ফিবার মিক্শ্চার পাঁচ ফোটা, সাত নম্বর টিংচার তিন ফোটা, চৌত্রিশ নম্বর টিংচার দুই ফোটা, অৰ্দ্ধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয়। যদি পেটের দোষ অথবা বমির লক্ষণ থাকে, তবে ম্যালেরিয়া পীল অপেক্ষা মিক্শ্চার সেবন ভাল।

ইন্‌ফ্যাণ্টইন্ লিভার

অর্থাৎ শিশুদিগের যকৃৎ-জনিত জ্বর, আটত্রিশ নম্বর টীংচার দুই ফোটা, চল্লিশ নম্বর টিংচার দুই ফোটা, ফিবার মিক্শ্চার এক ফোটা করিয়া অৰ্দ্ধ ছটাক্ জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয়। আর এক নম্বর সিরাপ পনর ফোটা এক কাঁচ্চা জলের সহিত দিবসে দুইবার সেবনীয়। যদি দাস্ত পাতলা হয়, তবে প্রথমোক্ত ঔষধের সহিত চল্লিশ নম্বর টিংচার দুই ফোটার স্থলে এক ফোটা ও একত্রিশ নম্বর টিংচার এক ফোটা দিতে হইবে। এক কাঁচ্চা অড়হর পাতার রস একটু চিনির সহিত দিনে একবার খাইতে দিবে।

সাধারণ রেমিটেণ্ট ফিবার

ফিবার মিক্শ্চার পাঁচফোটা, সাত নম্বর টিংচার দুই ফোটা, চল্লিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা করিয়া অৰ্দ্ধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয়। রোগের প্রাবল্য থাকিলে, রোগীর অবস্থানুযায়ী ৩/৪ ঘন্টা অন্তর সেবনীয়। রাত্রিতে নিদ্রাকালে ঔষধ বন্ধ থাকিবে। যদি দাস্ত থাকে, তবে চল্লিশ নম্বর টিংচার-এর স্থানে আটত্রিশ নম্বর টিংচার প্রযোজ্য। যদি বেশি পরিমাণে দাস্ত হয়, তাহা হইলে সাত ও চল্লিশ নম্বর টিংচার-এর স্থানে পঞ্চাশ, একত্রিশ ও এক নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা করিয়া, অৰ্দ্ধ ছটাক জলের সহিত ঘণ্টায় ঘণ্টায় প্রয়োজন্য। আট নম্বর টিংচার খাওয়ার আধ ঘণ্টার মধ্যে উত্তাপ বা

নাড়ী আসা উচিত। অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আট নম্বর টিংচার অর্দ্ধঘণ্টা অন্তরও দেওয়া যাইতে পারে। যদি রোগী অত্যন্ত বিকারগ্রস্ত হয়, অর্থাৎ বিছানা আঁচড়ায়, মাথা চালে, ভুল বকে এবং শ্বাসকষ্ট থাকে, তাহা হইলে, ছয় নম্বর টিংচার দুই বা তিন ফোটা পূর্ব্বোক্ত টীংচারের সহিত বা স্বতন্ত্র অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত দিবসে দুই বা তিনবার প্রযোজ্য। যদি শ্বাসকষ্ট খুব বেশি থাকে, তবে ছয় নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা পর্যন্ত দুই ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করা যায়। নাড়ী আসিলে ও গাত্র গরম হইলে, আট নম্বর টিংচার বন্ধ থাকিবে; তদ্রূপ শ্বাসকষ্ট নিবারণ হইলে, ছয় নম্বর টিংচার বন্ধ থাকিবে।'

নিউমোনিয়া বা ব্রন্‌কাইটিস্ হইলে ফিবার মিক্‌শ্চার তিন ফোটা, সাত নম্বর টিংচার তিন ফোটা, তিন নম্বর টিংচার তিন ফোটা ও বাইশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা, অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত রোগীর অবস্থানুযায়ী তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। রাত্রিতে নিদ্রাকালে ঔষধ বন্ধ থাকিবে। রোগীর বক্ষস্থলে বেদনা থাকিলে, ছয় নম্বর টিংচার তিন চারি ঘণ্টা অন্তর রোগীর বক্ষে ও পৃষ্ঠে মালিস করিবে ও তুলা পিজিয়া তাহার প্যাড্ করিয়া বক্ষস্থলে এ পৃষ্ঠে জড়াইয়া কাপড় বাঁধিয়া দিবে। রোগীকে সন্ধ্যার সময় একবার আধ ছটাক পানের রস ঈষৎ পরম করিয়া খাইতে দিবে; ইহাতে প্লুরেষি হইলেও আরাম হইবে; রোগীকে সর্ব্বদা কফ পিল মুখে রাখিতে দিবে; যদি কৃমীর দোষ থাকে, তাহা হইলে, ছাপ্পান্ন নম্বর টিংচার দুই হইতে পাঁচ ফোটা পর্য্যন্ত খাইতে দিবে। ধাত ছাড়িলে বা গাত্র ঠাণ্ডা হইলে, আট নম্বর টিংচার, পূর্ব্বোক্ত উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিবে। যদি অত্যন্ত পিপাসা থাকে, তাহা হইলে, রেমিটেন্ট ফিবারে দুই তোলা নিমফুল (শুষ্ক বা কাঁচা) এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, সেই জল মধ্যে মধ্যে তিন চারি বার খাইতে দিবে; উহাতে পিপাসা ও বিকারভাব কাটিয়া আসিবে।

পথ্য—জলসাগু বা দুগ্ধসাগু; যদি বেশি দাস্ত হয়, তাহা হইলে বার্লি বা এরারুট ও পানফলের পালো; বেদানা ও পানফল। জ্বর আরোগ্য হইলে কিছু দিন লঘুপথ্য (অর্থাৎ রুটি পুরাতন চাউলের অন্ন ও টাট্‌কা মৎস্যের ঝোল) দিবে। দাস্ত বা হইলে, খই বা বাতাসা দেওয়া যাইতে পারে।

সাধারণ জ্বর।—ফিবার মিকশ্চার পাঁচ ফোটা করিয়া অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তিন চারিবার প্রযোজ্য। দাস্ত খোলসা না থাকিলে, ইহার সহিত. সাত বা চল্লিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা দিতে হইবে। দাস্ত বেশি থাকিলে বা সহজ দাস্ত থাকিলে, সাত নম্বর টিংচার না দিয়া একত্রিশ

নম্বর টিংচার তিন ফোটা ফিবার মিক্শ্চারের সহিত প্রযোজ্য। মাথা বেদনা বা মাথা ধরা থাকিলে, ফিবার মিক্শ্চার ও একত্রিশ নম্বর, টিংচারের সহিত চৌত্রিশ নম্বর টিংচার দুই হইতে তিন ফোটা দিবে। জ্বর আরোগ্যের পর টনিকের ন্যায় দুই নম্বর পিল চোনার সহিত দিবসে একটা খাইতে দিবে; আর মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় আটত্রিশ নম্বর টিংচার ও সাঁইত্রিশ নম্বর টিংচার প্রত্যেকটি তিন ফোটা করিয়া অৰ্দ্ধ ছটাক জলের সহিত খাইতে দিবে। ধাতুদুর্ব্বলতা থাকিলে, অর্দ্ধছটাক ধাতু সঞ্জীবনী সুধা দুইবেলা আহারান্তে সেবনীয়।

চক্ষু ও হাত পা জ্বালা সংযুক্ত জ্বর।

ফিবার মিক্শ্চার তিন ফোটা, সাত নম্বর টিংচার তিন ফোটা ও চল্লিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা অর্দ্ধছটাক জলের সহিত দিবসে 'তিনবার সেবনীয়। সাতটা শিউলি পাতা চারিটা গোলমরিচের সহিত বাটিয়া প্রাতে একবার খাইতে দিবে।

জ্বরাতিসার।—ফিরার মিক্শ্চার তিন ফোটা, একত্রিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা, পঞ্চাশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা, ও এক নম্বর টিংচার তিন ফোটা অর্দ্ধ ছটাক জলের সহিত ৩/৪ ঘণ্টা অন্তর সেবনীয়; গাত্র ঠাণ্ডা হইয়া নাড়ী ছাড়িয়া গেলে, আট নম্বর টিংচার এবং শ্বাসকষ্ট ও বিকারের লক্ষ্মণ থাকিলে অর্থাৎ বিছানা আঁচড়াইলে, মাথা চালিলে ও ভূল বকিলে, ছয় নম্বর টিংচার রেমিটেণ্ট ফিবারের উপদেশ অনুসারে ব্যবহার করিতে হইবে।

পথ্য।—বার্লি, এরারুট, পানফলের পালো, বেদনা, মিছিরি।

প্লীহা।—প্লীহান্তক চুর্ণ অর্দ্ধ হইতে এক গ্রেণ মাত্রায় রাত্রিকালে আহারের পর সেবন বিধি এবং বাইশ নম্বর টিচার পাঁচ ফোটা, চব্বিশ নম্বর টিংচার দুই ফোটা ও চল্লিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা, দিবসে তিনবার সেবনীয়; উদরের আম্মান থাকিলে অর্থাৎ অল্প খাইলেই পেটের ভার বোধ হইলে, এক নম্বর সিরাপ ব্যবহার বিধি। দাস্ত কঠিন হইলে পেটের উপর প্লীহা স্থানে চোনার সেক দিবে। আমাদের কৃত প্লীহার মলম প্লীহা স্থানে মালিস করিবে।

প্রমেহ বা গণোরিয়া।—এক নম্বর টিংচার দশ ফোটা করিয়া আধছটাক জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয়। আহারান্তে ধাতু সঞ্জীবনী সুধা আধ ছটাক মাত্রায় সেবনীয়। প্রস্রাবে জ্বালা থাকিলে, প্রাতে একবার কলায়ের ডাল ভিজাইয়া খোসা তুলিয়া কাশ্মীর চিনির সহিত খাইবে।

বহুমুত্র বা মধুমেহ।—এক নম্বর টিংচার দশ ফোটা করিয়া আধ ছটাক জলে সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয়; ক্রমশঃ ইহা বিশ ফোটা পর্যন্ত প্রতিবারে খাইতে হইবে।

পথ্য।—প্রাতে মিষ্টবর্জ্জিত চরু ও রাত্রে গরম লুচি ও আলুবর্জ্জিত তরকারি।

মুত্রকৃচ্ছ বা অশ্মরী।—এক নম্বর টিচার দশ ফোটা করিয়া দিনে তিনবার সেব্য। পাথরি থাকিলে কুলত্থ কলাই এক ছটাক আধ পোয়া জলে ভিজাইয়া প্রাতে ও সন্ধ্যা এই জল এই মাত্রায় সেবনীয়।

পথ্য।—শাক, অম্বল ও লঙ্কার ঝাল নিষেধ।

সর্দ্দি ও কাসি।—সর্দ্দি ও কাসি হইলে, চল্লিশ নম্বর টিংচার তিনফোটা, বাইশ নম্বর টিংচার দুই। ফোটা ও তিন নম্বর টিংচার তিন ফোটা করিয়া দিবসে তিনবার সেবনীয়। কফ পিল সর্ব্বদা মুখে রাখিতে হইবে। যদি কার্সি ও সর্দ্দি সংযুক্ত জ্বর হয় (যাহা নিউমোনিয়া বা ব্রন্‌কাইটিশ নহে) তাহা হইলে এই ঔষধে উপকার হইবে।

রাজযক্ষ্মা।—ফিবার মিক্‌শ্চার পাঁচ ফোটা চারি নম্বর টিংচার তিন ফোটা, একত্রিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা, চল্লিশ নম্বর টিংচার তিন ফোটা করিয়া আধ ছটাক জলের সহিত মিশাইয়া দিবসে তিনবার সেব্য। কফ পিল সর্ব্বদা মুখে রাখিতে হইবে। ডিস্‌পেপ্‌সিয়া পাউডার অর্দ্ধ গ্রেণ হইতে এক গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রাতে ও সন্ধ্যায় সেবনীয়। পাউডারের অনুপান—প্রাতে তুলসী পাতার রস ও মধু (কিন্তু হাত পা জ্বালা থাকিলে, সিউলি পাতার রস ও মধু) এবং বৈকালে বাক্স পাতার রস ও মধু। এই রোগে যদি অজীর্ণ থাকে বা তরল দাস্ত হয়, তাহা হইলে আহারান্তে অজীর্ণ-সুধা আধ ছটাক পরিমাণে খাইবে। বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠে বেদনা থাকিলে, ছয় নম্বর টিংচার অমোঘ তৈলের সহিত বেদনা স্থানে মালিস করিবে। আধ ছটাক তৈলে সাত ফোটা টিংচার মিশাইয়া লইতে হইবে।

পথ্য।—প্রাতে নিরামিষ ঘৃতপক্ক তরকারি পুরাতন চাউলের অন্ন, রাত্রে গরম লুচি ও আলুবর্জ্জিত তরকারী। দুগ্ধ অর্দ্ধসের হইতে সহ্যমত যত খাইতে চায়, তত দেওয়া যাইতে পারে। অমোঘ তৈল গাত্রে মাখাইয়া গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া স্নান করাইবে। শাক, অম্বল ও লঙ্কার ঝাল নিষেধ। আরোগ্য হইলে অন্ততঃ এক বৎসরকাল সম্পূর্ণরূপে স্ত্রীবর্জ্জিত অবস্থায় থাকিতে হইবে।

শ্বাস ও কাস।—চারি নম্বর টিংচার ও বাইশ নম্বর টিংচার প্রত্যেক পাঁচ ফোটা আধ ছঠাক জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয় এবং কফ পিল সর্ব্বদা মুখে রাখিবে। সন্ধ্যার সময় একবার বুদ্ধ ভৈরব বটিকা দুধের সহিত মাড়িয়া খাইতে হইবে, এবং এই ঔষধ খাওয়ার পর কিঞ্চিৎ দুগ্ধপান করিতে হইবে। শ্বাস কষ্টের দরুণ অত্যন্ত অস্থির হইলে, অধিকন্তু ছয় নম্বর টিংচার দুই হইতে তিন ফোটা দুই তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে; শ্বাস কষ্ট নিবারণ হইলে, উহা আর খাইবার আবশ্যক নাই।

পথ্য।—শাক, অম্বল ও লঙ্কার ঝাল-নিষেধ।

পিত্তাধিক্যবশতঃ কেবল চক্ষু, হাত, পা জ্বালা বোধ হইলে, চল্লিশ ও সাত নম্বর টিংচার প্রত্যেকের পাঁচ ফোটা দিবসে তিনবার সেবনীয় এবং সাতটি সিউলি পাতা চারিটি গোলমরিচের সঙ্গে বাটিয়া প্রাতে একবার খাইবে। ইহার সহিত যদি জ্বর থাকে, তবে চুয়ান্ন নম্বর টিংচার উহার সহিত এক ফোটা মিশাইয়া খাইবে।

সাধারণ বেদনা।—ছয় নম্বর টিংচার প্রতি বার নূতন নূতন তুলিতে করিয়া বেদবা স্থানে মালিস করিবে। বেদনার অবস্থানুসারে এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর মালিস করিতে হইবে।

ওলাউঠা।—প্রথমাবস্থায় কলেরা ড্রপ দুই বা তিন ফোটা আধ ছটাক অজীর্ণ সুধার সহিত এক বা দুই ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। রোগীর হিমাঙ্গ হইলে হাত বা পায়ে খিল ধরিলে, হাতে পায়ে খিল নিবারণের জন্য শুঁঠের গুঁড়া মালিস করিতে দিবে ও উত্তাপ না আসা পর্য্যন্ত পাঁচ ফোটা করিয়া কলেরা ড্রপ অজীর্ণ সুধার সহিত আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা অন্তর সেবন করিতে হইবে। যদি রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া কষ্ট হয় বা পেটের ফাঁপ থাকে, তাহা হইলে সোরা জলে ভিজাইয়া সেই সোরার জলে নেকড়া ভিজাইয়া নাভির চারিদিকে দিবে ও ন্যাকড়া যাহাতে শুকাইয়া না যায়, তজ্জন্য মধ্যে মধ্যে উহা ঐ সোরার জলে ভিজাইয়া দিবে। যোল ও বত্রিশ নম্বর টিংচার প্রত্যেক পাঁচ ফোটা করিয়া আধ ছটাক জলের সহিত ২/৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে; রোগী যাহাতে জল না খায়, তাহার বিশেষ তদন্ত রাখিতে হইবে। জল খাইলে রোগী বাঁচিবে না। জলের পরিবর্ত্তে রোগীকে মিছরির সরবৎ পাতি বা কাগচি লেবুর রসের সহিত যত খাইতে চায়, তত খাইতে দিবে। এক সের জলে এক পোয়া মিছরি ভিজাইয়া সরবৎ করিবে। অত্যন্ত পিপাসা থাকিলে, নিমফুল (শুষ্ক বা কাঁচা) দুই তোলা একসের জলে সিদ্ধ

করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া সেই জল মধ্যে তিন চারি বার খাইতে দিবে।

পথ্য : কলেরা উপশম হইয়া প্রস্রাব হইলে, বার্লি ও গান্ধালের ঝোল।

অজীর্ণ-ডাইরিয়া আমাশয় : পঞ্চাশ নং টিংচার এক নং টিংচার ও একত্রিশ নম্বর টিংচার প্রত্যেকটি তিন ফোটা করিয়া, আধছটাক জলের সহিত দিবসে তিন চারিবার সেবনীয় এবং আহারান্তে অজীর্ণ সুধা আধ হইতে এক আউন্স খাইতে হইবে; গ্রহণী রোগে, শোধ থাকিলে, ষোল নম্বর টিংচার ও বত্রিশ নম্বর টিংচার, প্রত্যেকটির পাঁচ ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত ৩/৪ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। এবং শ্বেত পুনর্ণবা এক ছত্রাক ও শুক্না মূলা এক ছটাক এক সোর জলে সিদ্ধ করিয়া, আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া প্রাতে সন্ধ্যায় ও মধ্যাহ্নে সেবনীয়।

পথ্য : জ্বর না থাকিলে, রক্তামশায়ের ন্যায় পণ্য দিবে; কাঁচা কলা ভাজা ভাতে ঝোলে খাইতে পারে।

রক্তামাশয় : নয় নং টিংচার ও একত্রিশ নম্বর টিংচার প্রত্যেকটি পাঁচ ফোটা করিয়া আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিন চারিবার সেবনীয়। দুই তোলা কুড়চির ছাল আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া এক ছত্রাক থাকিতে নামাইয়া প্রাতেঃ সন্ধ্যায় সেবনীয়। মাত্রা প্রতিবারে আধ ছটাক।

পথ্য : জ্বর না থাকিলে ছাগলের দুধ; গেঁড়ির ঝোল, সিঙ্গি মাছের ঝোল, গন্ধভাদালের ঝোল ও পুরাতন চালের ভাত, বৈকালে চিংড়ের মণহ, মিছরি বা খেজুরে গুড়ের সহিত ভেল পোড়া প্রাতে একবার খাইতে দিবে;—জ্বর থাকিলে ভাত ও ছাগলের দুগ্ধ বন্ধ থাকিবে।

রক্তপিত্ত : যতক্ষণ রক্ত বমন বা রক্ত উঠা থাকে, ততক্ষণ আঠার নম্বর টিংচার পাঁচা ফোটা আধ ছটাক জলের কহিত তিন ঘণ্টা অন্তর সেবন করিবে। রক্ত বন্ধ হইলে; যদি কাসি না থাকে, তবে পচিশ নং টিংচার দশ ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিন বার করিয়াা ৪১ দিন সেবনীয়। যদি কাসি থাকে; তবে পঁচিশ ও বাইশ নম্বর টিংচার প্রত্যেকটি পাঁচ ফোটা করিয়া আধ ছটকা জলের সহিত দিবসে দিন বার সেব্য এবং সর্ব্বদা কফ পিল মুখে রাখিতে হইবে। আমাদের কৃত রক্ত পিত্তহারী মোদক প্রাতে জলের সহিত সেবনীয়।

পথ্য : শাক অম্বল লঙ্কার ঝাল নিষেধ।

কৃমি : পঁচিশ নম্বর ও ছাপ্পান্ন নম্বর টিংচার প্রত্যেকটি পাঁচ ফোটা করিয়া প্রতি দিবস তিন চারিবার সেবন করিবে।

বাধক : ত্রিশ নম্বর টিংচার দশ ফোটা করিয়া আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিন বার করিয়া ঋতুর প্রথম দিন হইতে দশমদিন পর্য্যন্ত সেবনীয়। এই প্রকার দিন মাস, ঋতুকালে ঔষধ সেবনীয়। ঋতুকালে রক্তকৃচ্ছ থাকিলে, সুধাকর চূর্ণ (ডিলুম্যানেরিয়া পাউডার) ঋতুর প্রথম চারি দিবস সেবন করিবে।

শিশুদিগের ঘুঙ্‌রি : জ্বর না থাকিলে বাইশ নম্বর টিংচার ১ ফোটা সাত নম্বর টিংচার ১ ফোটা আটত্রিশ নম্বর টিংচার ১ ফোটা, এক কাঁচ্চা জলের সহিত ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর সেব্য। জ্বর থাকলে, এই ঔষধের সহিত ১ ফোটা ফিবার মিক্‌শ্চার মিশাইয়া লইবে। বেশী টান থাকিলে, বক্ষস্থলে পুরাতন ঘৃত মালিস করিবে এবং মুক্তঝুরির পাতার রস সিকি ঝিনুক পরিমাণে, প্রাতে একবার খাইতে দিবে। ইহাতে বমন হইয়া শ্লেষ্মা উঠিয়া যাইবে; দাস্ত পরিস্কার না হইলে, সন্ধ্যার সময় একবার আধ ঝিনুক পানের রস খাইতে দিবে। ময়ুর-পুচ্ছ ভস্ম করিয়া তাহার সহিত দুই এক ফোটা মুধু গরম করিয়া মিশাইয়া অবলেহ করিয়া জিহ্বায় স্বল্প পরিমাণে মধ্যে লাগাইয়া দিবে।

বাত বেদনা : বাত রোগে বাতঘ্ন তৈল বেদনা স্থানে দিবসে ৩।৪ বার মালিস করিবে, আর চব্বিশ নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা ও সাতাইশ নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিনবার খাইতে দিবে এবং প্রতিদিন এককোয়া রসুম চিবাইয়া খাইতে হইবে।

কাটা ঘা বা পচা ঘা : একমাত্র অমোঘ তৈল ব্যবহারে ইহা আরাম হয়।

শ্বেত প্রদর : পঞ্চানন চূর্ণ ব্যবস্থা-পত্রানুযায়ী সেব্য।

রক্ত প্রদর : স্ত্রীলোকের ঋতুর পর হইতে রক্ত শ্রাব হইলে, তেত্রিশ নম্বর টিংচার দশ ফোটা করিয়া আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে দিন বার সেবনীয়। এবং চারি রতি ফট্‌কিরি আধ ছটাক জলে ভিজাইয়া সেই জলপ্রাতে পান করিবে। ঐরূপ করিয়া ফট্‌কিরির জল সন্ধ্যায়ও পান করিবে। যদি ইউট্রসে বা পো নাড়ীতে ক্ষত বা ক্যান্সার থাকে তবে নিমপাতা ও নিসিন্দে পাতা সমপরিমাণে লইয়া জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল দ্বারায় ক্ষত স্থান পিচকারী

দ্বারায় ধৌত করিবে। পরে অমোঘ তৈলে লিন্ট ভিজাইয়া ঐ লিন্ট ক্ষত স্থানে দিবে। দিবসে ঐ লিন্ট দুই তিন বার বদলাইতে হইবে।

ধাতুদৌর্ব্বল্য বা নারভাস, ডিবিলিটী : কোষ্ঠ বদ্ধ, মাথা ঘোরা ইত্যাদি লক্ষ্মণ থাকিলে, ধাতুসঞ্জীবনী সুধা আহারান্তে আধ ছটাক পরিমাণে খাইতে হইবে এবং সাঁইত্রিশ নম্বর টিংচার ও চল্লিশ নম্বর টিংচার প্রত্যেকটি পাঁচ ফোটা করিয়া আধ ছটাক জালের সহিত দিবসে দুই বার সেবন করিবে।

পথ্য : ঘৃতপক্ক দ্রব্যাদি ও দুগ্ধ অধিক পরিমাণে (যেমন সহ্য হয়) সেবনীয়।

রক্তার্শ : কুড়ি নম্বর টিংচার দশ ফোটা করিয়া দিবসে তিন বার আধ ছটাক জলের সহিত সেব্য। প্রাতে ঔষধ খাইবার এক বা দুই ঘণ্টা পরে সদ্যোজাতা তক্রের সহিত আধছটাক কুক্‌সিমের পাতার রস খাইবে। অর্শে জ্বালা থাকিলে দুর্ব্বার রস আধ ছটাক কিঞ্চিৎ কাশীর চিনির সহিত খাইতে দিবে; মাখন ও তিলাবাটা খাইবে।

পথ্য : শাক অম্বর লঙ্কার ঝাল নিষেধ। **খোস চুলখানি।** ইচ্ লোসন ব্যবহারে আরোগ হয়।

ছেলেদের রসতড়্কা বা কন্‌ভল্‌সন—আটত্রিশ নম্বর টিংচার দুই ফোটা, সাত নম্বর টিংচার দুই ফোটা, উনষাট নম্বর টিংচার এক ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিনবার সেবনীয়। অত্যন্ত শিশু হইলে ইহার অর্দ্ধ মাত্রা।

হৃদ্‌রোগ : সাতচল্লিশ নম্বর টিংচার ছয় ফোটা ছল্লিশ নম্বর টিংচার দিন ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত সেবনীয়।

পথ্য : শাক অম্বর লঙ্কার ঝাল নিষেধ।

উপদংশ · ক্ষত স্থানে আমাদের কৃত মলম ও ঘৃত ব্যস্থার পত্রানুযায়ী ব্যবহার করিবে। সিবিলিস্ স্ফোটক হইলে আমাদিগের পারদ নাশক বটিকা ব্যবস্থা -পত্র মত ব্যবহার করিবে। গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকিলে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় এক ছটাক কল্মিশাকের রস খাইবে।

পুরুষত্বহানি : ধ্বজভঙ্গ গাঁড়া সাজাপানের সহিত দিবসে চারি পাঁচবার দুই আনা মাত্রায় খাইতে দিবে এবং সাঁইত্রিশ নম্বর টিংচার প্রত্যহ দশ ফোটা করিয়া দিবসে তিনবার ব্যবহার করিবে।

পথ্য : পাঁটার মাতি পাক করিয়া খাইবে। শাক অম্বল লঙ্কার ঝাল নিষেধ।

তরলদাস্তের সহিত কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু পেটফাঁপা রোগ : অজীর্ণ কেশরী বটিকা ১টা করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিতে দিবে এবং মিছরির সরবৎ দিনে একবার খাইবে। আহারান্তে দুই বেলা আধ হইতে এক আউন্স অজীর্ণসুধা খাইবে। ইহাতে অম্ল রোগও আরোগ্য হইবে।

পাণ্ডুরোগ : চল্লিশ নম্বর টিংচার পাঁচ ফোট, বত্রিশ নম্বর টিংচার দিন ফোট, ষোল নম্বর টিংচার তিন ফোটা আধ ছটাক চালের সহিত দিবসে তিন বার সেবন করিবে। খুলকুড়ি পাতার রস আধ ছটাক প্রাতে খাইতে দিবে। মধ্যাহ্নে ঔষধ খাওয়ার এক ঘণ্টা পরে অড়হর পাতার রস আধ ছটাক চারি আনা কাশীর চিনির সহিত খাইবে।

পথ্য : শাক অম্বর লঙ্কার ঝাল নিষেধ।

স্বপ্নদোষ : স্প্যারম্যাটোরিয়া সিরাপ দিবসে এক ড্রাম বা দুই ড্রাম আধ ছটাক জলের সহিত তিন বার সেব্য। প্রাতে কৃষ্ণকলি ফুলের পাতার রস আধ ছটাক এক আনা পরিমান চিনির সহিত সেবন করিবে। তুলসীর শিকড় চুলে বাঁধিয়া দিলেও এই রোগ আরোগ্য হয়। কিন্তু ইহাতে যে ব্যক্তি ঔষধ বাঁধিয়া দিবে, সে এক সপ্তাহ কাল রোগীকে ছুঁইতে পারিবে না।

পারদ-ঘটিত কুষ্ঠ : পারদ-নাশক বটিকা ব্যবস্থা পত্রানুসুরে নিত্য সেবনীয়। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় আধ ছটাক কলমীশাকের রস খাইতে দিবে। চব্বিশ নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা ও উনিশ নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত দিবসে তিন বার সেব্য।

অম্লরোগ : বুক জ্বালা, গলায় সর্দ্দি জাড়াইয়া বা অম্ল বমন থাকিলে, অম্লান্তক চূর্ণ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ব্যবস্থা পত্রানুসারে সেবনীয় এবং আহারান্তে অজীর্ণসুধা আধ ছটাক মাত্রায় খাইবে।

অম্লশূল ও পিত্তশূল : আহারান্তে অজীর্ণসুধা এক আউন্স মাত্রায় দুই বেলা সেবনীয়। উনষাট নম্বর টিংচার দশ ফোটা করিয়া দিবসে তিনবার আধ ছটাক জলের সহিত সেব্য। বেদনা-কালীন শূলান্তক চূর্ণ ব্যবস্থা-পত্রানুসারে সেবনীয়। প্রাতে ঔষধ খাইবার দুই ঘণ্টা পরে দুইটা পাতিলেবু বা কাগঘজি লেবুর রস করিয়া খাইবে। লেবুর রস আজীব সেব্য।

অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্সিয়া : ডিস্‌পেপ্‌সিয়া পাউডার প্রাতে শিউলিপাতার রস ও মধু, বৈকালে থুলকুড়ি পাতার রস বা পটলের সত্ত্ব মধুর সহিত

সেবনীয়। উদরাধ্মান থাকলে, অজীর্ণ কেশরী বটিকা একটি আহারের তিন চারি ঘণ্টা কাল পরে জলের সহিত খাইবে। ইহার সহিত যদি অম্ল জনিত বুক জ্বালা বা গলায় জড়াইয় ধরা থাকে, তবে আহারান্তে অজীর্ণ সুধা আধ আউন্স হইতে এক আউন্স খাইবে।

চক্ষুরোগ : চক্ষে ছানি পড়িলে অথবা অন্য রকম চুক্ষরোগ হইলে, আমাদের পঞ্চমুখ তৈল এক ফোটা করিয়া দিবসে দুইবার চক্ষু মধ্যে দিলে আরাম হয়। ছানি পাকিয়া গেলে, উহাতে উপশম হয় না। ছানি কাটান আবশ্যক।

চক্ষু উঠা : চক্ষু উঠিয়া লাল হইলে, সরিষা প্রমাণ কর্পূর ও সরিষা প্রমাণ দারুচিনি গুঁড়া একটু পরিষ্কার ন্যাকড়ার সুতা দিয়া বাঁধিয়া এক গ্লাস জলে সন্ধ্যার সময় ভিজাইয়া রাখিবে; পরে প্রাতে সুর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ঐ ন্যাকড়া উঠাইয়া ঐ জল দুই ফোটা চক্ষুতে দিবে। সন্ধ্যকালে ও প্রাতে ঐ প্রকার ভিজান জল দুই ফোটা সূর্য্যাস্তের পরে চক্ষুতে দিবে। প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐ জল দিবার পর শিয়াল কাঁটার আঠা চক্ষুতে কাজল দেওয়ার ন্যায় লাগাইয়া দিবে। ইহাতে চক্ষু জুড়িবে না।

প্লেগ বা সান্নিপাতিজ্বর : বায়ু পিত্ত কফ এই ত্রিদোষ কুপিত হইয়া যে জ্বর হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক জ্বর বা প্লেগ কহে। এই জ্বরে কফ প্রধান থাকিলে, অগ্রে কফ নষ্ট করা উচিত। সেজন্য নস্য ব্যবহার করিবে এবং পরে বায়ু পিত্ত নাসক ঔষধ ব্যবহার করিবে।

নস্যদিবার নিয়ম : টাবা লেবুর রস, আদার রস ও বিটলবণ গরম জলে মর্দ্দন করিয়া নস্য দিবে। ইহাতে মস্তকের জল নিঃসরণ করাইয়া মস্তকের ও সকল শীরের বেদনা দূর করিবে। রোগীকে যে জল পান করিতে দিবে, তাহা ইউক্লিপ্টস গাছের শুক্না বা কাঁচা পাতার সহিত সিদ্ধ করিয়া দিবে। রোগীর অত্যন্ত পিপাসা থকিলে, নিমফুল (শুক্না বা কাঁচা) দুই তোলা, একসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া, ঐ জল আধ ছটাক পরিমাণে তিন চারিবার মধ্যে মধ্যে রোগীকে পান করিতে দিবে। ইহাতে পিপাসা দূর হইয়া বিকার ভাব কাটিয়া আসিবে। বায়ু পিত্ত নিবারণের জন্য ফিবার মিক্শ্চার তিন ফোটা, চুয়ান্ন নম্বর টিংচার দুই ফোটা, চল্লিশ নম্বর টিংচার চারি ফোটা, আধ ছটাক জলের সহিত তিন ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। রোগীর দাস্ত পাতলা হইলে বা দাস্ত পাতলা ধাকিলে, চল্লিশ নম্বর

টিংচারের পরিবর্ত্তে একত্রিশ নম্বর টিংচার চারি ফোটা উপরোক্ত টিংচারের সহিত দিবে। প্লেগে যদি পিত্তাধিকাভাব কমিয়া বায়ু ও কফাধিক্যভাব বেশী থাকে, তাহা হইলে চুয়ান্ন নম্বর টিংচারের পরিবর্ত্তে বাইশ নম্বর টিংচার চারি ফোটা দিবে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে, রোগীর জ্বরভাব যখন কমিয়া আসিতেছে অর্থাৎ ১০৫ ডিগ্রি হইতে ১০১ ডিগ্রি হইতেছে, তখন উহার নাড়ী ছাড়িবার হিমাঙ্গ হইবার বা হার্ট ফেল হইবার, উপক্রম বা আশঙ্কা হইতেছে কিনা।

সে স্থলে নাড়ী হার্ট ও গাত্রের উষ্ণতা ঠিক রাখিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ঔষধ বন্ধ রাখিয়া, আট নম্বর টিংচার প্রথমে দুই ফোটা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচ ফোটা পর্যন্ত্য আধ ছটাক জলের সহিত রোগীর অবস্থানুযায়ী এক বা আধ ঘণ্টা অন্তর ব্যবহার করিবে এবং উক্ত আট নম্বর টিংচারের সহিত সাতচল্লিশ নম্বর টিংচার পাঁচ ফোটা যোগ করিয়া লইবে। নাড়ী ঠিক হইলে বা গাত্রের উষ্ণতা আসিলে, এই ঔষধ বন্ধ জ্বরের ও রোগীর অবস্থানুযায়ী জ্বরের বৃদ্ধিশীল অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ঔষধ স্বল্প বা পূর্ণমাত্রায় খাইতে দিবে। যদি কোনও গ্লান্ড ফুলিয়া থাকে, তাহা হইলে ছয় নম্বর টিংচার আধ ঘণ্টা অন্তর ঐ স্থলে মালিশ করিবে। উহা পাকিলে, কোন ডাক্তার দ্বারা কাটাইয়া দিবে। পরে পুল্‌টিস্ দিয়া পূজা নির্গত হইলে, এক আউন্স অমোঘ এক আউন্স অমোঘ তৈল কুড়ি ফোটা কার্ব্বলিক এসিড্ মিশাইয়া উহাতে লিন্ট ভিজাইয়া ক্ষত স্থানে দিবে। দূষিত পুঁজ নির্গত হইয়া ক্ষতের অবস্থা ভাল হইলে কেবল অমোঘ তৈল লিন্ট ভিজাইয়া ব্যবহার করিবে। ইহাতে ক্ষতস্থান ক্রমশঃ পুরিয়া আসিবে।

পথ্য : জল সাগু বা দুগ্ধ সাগু। পেট নরম থাকিলে বার্লি, এরারুট, বেদানা, কেশুর ও পানিফল। রোগী যাহাতে দুর্ব্বল না হয়, তজ্জন্য দুগ্ধ অর্দ্ধ সের হইতে সহ্যমত আড়াই পোয়া পর্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। বেদানা যাহা খাইতে চায়, তাহা দেওয়া যাইতে পারে পারে।

উপর্য্যুক্ত সমস্ত ঔষধের মাত্রা পূর্ণ বয়স্কের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল। ৬ বৎসর হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত অর্দ্ধ মাত্রা; ৬ বৎসরের নিম্নে অষ্টম ভাগ মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হইল। উল্লিখিত বিশেষ ব্যবস্থা ব্যাতীত আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে ঔষধ সেবন নিষেধ। একটি ঔষধ সেবনের পর আর একটি ঔষধ অব্যবহিত পরে সেবন নিষেধ। অন্ততঃ এক ঘণ্টা ব্যবধান থাকা আবশ্যক।

আর্য্যমিশন ইস্টিটিউসনের আচার্য্য পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবিষ্কৃত আশ্চর্য্য ফলদায়ক দেশীয় উদ্ভিজ হইতে প্রস্তুত ঔষধাবলী সম্বন্ধে

কতিপয় ডাক্তার ও খ্যাতনামা লেখকের মত ও ঔষধের মূল্য তালিকা।

১। "পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবিষ্কৃত ঔষধাবলী ব্যবহার অদ্যবধি পরিতেছি ও তাঁহার যে সব ব্যবস্থা দেওয়া আছে সে মত চলিয়া আশাতীত ফল পাইয়া থাকি ও ঔষধের মূল্য ছাড়া কোন চিকিৎসা খরচই আমার লাগেনা। ইতি।—

শ্রী হরিচরণ মুখার্জ্জি, উকিল চেয়ারম্যান
দেওঘর মিউনিসিপ্যালিটি
৯।৮।২৭"

শ্রীযুক্ত বোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য্য
এম্প্রেস জুবিলি গার্ডেন দেওঘর পো :

তেঁতুলিয়া দাতব্য
ঔষধালয়
৬।৮।২০

২। মহাশয়— আপনার স্বর্গীয় পিতৃদেবের আবিষ্কৃত ঔষধের ফলে আমি আশ্চার্য্যান্বিত। আমার পুত্রের ডিস্‌পেন্সিয়া হইয়াছিল। তাহাকে আপনার ব্যবস্থায় ঔষধ ব্যবহার করাইয়া আমি বিশেষরূপ ফল লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ ইনফ্যান্টাইল লিভারের ঔষধ গুলি আরও বিশেষ ফলপ্রদ। আমি ইনফ্যান্টাইল লিভারের রোগী অনেক পাইয়াছি। আপনার ঔষধ ব্যবহার করাইয়া একশতের মধ্যে নব্বুই জন আরাম হইয়াছে। আশা করি এই সকল ঔষধ জনসাধারণের নিকট আদরণীয় হইবে। দয়া করিয়া আমাকে একখানি ব্যবস্থাপুস্তক পাঠাইবেন কারণ বইগুলি জনসাধারণের লইয়া গিয়াছে। ইতি—

শ্রীশ্রীতলচ ঘোষ—ডাক্তার
তেঁতুলিয়া দাতব্য ঔষধালয়।
শ্রীপুরবাজার পোঃ
জেলা হুগ্‌লি

৩। ডাক্তার পূর্শচন্দ্রমৌলিক L. M. S. মেহেরপুর লিখিতেছেন— "বিগত ১৩ বৎসর যাবৎ এই ঔষধগুলি প্র্যাক্‌টিসে এবং যে কোন রোগেই হউক পরিবার বর্গের মধ্যে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়া আসিতেছি। আমার কন্যাদ্বয়ের ইনফ্যান্টাইল লিভারে অন্য কোন চিকিৎসায় সুবিধা না হওয়ায় শেষে এই চিকিৎসায় তাহারা নিরাময় হয়। কলেরা রাজযক্ষ্মা বহুমত্র রোগেও আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি।"

৪। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রিটায়ার্ড প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট লিখিয়াছেন— "পণ্ডিত পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবিস্কৃত ঔষধাদি গত চল্লিশ বৎসর হইতে ব্যবহার করিতেছি নানা কঠিন রোগে অন্য কোন ঔষধের আবশ্যক হইতে না।" ১।২।২৬

৫। ডাক্তার শ্রীচন্দ্রমুখার্জ্জি প্রায় ত্রিশবৎসর এই ঔষধ ব্যবহার করিয়া লিখিয়াছেন—"আচার্য্য ঁপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আবিষ্কৃত ঔষধাবলির উপর আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস। মুঙ্গের জামালপুর ছোটনাগপুর প্রভৃতি স্থানে যখন চিকিৎসা করিতাম যে রোগ এলোপ্যাথিক ঔষধে আরাম হইতে না তাহা এই ঔষধে আরাম করিয়া জনসমাজে আদরনীয় হইতাম অনেক ইংরাজ ও ইংরাজ মহিলা এই ঔষধে দুরারোগ্য ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ আরাম পাইয়াছেন। ওলাউঠা শ্বেপ্রদর বাধক রক্তপ্রদর অম্ল শিশুদিগের দুরারোগ্য লিভার ব্যাধি শূল মেহ হাঁপ কাশ পর্য্যন্ত অভাবনীয়রূপে আরাম হইয়াছে। ২৮।১১।২৫

৬। রায় সাহেব জগদানন্দ চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা লিখিতেছেন—"আপনার ব্যবস্থামত পঞ্চমুখ তৈল ব্যবহার করিয়া আশ্চর্য্য ফল পাইতেছি। একটি চক্ষুর ছানি বহুকষ্টে ও ব্যায় কাটাইয়াছি অপর চক্ষে আপনার ব্যবস্থামত তৈল যতদিন দিয়া যাই কোন ক্লেশ হয় না ও বেশ পড়িতে পারি। আমি কবিরাজি ভালরূপ জানি। আপনার ঔষধে জ্বরে অতি উত্তম ফল হইয়াছে। ১০।১১।২৫"

৭। জমিদার রাখাল দাস সিংহ কৃষ্ণনগর লিখিতেছেন—"পূর্ব্বে রাতে দুই তিনমাস কষ্ট পাইতাম। আপনার ঔষধে শয্যাগত না হইয়া তিন চারি দিনেই আশ্চর্য্য ফল পাইয়াছি। আপনার ব্যবস্থার পরিবার বর্গের মধ্যে জ্বর কাশিতে আশাতীত ফল হইয়াছে। ইতি ১২ই অগ্রহায়ন ১৩৩২

৮। শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কলিকা টাইপ ফাউন্ডারীর সত্তাধিকারী কলিকাতা— "কোষ্ঠবদ্ধ ও মাথাঘোরা রোগে সকল চিকিৎসায় হতাশ হইয়া আশা ত্যাগ করি। হঠাৎ আপনার ঔষধের বিষয় শুনিয়া ব্যবহার করায় সপ্তাহের মধ্যে আশা হয় ও এখন আপনার ঔষধে প্রাণ পাইয়াছি মনে হয়। নভেম্বর ১৯২৬

৯। সাতকড়ি ব্যানার্জ্জি এডভোকেট, পূর্ণিয়া লিখিয়াছেন—আপনার ঔষধ ব্যবহার করিয়া কঠিন রোগ আরাম হইতেছে। আপনার অমোঘ তৈল কাটা, পোড়া ও ঘা ইত্যাদির পক্ষে অব্যর্থ মহৌষধ। সাধারণ বেদনা বা গ্রান্ড ফুলায় ছয় নং লিনিমেন্ট ও ঐরূপ অব্যর্থ। ২৬।৬।২৬

আর্য্যমিশনের আচার্য্যদেবের আবিষ্কৃত বিবিধ ঔষধাবলির গুণাগুণ ও

প্রয়োগ ব্যবস্থা এবং নানা রোগের চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগের ব্যবস্থাপূর্ণ পুস্তক পত্র লিখিলে বিনামূল্যে পাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীবোধিসত্ত্ব ভট্টাচার্য্য

দেওঘর বৈদ্যনাথ

ধাতু সঞ্জীবনী সুধা : কোষ্ঠবদ্ধ মাথাঘোরা নিবারক অগ্নিদীপক পরিপাচক ও রুচিকারক। সর্ব্বসাধারণে সুস্থ শরীরে ইহা ব্যবহার করিয়া যাইতে পারেন। ইহা রসায়ন গুণযুক্ত এবং কোষ্ঠ ও মস্তিষ্ক ঠিক রাখিতে অব্যর্থ। স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ মহৌষধ। কঠিন রোগান্তে সকলকার পক্ষেই উপকারী।

অমোঘ তৈল : কাটা ঘা, পচা ঘা, পোড়া ঘা যাবতীয় ক্ষত ছাঁচা ইত্যাদি অব্যর্থ মহৌষধ। কাটা ঘা অতি শীঘ্র আরাম করে ও কোনরূপ দুষিত ও বিষাক্ত হইতে দেয় না। যাবতীয় চর্ম্মরোগ চুলকানি ইত্যাদি নাশক। গায়ে মাখিয়া স্নান করিলে কোনরূপ চর্ম্মরোগের ভয় থাকেন ও ম্যালোরিয়া বিষের উপশম করিবে।

অজীর্ণ কেশরী বটিকা : অজীর্ণ রোগে পেট ফাঁপা এবং অগ্নিমান্দ্য ও ডিস্পেনসিয়া রোগে অত্যন্ত উপকারী। আহারের-দুই তিন ঘণ্টা পর বা কিছু পর খাওয়া উচিত।

কফপিল : কাশির অব্যর্থ ঔষধ। মুখে রাখিয়া ইহা হইতে নির্গত রস খাইতে থাকিলে কাশির আশা উপশম হইবে সর্দ্দি ও হাঁপানির কাশির বিশেষ উপকারী।

অজীর্ণ সুধা : অত্যন্ত পরিপাচক ও মলরোচক আহারান্তে সেবন করিলে সমস্ত ভুক্ত দ্রব্য সম্পূর্ণ জীর্ণ করে কলেরা রোগে মহৌষধ। ৮ নং টিংচারের সহিত ব্যবহার করিবে।

ঔষধের তালিকা ও মূল্য।

যাবতীয় টিংচার মূল্য প্রতি আউন্স	৩্ টাকা
ইচলোসন মূল্য প্রতি আউন্স	।√০ আনা
অজীর্ণ কেশরী বটিকা মূল্য ১৬ বটীকা	১্ টাকা
ম্যালেরিয়া পিল ১ ও ২ নং ১৬ বটীকা	১্ টাকা
ডিস্পেপিসয়া পাওডার মূল্য ৭ গ্রেণ	১্ টাকা
অমোঘ তৈল প্রতি আউন্স	।√০ আনা
ধাতু সঞ্জীবনী সুধা মূল্য পাইট বোতল	১্ টাকা
" " " কোয়ার্ট "	১্ টাকা
সিরাপ ১ ও ২ নং মূল্য প্রতি আউন্স	॥০ আনা
শূলান্তক চূর্ণ সাত পুরিয়া	১্ টাকা
প্লীহান্তক চূর্ণ চৌদ্দ পুরিয়	১্ টাকা
কফ পীল ১২ বটিকা	।০ আনা
পঞ্চানন চূর্ণ ৭ পুরিয়া	১্ টাকা
সুধাকরচূর্ণ ৪ পুরিয়া	১্ টাকা
অজীর্ণ সুধা পাইট বোতল	১্ টাকা
" " " কোয়ার্ট বোতল	২্ টাকা
পারা ও গর্ম্মির ঔষধ খাইবার ঘৃত আউন্স	✓০ আনা
" " " লাগাইবার মলম	✓০ আনা
বুদ্ধ ভৈরব বটীকা ১৪ বটীকা	১্ টাকা
কুষ্ঠ ও পারদ নিবারক বটীকা মূল্য ৭ বড়ি	১্ টাকা
বাত তৈল প্রতি আউন্স	।√০ আনা

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—উপরোক্ত ঔষধের মূল্য ইদানীং বর্দ্ধিত হইয়াছে।
